মানবতার মা

শেখ হাসিনা

মানবতার মা
শেখ হাসিনা

সম্পাদক
রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
BANGLADESH FOLK ART & CRAFTS FOUNDATION
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মানবতার মা
শেখ হাসিনা

সম্পাদক
রবীন্দ্র গোপ

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২৫/মার্চ ২০১৯

মুদ্রণ সংখ্যা
১০০০ কপি

প্রকাশক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ
একেএম আজাদ সরকার

মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৫১৫, ০১৭১১৬০২৪৪২

মূল্য
৭৫০ টাকা

MANOBHOTER MA SHEIKH HASINA
EDITOR
RABINDRA GOPE
Published by Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation,
Sonargaon, Narayanganj, Bangladesh.
First Published : March 2019
Price : Tk. 750 Only U.S. Dollar 30
ISBN : 978-984-34-6448-4

উ|ৎ|স|র্গ

বাংলাদেশের দুই রত্ন

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা
সজীব ওয়াজেদ জয়

ও

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন
মানবতা কর্মী, জাতি সংঘের অটিজম বিষয়ক পরামর্শক
সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

নেওয়া এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতা প্রদর্শন ইত্যাকার অর্জনগুলোর পেছনে শেখ হাসিনার ভূমিকাই ছিল নিয়ামক।

মূল যে ক'টি সঙ্কট মোকাবেলায় সক্ষম হওয়ায় শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশে অবিসংবাদিত নেতার আসনে বরিত হয়েছেন, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

এক.

মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৭৫ সালের পনের আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং ৩ নভেম্বর জেল হত্যাকাণ্ডের ফলে। এই হত্যাকাণ্ডগুলো, প্রথমত জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করে; দ্বিতীয়ত দেশে সামরিক শাসন জারি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয় এবং তৃতীয়ত বন্দুকের জোরে অবৈধ পন্থায় সংবিধানের যথেচ্ছ পরিবর্তন করায় দেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ধারা নির্বাসিত হয়। দেশ কার্যত পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ধারায় প্রত্যাবর্তন।

পঁচাত্তরের পর এই সঙ্কট মোকাবেলায় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ এবং পুনর্জাগরিত করার মতো কোনো গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব ছিল না। অস্তিত্বের সঙ্কটে আওয়ামী লীগ ছিল কাণ্ডারিবিহীন নৌকার মতো আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে দলাদলি ছিল চূড়ান্ত। কেউ কাউকে মানছিল না। ঠিক এই সময়ে, ১৯৮১ সালে তার অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সর্বসম্মতি ক্রমে শেখ হাসিনা দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশ ও দলের ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ১৭ মে, ১৯৮১।

দল পরিচালনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া মাত্র ৩৪ বছর বয়সে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই শেখ হাসিনা প্রস্তুত ছিলেন না। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম এবং ছাত্র আন্দোলনের সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়েই এক দুর্গম পথে তিনি যাত্রা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং সেক্যুলার গণতান্ত্রিক মহলে তার প্রতি একটা আবেগাশ্রিত সহানুভূতি ছিল।

উৎসব '৯৮

সূচি

রবীন্দ্র গোপ : মানবতার মা শেখ হাসিনা ১৭
অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী : শেখ হাসিনা–রাজনীতিবিদ থেকে দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ৫৮
অধ্যাপক এমিরেটাস ড.এ.কে আব্দুল মোমেন : বিশ্ব পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধু কন্যা ৭১
অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী : অনন্য ছাত্রনেত্রী ৮০
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী : বাংলাদেশ ভবন শান্তিনিকেতনে শান্তির পায়রা ৮৩
বঙ্গবন্ধুকন্যা শুধু পলিটিশিয়ান নন স্টেটসম্যানও ৮৮
আবদুল মান্নান : তিনি এখন বাংলাদেশের জানালা ৯৩
আবেদ খান : শতাব্দীর 'জোয়ান অব আর্ক' ৯৫
আয়াত আলী পাটওয়ারী : যা বলি তা কি সত্য কথা? ১০১
ইমদাদুল হক মিলন : তিনবিঘা করিডর : খুলে গেল স্বপ্নের দরজা ১০৬
বঙ্গবন্ধুকন্যার প্রতি ভালোবাসা ১১০
এম. নজরুল ইসলাম : শারদদিনের প্রণতি ১১৪
কাজী রোজী : মনে কী পড়ে অভিন্ন বন্ধু আমার ১১৭
খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ : আদরের কন্যা থেকে জননেত্রী ১১৯
গোলাম কুদ্দুছ : অন্তবর্তী সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাব ১২৩
টিপু খন্দকার : তাঁর জন্মদিনে ১২৮
ড. আবদুল ওয়াহাব : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা : প্রতিভা, নেতৃত্বের বহুমাত্রিক দ্যুতি ১৩৪
ড. আতিউর রহমান : মানবকল্যাণে সদা সোচ্চার ১৪৭
ড. আবুল হাসনাৎ মিল্টন : শেখ হাসিনা : উত্তাল সমুদ্রে প্রতিকূল স্রোতের মাঝি ১৫৩
ড. মুহাম্মদ সামাদ : তুমি জনগণমননন্দিত নেত্রী তুমি ভূমিকন্যা ১৫৭
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : ক্রান্তিকালের সফল কাণ্ডারি ১৬৬
ড.শফিক সিদ্দিক : রাজনীতিতে শেখ হাসিনার অভিষেক ১৭১
ড. শিহাব শাহরিয়ার : শেখ হাসিনা ১৯০
ড. হারুন-অর-রশিদ : শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাঁইত্রিশ বছর ॥ কী পেল বাংলাদেশ ১৯৪

ডাঃ কামরুল হাসান খান : মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় শেখ হাসিনার অবদান ২০১
তপন রশীদ : শেখ হাসিনার সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের দিনবদল ২০৮
তোফায়েল আহমেদ : জয়যাত্রায় জননেত্রী ২১৪
নজরুল ইসলাম : প্রধানমন্ত্রীর অর্জন ২২১
নাসির আহমেদ : শেখ হাসিনা : ঝড়ের আকাশে শান্তির সাদা পায়রা ২২৯
নূহ উল আলম লেলিন : শেখ হাসিনা গৌরচন্দ্রিকা ২৩৫
প্রত্যয় জসীম : জীবনজয়ী সর্বমঙ্গলা চিরায়ত বোন আমার... তোমার মুখ দেখলেই-দেখি মুখ বাংলার ২৬৫
ফরিদ আহমদ দুলাল : জননেত্রী শেখ হাসিনা : বাঙালির নিজস্ব সংগ্রাম ২৬৯
মমতাজ উদদীন আহমদ : যাঁর কোনো বিকল্প নেই ২৭৫
মিজানুর রহমান খান : অনন্য সাধারণ সীমান্তজয়ী ২৭৯
মুনতাসীর মামুন : কেন আমি শেখ হাসিনাকে সমর্থন করি ২৮৪
মুহম্মদ শফিকুর রহমান : সৎ রাষ্ট্রনেতার প্রতীক ৩১৩
মুহম্মদ সবুর : খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের খোঁজে রবীন্দ্রনাথ থেকে শেখ হাসিনা ৩১৭
মোনায়েম সরকার : সুবর্ণ সত্তরে স্বাগত ৩২৩
মোহাম্মদ নাসিম : উন্নয়নের কারিগর ৩২৮
মোস্তাফা জব্বার : শেখ হাসিনা বাংলার স্বর্ণকন্যা ৩৩২
রশীদ হায়দার : যেতে হবে বহুদূর ৩৩৮
র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী : জনগণের নেতা ৩৪১
শামসুজ্জামান খান : বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে শেখ হাসিনা ৩৪৯
শেখ হাসিনা : বিবিসিতে সাক্ষাৎকার জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে কাজ করছি ৩৫৫
শেখ রেহানা : আমার হাসু আপা ৩৬২
সরদার সিরাজুল ইসলাম : কাণ্ডারি যখন শেখ হাসিনা ৩৬৭
সুভাষ সিংহ রায় : শেখ হাসিনা : চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ৩৭১
সেলিনা হোসেন : দূর থেকে দেখা ৩৯১

মানবতার মা শেখ হাসিনা

আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মিক-মানবীয় উৎকর্ষের কারণও ঐ বাংলার চিরসুন্দরময় গ্রামীণ কৃষকের গার্হস্থ্যজীবন। তাঁর মহানুভবতার আর এক কারণ তাঁর মহান পিতা ও মহিয়সী মাতার জীবনাদর্শ। প্রকৃতি ও মানুষ, মানুষ ও প্রকৃতির সংশ্লেষে বাংলার কৃষকের জীবন সংগ্রাম মানবিকতার আকর উপাদান। এরই মধ্যে অবগাহন শেখ হাসিনার শৈশব-কৈশোরকাল। এ সবই তাঁর অন্তরে বপন করে মানুষকে ও দেশকে ভালোবাসার বীজমন্ত্র। বনজঙ্গল, বিল-হাওড়, পাখপাখালি, গাছগাছালির ছায়ায় ঘেরা সুন্দর-মনোরম, প্রাকৃতিক ও সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনের এক প্রাণজ্জোল বর্ণনা পাই। শেখ হাসিনার ভাষায় : নদীর পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান-পাট-আখ ক্ষেত সারি সারি খেজুর, তাল-নারিকেল-আমলকি গাছ, বাঁশ– কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতাপাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসের চিকন লম্বা লম্বা সতেজ ডগা শালিক-চড়ুই পাখিদের কল-কাকলি, ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘুর ডাক। সব মিলিয়ে ভীষণরকম ভালোলাগার একটুকরো ছবি যেন। আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে এ টুঙ্গিপাড়া গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল-সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়ে উঠি।

স্বভাবসুলভ হাসি, লোকদর্শনজাত উদার নৈতিকতা, মানবতা, সরলতা ও সহজিয়া জীবনদর্শন তাঁর জীবনের অনন্য বেশিষ্ট্য। যেমন মিষ্টি তাঁর চেহারা তেমনি দেশের সকল মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার প্রমাণ তাঁর মিষ্টি মধুর হাসি। স্বজন হারানোর দুঃসহ বেদনা এবং ক্লান্তিহীন জীবন সংগ্রাম তাঁকে এতটুকু মলিন করতে পারে নি। পিতার মতোই জীবনের সমূহ ঝুঁকি সত্ত্বেও দুঃখী-বঞ্চিতজনের তথা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানো তাঁর জীবনের গুরু দায়িত্ব। সৃষ্টিকর্তা পিতার মতো তাঁকেও যেন এই মহান দায়িত্ব দিয়ে মাটির পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। লালন বলেছেন, জীবনের ব্রত হতে হবে সত্য ও সুন্দরের সাধনা, তাহলেই পাওয়া যাবে মানুষের দর্শন-বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। তাঁর সুযোগ্যকন্যাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁর বিদুষী মাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবও

ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, দয়াময়, মমতাময় ও দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা দিয়েছেন মহীয়ষী এই নারী আজন্ম বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য সাধনা করেছেন।

মানবতার মা

তুমি মাতৃময়ী শান্তির প্রতীক প্রতিমা সুন্দর
তুমি আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাত্রী মমতাময়ী
মানবতার মা তুমি, মঙ্গলময়ী কল্যাণীয়
তুমি বিশ্বে শান্তির গৌরবে জাতিকে করেছো মহিমান্বিত।

বঙ্গবন্ধুর রক্তধারায় তুমি প্লাবিত ঢেউয়ের চূড়া
তুমি ভাঙো অসাম্যের যত ব্যবধান দূর কর অন্ধকার
ক্ষুধার্ত মানুষেরে দাও অন্ন, তুমি বিপন্ন মানবতার বাতিঘর
তুমি আগুনে পোড়া মানুষ ঘরছাড়া মানুষেরে নাও বুকে টেনে।

তোমার কর্মে তোমার সাহসে তোমার ভালোবাসা বিশ্বাসে
বিশ্বজয়ী দুর্গতি নাশিনী, বঙ্গবন্ধুই যেন নিঃশ্বাসে
বিশ্বাসে আবার আবির্ভূত তোমারই মাঝে মাতৃরূপে
তোমার মুখশ্রী ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের সবুজে শ্যামলে
ফুটে ওঠে ভোরের রক্তিম সূর্য তুমিই বাংলা মা
বাংলার মানুষের ছায়া সুনিবিড় শান্তি নীড়।
নীড়হারা পাখিদের সীমানা ছাড়িয়ে আশ্রয় তোমার
তোমার পিতার উদারতা তোমার মাঝেও আজ
এতশত মানুষ আগুনে পোড়া ঠিকানা হীনেরা
তোমার অন্তরে খোলা দরজায় অবাধ প্রবেশ।

তুমিতো মা মানবতার শেষ ঠিকানা আজ তুমি
তুমি বিশ্ব নন্দিত শান্তির প্রতীক প্রতিমা মাতৃময়ী দেবী।

১৯৮১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো একটি সুবৃহৎ রাজনৈতিক দলের সভাপতির পদ অলংকরণের সময় থেকেই তাঁর জীবনের গতিধারা আমূল পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পিতার মতোই তাঁর দলের লক্ষ নির্ধারণ করা হয় গ্রামবাংলার দুঃখী ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তি এবং অনেক রক্তের দানে অর্জিত বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা, গণতন্ত্র সমুন্নত রাখা। এ এক পর্বত প্রমাণ কাজ। এরই মধ্যে শেখ হাসিনার লেখক সত্তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। কেননা তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণদানকারী শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। এ ভাষণ তৎকালে স্বাধীনতাকামী বাঙালির উদ্দীপনায় সঞ্চার করেছিল আলোর গতি। কাজেই তাঁর রক্ত-মজ্জায় লেখক ও নেতৃত্ব দুই সত্তাই যুগপৎ উদয়িত। তাঁর রচনাবলীর ভূমিকার কিয়দংশ এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

বই পড়ার অভ্যাস আমার শৈশব-কৈশোর থেকে এবং সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়া করায় আমি এ-ভুবনে একজন মুগ্ধ অনুরাগী শুধু। কোনো দিন নিজে লেখক হব একথা ভাবিনি। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম আমার । পিতা জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে বড় হয়েছি। একদিন যে আমাকেও তাঁর মতো রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে ভাবিনি। সময়ের দাবি আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। পিতার স্বপ্ন ছিল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো। আমি এই আদর্শ নিয়ে ২৮ বছর যাবৎ জনগণের সেবক হিসেবে রাজনীতি করে যাচ্ছি। আমার এই দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি, অভিজ্ঞতাও ভিশনকে সামনে রেখেই এই লেখাগুলো তৈরি করেছি।'

প্রকাশিত বই

১.ওরা টোকাই কেন (১৯৮৭), ২. বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম (১৯৯৩), ৩. দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা (১৯৯৩), ৪. আমার স্বপ্ন, আমার সংগ্রাম (সম্পা) (১৯৯৩), ৫. পিপল অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (১৯৯৭, ৬. আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি (১৯৯৮), ৭. বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন (১৯৯৯), ৮. ডেভেলপমেন্ট অব দ্য মাসেস (১৯৯৯), ৯. সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র (১৯৯৯), ১০. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন (২০০১), ১১. বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা (২০০২), ১২. ডেমোক্রেসি

ইন ডিসট্রেস, ডিম্যান্ড হিউম্যানিটি (২০০৩) ১৩. সহেনা মানবতার অবমাননা (২০০৩), ১৪. লিভিং উইথ টিয়ার (২০০৮), ১৫. বাংলা আমার আমি বাংলার (সম্পা:) (১৯৯৮), ১৬, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে শেখ মুজিবুর রহমান (সম্পা:) (১৯৯৮), ১৭. MILES TO GO, hat of the people's republic of Bangladesh (1998), 18. Democracy in Sistress: Demeaned Humanity, Agamee Prokashani, Dhaka (2003) এবং ১৯. সবুজ মাঠ পেরিয়ে, মাওলা ব্রাদার্স, (২০১১)।

রচনাবলী : শেখ হাসিনার রচনাসমগ্র (১ম খণ্ড), মাওলা ব্রাদার্স (জানুয়ারি ২০১০), শেখ হাসিনার রচনাসমগ্র (২য় খন্ড), মাওলা ব্রাদার্স (জানুয়ারি ২০১০)।

আমাদের পরমপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার লেখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামবাংলার হতদরিদ্র দুঃখী-অসহায় মানুষের করুণ জীবনগাঁথা, পারিবারিক বিপর্যয় এবং বাল্য-কৈশোরকালের স্মৃতির কথা। তাঁর চিন্তা-চেতনায় সর্বদা মানুষের মঙ্গল, সত্য ও সুন্দরের কথা মূর্ত। তিনি যেমন শক্ত হাতে রাষ্ট্রের হাল ধরেছেন তেমনি তাঁর লেখনীও নিরন্তর বহমান। তাঁর গদ্যের সরল ও প্রাঞ্জল ভাষাশৈলীতে সরল জীবনযাপনের ও মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার প্রমাণ মেলে তাঁর লেখার বিষয় নির্বাচনেও মানব প্রীতির লক্ষণ বিদ্যমান।

পুরস্কার ও সম্মাননা

এ যাবৎ শেখ হাসিনার প্রাপ্ত পুরস্কার, সম্মাননা ও ডিগ্রিসমূহ :

আইন বিষয়ে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৭); ঐ, ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান (১৯৯৭); সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অহিংস, ধর্মীয় সম্প্রতি ও গণতন্ত্র বিকাশে অবদানের জন্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (মহাত্মা গান্ধি) পুরস্কার, মাহাত্মা গান্ধি ফাউন্ডেশন, নরওয়ে (১৯৯৮); পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইউনেস্কো হুফে-বোইনি শান্তি পুরস্কার (১৯৯৮); মাদার তেরেসাঁ পুরস্কার, নিখিল ভারত শান্তি পরিষদ (১৯৯৮); হেড অব স্টেট মেডেল (১৯৯৬-৯৭), আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব থেকে মেডেল অব ডিস্টিঙ্কশন (১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৮-৯৯), দেশীকোত্তম (ধরিত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৯); সমাজসেবায় অবদানের জন্য

আইন বিষয়ে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া (১৯৯৯); শান্তি ও গণতন্ত্রে অবদানের জন্য আইন বিষয়ে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৯); উন্নয়নে নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতার জন্য মর্যাদাসম্পন্ন পার্ল এস বার্ক পুরস্কার, ব্যান্ড লফ ম্যাকন ওসেন্স কলেজ, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৯); ক্ষুধা ও দারিদ্র বিরোধী সংগ্রামে অবদানের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সেরেস পদক (১৯৯৯); গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাসেলস (২০০০); মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ডক্টর অব হিউম্যান রেটারস, বিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র (২০০০); এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, আফ্রো-এশিয়ান ল'ইয়ার্স ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (২০০০); বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট ডিগ্রি (২০০১); মেডেল অব ডিস্টিংশন, আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব (১৯৯৬-১৯৯৭); ডক্টর অব হিউম্যান লেটারস, ব্যারি ইউনিভারসিটি, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র (২০০৪); কংগ্রেশনাল মেডেল, ম্যানিলা, ফিলিপিনস (২০০৫); ডক্টর অব সাইন্স, পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভারসিটি, মস্কো, রুশ ফেডারেশন (২০০৫); রোটারি ইন্টারন্যাশনার থেকে পল হ্যারিস ফেলো; ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক শান্তি পদক (২০০৯); মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সমজোতার জন্য ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণপদক এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ভারত ২০০৯; সেন্ট পিটার্সবার্গ সেইট বিশ্ববিদ্যালয়, রুশ ফেডারেশন (২০১০) থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, (২০১০); বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে অবদান রাখার জন্য এশিয়ান ও সোনিয়া কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন থেকে আইটি পুরস্কার (২০১০); জাতিসংঘ কর্তৃক মিলিনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল্ড (২০১০), আন্তর্জাতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য ; সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি (২৩ শে নভেম্বর ২০১০); বিশ্ব মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদানের জন্য 'সাউথ সাউথ' পুরস্কার (১৯ শে সেপ্টেম্বর ২০১১); গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দূরদর্শী নেতৃত্ব, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা, আঞ্চলিক শান্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্চ মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে অনবদ্য অবদানের জন্য ইংল্যান্ডের হাইস অফ কমনস "গ্লোবাল ডাইভার্সিটি এওয়ার্ড (২৬ শে জানুয়ারি ২০১০); বাংলাদেশে গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য

প্যারিসের দফিয়োঁ বিশ্বদ্যিালয় কর্তৃক স্বর্ণপদক (২৬ শে মে ২০১১) এবং বাংলা একাডেমির জীবনসদস্য, বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবে বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ (৩০ শে ডিসেম্বর ২০১১, সম্মানসূচক ডিলিট, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত (১২ই জানুয়ারি, ২০১২)- এ ভূষিত হন।

শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব সন্ত্রাস দমনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ২০০৯ সালে তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সন্ত্রাস দমনে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। তাই বিগত ২০০২-০৮ সালে বহির্বিশ্বে প্রচারিত নেতিবাচক পরিচয় ছাপিয়ে বাংলাদেশ আজ একটি অগ্রসরমান, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার রক্ষাকারী দেশ হিসেবে বিশ্বপরিমণ্ডলে খ্যাতি অর্জন করেছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন ১৩ ও ১৪ই নভেম্বর ২০১১, বাংলাদেশ সফরকালে জোর দিয়ে বলেছেন উন্নয়নশীল বিশ্বে বাংলাদেশ একটি 'মডেল দেশ'। জার্মান প্রেসিডেন্ট ক্রিশ্চিয়ান ভুলফ ২৮ থেকে ৩০ শে নভেম্বর ২০১১ বাংলাদেশ সফরে এসে বলেছেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি 'স্থিতিশীল নির্ধারক শক্তি'।

বর্তমানে বাংলাদেশে অভাবনীয়ভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। সমাজ-সংস্কৃতি ও গবেষণাও বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণে সফল ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে গঠিত শেখ হাসিনার সরকার কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় প্রভূত পরিমাণ অগ্রগতি সাধন করেছিল। ২০০৯-২০১৩ মেয়াদের কৃষি, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, শিল্প ও সামাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা অর্জনের পথে। শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য ২০১০ সালে জাতিসংঘ পুরস্কার এবং নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি সফল ব্যবহারের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১১ সালে জাতিসংঘ 'সাউথ সাউথ' পুরস্কার অর্জন করে। কৃষিঋণ, কৃষি উপকরণ, সার, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সহায়তার কারণে ২০১১ সালে খাদ্য উৎপাদনে রেকর্ড পরিমাণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে; এমনকি বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পথে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নত করতে পারলে এদেশ থেকে দারিদ্র ও ক্ষুধা একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতিসংঘের বাংলাভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। এতে করে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক বন্ধন ঘটে এবং এ দাবি আরো জোরদার হয়। এ

ছাড়া ২২ শে ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জাতিসংঘের ৬৬তম অধিবেশনের ভাষণে শেখ হাসিনা 'জনগণের ক্ষমতা ও উন্নয়ন শিরোনামের মডেল উপস্থাপন করেন। মডেলটি উক্ত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক মহলের এইসব স্বীকৃতি শেখ হাসিনার দেশপ্রেম ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের ফল।

আগামী দিনের সুখী-সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন শেখ হাসিনা তাঁর লেখায় কর্ম ও চিন্তায় জাতির কাছে তুলে ধরছেন। তিনি কাজ করছেন নিরলসভাবে তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে শিশু-কিশোর-তরুণ, শিক্ষক-অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবী, সচিব, ব্যবসায়ী, কৃষক-শ্রমিক থেকে শুরু করে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে দেশ গড়ার কাজে। আমরা সবাই মিলেমিশে এক সঙ্গে পুর্ণোদ্যমে যদি কাজ করি তাহলেই কেবল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া সম্ভব হবে। তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখবে সুখী-সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

শেখ হাসিনার সৎ বলিষ্ঠ এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই আজ বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। টাইম ম্যাগাজিনের বিবেচনায় তিনি বিশ্বের প্রভাবশালী দশ নারী নেত্রীর একজন মনোনীত হয়েছেন। অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তার দিক থেকেও শেখ হাসিনার সমকক্ষ হিসেবে কাউকে চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট-এর সর্বশেষ জরিপে দেখা যায় যে, ৭৭.৭ শতাংশ বিশ্বাস করে বাংলাদেশের সঠিক নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে, যা ২০১৫ সালে ছিল ৬২ শতাংশ। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা দিন দিন অপ্রতিরুদ্ধভাবে বেড়েই চলেছে। এমন নেতৃত্বের কারণেই মহাকাশে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রযুক্তিগতভাবে তার অগ্রসরতা জানান দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর 'জিরো টলারেন্স নীতি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুসংহত করার পাশাপাশি বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ গত দশ বছরে উন্নয়নের মহাসড়কে' যে পথ পাড়ি দিয়েছে, তাকে 'অসাধ্য সাধন' বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ১১ অক্টোবর (২০১৮) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০ জেলায় ৩৩টি প্রকল্পের উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। তাঁর কারণেই 'আমরাও পারি'

এই শাণিত বাক্যে দীক্ষিত আজকের প্রজন্ম। তিনি বলেছেন, আমি জানি না, পৃথিবীতে কোন দেশ এত অল্প সময়ে এত উন্নতি সাধন করতে পারে কিনা কিন্তু আমরা সেই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছি।' প্রকৃতপক্ষে গত দশ বছরে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন এবং দিনবদলের যাত্রা শুরু হয়েছে।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে শেখ হাসিনা এক সাহসী রাজনীতিকের নাম; যাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের বাংলাদেশ উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে চলেছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি পাল্টে গেছে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার রায় ঘোষিত হয়েছে (১০ অক্টোবর, ২০১৮)-এর আগে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড, জেল হত্যাকান্ড ও বিডিআর সদস্য কর্তৃক সেনাসদস্যদের হত্যার বিচারসহ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তরুণ প্রজন্ম প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপি-জামায়াতকে। বিএনপি-জামায়াতের সহিংস বীভৎসতাকে। অতীতে সহিংসতা, জ্বালাও পোড়াও আর পেট্রলবোমায় মানুষ হত্যা করে তারা থামাতে পারেনি যুদ্ধাপরাধের বিচার। দমে গেছে স্বাধীনতাবিরোধী জামাতের রাজনৈতিক তৎপরতা। শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নয়, কূটনীতিক দিক থেকেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে সব বিরূপ পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে এসেছেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় যুক্ত হয়েছেন অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান রাজনীতিক। কিছু বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও উন্নয়ন সহযোগী ও অংশীদার বানিয়ে ফেলেছেন রাশিয়াসহ অন্য অনেক দেশকে। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধুত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়েছে। ২০১৫ সালের মে মাসে স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা সে কথা আরও বেশি করে জানান দিচ্ছে। তাঁর সরকারের উন্নয়নের মডেল অন্যান্য দেশের কাছে প্রশংসিত হচ্ছে। পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল নির্মাণের অগ্রগতি দেশবাসীকে অবাক করেছে।

বর্তমান মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) প্রভাবশালী ব্রিটিশ সাময়িকী 'দ্য ইকোনমিস্ট'-এ প্রকাশিত 'পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ ওয়ান এ্যান্ড অনলি ওয়ান' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার শাসন ন্যায়সঙ্গত। সেটার কারণ দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের সফলতা। ১১অক্টোবর (২০১৮) প্রকাশিত সংবাদ থেকে আমরা জেনেছি, বিশ্বব্যাংকের 'মানবসম্পদ সূচক' বলছে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়নে ভারত ও পাকিস্তানের

তুলনায় এগিয়ে আছে। একটি শিশুর শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকে থাকার সক্ষমতা বিচার করে ভবিষ্যতে তার উৎপাদনশীলতা এবং আয়ের সম্ভাবনা বোঝার চেষ্টা করেছে বিশ্বব্যাংক। এর ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে তাদের 'মানবসম্পদ সূচক' দেখানো হয়েছে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে এখন যাদের বয়স ১৫ বছর, তাদের মধ্যে ৮৭ শতাংশের প্রত্যাশিত আয়ু হবে ৬০ বছরের বেশি। এদিক দিয়ে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা রয়েছে একই কাতারে। ভারতে এই হার ৮৩ শতাংশ, পাকিস্তানে ৮৪ শতাংশ, নেপালে ৮৫ শতাংশ। বাংলাদেশে প্রতি ১০০ শিশুর মধ্যে ৬৪জন কোন ধরনের শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বেড়ে ওঠে। ভারতে এই সংখ্যা ৬২, পাকিস্তানের ৫৫, শ্রীলঙ্কায় ৮৩। এই সূচকে উন্নতির অন্যতম কারণ হলো– শেখ হাসিনার আমলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিনিয়োগ বেড়েছে। ২০০৯ সালে তিনি ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে দারিদ্রের হার দ্রুত কমে এসেছে।

দেশের দুটি ধারার রাজনৈতিক বলয়ের একটির লক্ষ্য, বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। অন্যদিকে আরেকটি শক্তির অভিলাষ- যে কোন মূল্যে ১৫ কিংবা ২১ আগস্টের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়া। এসব দুষ্কৃতকারী সবসময় দেশের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে চেয়েছে। বিশেষত ১৯৮১ সালের ১৭ মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ১৯ বার শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত হত্যার প্রচেষ্টা ও হুমকির মধ্যেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে- এটা নিশ্চিত। তাই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল অশুভ শক্তির মোকাবেলা করতে হবে। সামনে বাধা এলে তা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলায় সচেষ্ট থাকতে হবে।

৭১-এর পরাজিত শক্তিরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে দেশের স্বাধীনতা ও স্বপ্নকে হত্যা করতে চেয়েছিল। শেখ হাসিনা জীবিত রয়েছেন। তিনিই তাঁর পিতার স্বপ্নের সোনারবাংলা গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু' ৭১ এর পরাজিত শক্তিরা বসে নেই। ষড়যন্ত্রকারীরা নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে। তাই সকলকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে

হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ আমরা পারি, আমরা নির্ভীক ও আমাদের গতি অদম্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্জনের ফল, স্বপ্নজয়ের আকাঙ্ক্ষা আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি। প্রায় শতকরা ৮৮ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে শুরু করা বাংলাদেশে এখন দারিদ্র্যের হার শতকরা ২১.৪ ভাগ। তাই এদেশ স্বপ্ন দেখছে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে নাম লেখাতে যে চেষ্টা আর উদ্যম ছোট্ট এই ভূখন্ডে তাকে বড় কোন স্বপ্ন নয় বলেই মনে করছেন বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্লেষকরা।

আমরা এখন অদম্য বাংলাদেশের বাসিন্দা। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছে, যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, দীর্ঘতম পদ্মা সেতু যার গৌরবে পরিণত হতে যাচ্ছে, দেশের তৈরি পোশাক বিদেশিদের গায়ে পরিধেয় বস্ত্র হচ্ছে, বিশ্বদরবারের প্রথম কাতারে ব্যবসায়-বাণিজ্য, গবেষণা ক্রীড়া সব ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় উগ্রবাদিতা আর পেট্রলবোমার সন্ত্রাস আমাদের মনোবলকে ধ্বংস করতে পারেনি। নেতিবাচক কোন অভিঘাতই অদম্য বাংলাদেশের মেরুদন্ডকে বাঁকা করতে পারছে না। এখন দরকার সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং স্বাধীনতার পক্ষে চেতনার সরকার ও বিরোধী দল। 'আমরা উন্নয়নের যে মহাসড়কে যাত্রা শুরু করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে। আর পেছনে ফিরে তাকানোর সুযোগ নেই। বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে সকল বাধা দূর করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বলেছেন দ্বিতীয় মেয়াদেও ৪ বছর পূর্ণ হওয়ার পর। তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর (২০১৮) জাতিসংঘের ভাষণে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদসহ সকল সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ওই অভিব্যক্তি জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন নীতিমালার প্রতি আমাদের সমর্থনকে আরও বেশি বেগবান করেছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে মোকাবেলা করার শক্তি যুগিয়েছে। উক্ত ভাষণে তিনি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বয়স্ক নারী পুরুষ, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা দেয়ার কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন অসহায় মানুষকে সহায়তা করা গৃহহীন মানুষের আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ প্রান্তিক

জনগোষ্ঠীর মাঝে উদ্ভাবনী আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপসমূহের কথা বলে আমাদের এগিয়ে চলার চিত্র অঙ্কন করেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের কথা ও বলেছেন । জাতীয় সংসদে যেমন ৭২ জন নারী সদস্য তেমনি তৈরি পোশাক শিল্পে ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাও অনেক।

বঙ্গবন্ধু যেমন সারাজীবন কঠিন উজান ঠেলেছেন, শেখ হাসিনাকেও তেমনি উজান ঠেলে একটু একটু করে অগ্রসর হতে হয়েছে এবং হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আরও কঠিন সময় অপেক্ষা করছিল শেখ হাসিনার জন্য। কোটালীপাড়ায় তার জনসভায় পুঁতে রাখা হলো বিশাল আকৃতির বোমা। কুষ্টিয়ায় বোমা হামলা হলো। সারা দেশে যেন বোমার খই ফুটতে লাগল। টার্গেট প্রগতিশীল শক্তি। টার্গেট হাসিনা।

নতুন শতকের প্রথমদিকে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তি জামায়াতকে নিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় এলো। দেশে যেন কেয়ামত নেমে এলো। একদিনে ৬৩ জেলায় সিরিজ বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। সজ্জন অর্থমন্ত্রী শাহ কিবরিয়া বোমার আঘাতে প্রাণ হারালেন। জেলায় জেলায় জজ সাহেবরা বোমাতঙ্কে ভুগতে লাগলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর রক্তবীজ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগ এ যেন অসহ্য! দলটির ওপর দ্বিতীয়বারের মতো মরণ আঘাত হানল সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রকারীরা। এবার আর বোমা নয়। রণাঙ্গনে ব্যবহৃত গ্রেনেড! আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে গ্রেনেডের বৃষ্টি ঝরল। গ্রেনেডের বিকট শব্দে শেখ হাসিনার শ্রবনেন্দ্রিয় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রাণে বেঁচে গেলেন তিনি। আবারও প্রমাণ হলো, রাখে আল্লাহ মারে কে? শেখ হাসিনা বিপদের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন। বিপদ মাথায় করেই পথ চলছে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে তিনি হয়তো কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠবেন, 'কঠিনেরে ভালবাসিলাম'।

শেখ হাসিনার সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য সম্ভবত বেয়নেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সংবিধানে পুনঃযোজন। মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু, তাঁর স্বজন-সহকর্মীসহ শত শত মানুষকে হত্যা করে এবং দেশে সন্ত্রাসের বিভীষকা ছড়িয়ে দিয়ে। অথচ মূলনীতি পুনরুদ্ধার করা হলো সম্পূর্ণ করা হলো সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়ায়। ভীতির বিভীষিকা সৃষ্টি করে নয়। সভ্য আইনি প্রক্রিয়ায় চার মূলনীতি সংবিধানে সংযোজন কর্মে কর্তব্যরত অনেক দেশপ্রেমিক সুধীজনের বিরাট অবদান রয়েছে। এ

অবদান হিংসার বিরুদ্ধে যুক্তির অবদান। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তির অবদান। পশুত্বের বিরুদ্ধে মানবতার অবদান। পশ্চাদগামিতার বিরুদ্ধে প্রগতির অবদান। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সভ্যতা বিনির্মাণে অবদান রাখা অনেক মানুষের বিরাট মিছিলে সাহসী রাজনৈতিক নেতৃত্বে রয়েছেন শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনার সাহসিকতা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। এটি একটি অসাধ্য সাধন। তিনি হত্যার প্রতিশোধ নেননি। বরং জঘন্য অপরাধের বিচার করেছেন। এটি আইনের দাবি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' লাভ করেছেন। চারটি ক্যাটাগরিতে এ সম্মান প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন নীতিগত ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিনিয়োগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎকৃষ্ট। অন্য ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে বিজ্ঞান, ব্যবসায় ও সিভিল সোসাইটি। এক্ষেত্রে অন্যতম পুরস্কার বিজয়ী হচ্ছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতো খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যখন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়, তার তাৎপর্য হয় বহুমাত্রিক। এর প্রভাব অভ্যন্ত রীণ ক্ষেত্রে যেমন পড়ে, তেমনি বিশ্বসমাজেও নানাভাবে অনুভূত হয়। উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম ২০০৯ সালে ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন-নাপা এবং পরে ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজিক পেপার তৈরি করতে পেরেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১১ সালেই বিশদ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এটাও মনে রাখতে হবে-কেবল অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বৈশ্বিক পর্যায়ে যে আলোচনা ও দরকষাকষি চলছে সেখানেও শেখ হাসিনা সবসময় বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করে চলেছেন। বাংলাদেশের সম্পদ অপ্রতুল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ সমস্যা মোকাবিলায় যে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে,এখন পর্যন্ত তা রক্ষায় যথেষ্ট পদক্ষেপ আমরা দেখছি না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এ খাতে নিজস্ব সম্পদ বরাদ্দ করে কাজ চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প। স্থাপন করেছেন ক্লাইমেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ড। এটা হয়তো কাকতালীয়, জাতিসংঘ

পরিবেশ কর্মসূচি নিউইয়র্কে ২৭ সেপ্টেম্বর যে সময়ে তাঁকে পরিবেশ বিষয়ে নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ সম্মানে ভূষিত করেছে, তখন বাংলাদেশের দিনপঞ্জিতে ২৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে গেছে। আমরা জানি, এ দিনেই তিনি জীবনের ৬৮ বছর পূর্ণ করেছিলেন। বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জন্মদিনের যোগ্য পুরস্কার পেলেন তিনি। আর সেটা পেয়েছেন প্রিয় স্বদেশভূমিকে বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের জন্য বসবাসের উপযোগী করতে এবং টিকিয়ে রাখতে। জলবায়ু-যুদ্ধে তিনি এখন বৃহত্তর পরিসরে নেতৃত্ব দেবেন- এটাই প্রত্যাশা। এটা ছাড়া জনবন্ধু শেখ হাসিনা মাদার অব দ্য হিউম্যানিটি সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাকে পৃথিবীর ২০তম ক্ষমতাবান মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার অর্থ হচ্ছে কৃষিতে সাফল্য-এমনটি আজ সর্বমহলে স্বীকৃত। তার আমলেই যুগ যুগের খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এজন্য নীতিগত ধারাবাহিকতা ও পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল এবং সম্ভাব্য সবকিছুই তিনি করেছেন। কৃষকদের প্রতি তার রয়েছে অপরিসীম মমত্ববোধ। বাংলাদেশ আজ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে সুপেয় জলের মৎস্য উৎপাদনে। ২০১৬-১৭ সালে ৪১.৫ লক্ষ টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে যার মধ্যে ইলিশের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টন।

উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনে তাদের ভূর্তকি দিতে হবে-এ প্রশ্নে তিনি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অভাবনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। কৃষকদের উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা দেব-এ নীতিগত প্রশ্নে তিনি আপসহীন। সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিও রয়েছে তার গভীর মনোযোগ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদর্শিত পথ ধরে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট রয়েছে। শিক্ষায় প্রসার ও মান বাড়াতেও যত্নবান। বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখন প্রায় পাঁচ কোটি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। উন্নয়নের সিঁড়িতে চলতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ চাই-এটা তিনি যথার্থভাবেই উপলব্দি করেন।

তার গণতান্ত্রিক মনোভারে আরেকটি পরিচয় আমরা পাই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের বিচারের

ক্ষেত্রে। অনেকেই এ জন্য সামারিট্রায়াল ধরনের পদেক্ষেপের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি চেয়েছেন বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ অবশ্যই যেন ল অব দি ল্যান্ড নীতিতে যথাযথভাবে অনুসৃত হয়। গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমাজ গড়ে তুলতে হলে এটাই যে একমাত্র পথ, সেটা তিনি অনুধাবন করেন বলেই এভাবে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবর রাজধানী ঢাকাতে নিয়ে আসার প্রস্তাবের ব্যাপারে তার অনাগ্রহের পেছনেও একই মনোভাব কাজ করছে। আমি নিজেও মনে করেছি যে বঙ্গবন্ধুর মরদেহ ঢাকায় স্থানান্তরিত হোক- অনেক অনেক মানুষের এমন ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। কিন্তু শেখ হাসিনা এর জবাব দেওয়ার জন্য জাতীয় সংসদের ফোরামকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কুচক্রী মহল অনেক টানাহেঁচড়া করেছে। তাকে মানুষের মন থেকে চিরতরে মুছে দেওয়ার অপচেষ্টাও কম হয়নি। তিনি তার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় শান্তিতে চিরনিদ্রয় শায়িত আছে। তার আত্মা এভাহৈ শান্তি পাবে।

জাতিসংঘের মহাসচিবসহ বিশ্বের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ তাঁর কথা শুনেছেন এবং এই মানবিক বিপর্যয় বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এরই মধ্যে খবর এসেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ নিরাপত্তা পরিষদের সাতটি সদস্য দেশ রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে বিশেষ একটি অধিবেশনের ডাক দিয়েছে। কয়েকদিন আগেও নিরাপত্তা পরিষদ এ বিষয়ে সর্বসম্মত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে (যেমন: অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল) তারা নিয়মিতভাবে রাখাইন অঞ্চলে যে অগ্নিসংযোগ ঘটছে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেসবের প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। আন্তর্জাতিক অপরাধবিষয়ক কৌশলগত ফোরাম আইসিএসএফ সেপ্টেম্বর (২০১৭) এক বিবৃতিতে মায়ানমারে চলমান 'গণহত্যা'র নিন্দা জানিয়েছে এবং বিশ্বসম্প্রদায়কে রুখে দাঁড়াতে বলেছে। বাংলাদেশে যেভাবে শরণার্থীদের সামলাচ্ছে তারা তারও প্রশংসা করেছেন। গণমাধ্যমগুলোও ইতিবাচক খবর ছাপছে।

সর্বশেষ বিশ্বখ্যাত 'দি ইকোনমিস্ট' লিখেছে : রুয়ান্ডার চেয়েও বেশি হারে রোহিঙ্গা শরণার্থীর বিগত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশে ঢুকেছে। আলজাজিরা, বিবিসি, সিএনএন, এনডিটিভি নিয়মিত খবর প্রকাশ করছে। ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেল এনডিটিভি শরণার্থীদের কাদামাখা পায়ের ছবি দেখিয়ে

প্রতিবেদন প্রচার করেছে যে, কি নিদারুণ কষ্ট করেই না শরণার্থীরা বাংলাদেশে এসেছে। নিজেদের সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও বাংলাদেশে এসেছে। নিজেদের সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও বাংলাদেশ এসব দুঃখী মানুষকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিচ্ছে। শুরুতে খানিকটা বিশৃঙ্খলা থাকলেও এখন শরণার্থী শিবিরে শৃঙ্খলা ও স্বস্তি ফিরে এসেছে। সেনাবাহিনী দায়িত্ব নিয়েছে। নানা দেশ থেকে ত্রাণ আসছে। কিন্তু বিদেশি ত্রাণের জন্যে বাংলাদেশ বসে থাকেনি। মানবকল্যাণে উচ্চকণ্ঠ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছুটে গেছেন রোহিঙ্গা ত্রাণ শিবিরে। নিপীড়িত মায়েদের শিশুদের তিনি বুকে আগলে নিয়েছেন। ঐদিন বিদেশি এক সাংবাদিক বঙ্গবন্ধু কন্যাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এই রোহিঙ্গাদের আপনি কতদিন রাখবেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "কতদিন? এরা সবাই মানুষ।" অন্য আরেক জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের যা আছে তাই আমরা শরণার্থীদের সাথে ভাগ করে খাবো। আর একারণেই বন্ধুবর শিশুসাহিত্যিক ও শিক্ষক মুহম্মদ জাফর ইকবাল হালে এক কলামে লিখেছেন, "পৃথিবীর সবাই লাভক্ষতির হিসাব করছে! আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই লাভক্ষতির হিসাব করেননি। একেবারে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, তিনি মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।" (দেখুন বাংলাদেশ প্রতিদিন, 'মানুষ মানুষের জন্য', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭)।

একটু গভীরভাবে যদি তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের দিকে তাকান তাহলেই বুঝতে পারবেন তিনি বরাবরই পিছিয়ে পড়া মানুষদের পক্ষে। তাঁর আমলে নেয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এমডিজি এসডিপি বাস্তবায়নের নীতি কৌশল, অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষক, ক্ষুদে ও মাজারি উদ্যোক্তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি গ্রহণে তাঁর যে অনুপ্রেরণা আমরা (কেন্দ্রীয় ব্যাংকাররা) পেয়েছি তাতে প্রধানমন্ত্রীর জনকল্যাণী ভাবনার প্রতিফলন লাভ করেছি। দক্ষিণ বাংলায় জলবায়ু পরিবর্তনের চাপে দারিদ্র্য বেড়েছে। আর সে কারণে নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের সাহসী পদক্ষেপ নিতে তিনি দ্বিধা করেননি। সামান্য পিছপা হননি। কেননা তিনি জানেন, এই সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণ বাংলায় শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। আর তার ইতিবাচক প্রভাব সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার ওপর পড়বে।

এবারে জাতিসংঘের একটি অনুষ্ঠানে তিনি সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার কথাও বলেছেন। হোলি আর্টিজানের মর্মান্তিক সন্ত্রাসী হামলার পর যখন পুরো জাতির মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশ ছেড়ে যাবার কথা ভাবছিলেন, তখন তিনি দশ হাতে এই মানবতার শত্রুদের দমনে নেমে পড়েন। আর কে না জানেন ধর্মীয় উগ্রবাদী এই সন্ত্রাস দমনে কতটা সফল। সবমিলে তিনি আজ আমাদের শুধু জাতীয় নেতাই নন, বিশ্ব নেতাও বটে। " আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে ক্রমেই তিনি নিয়ে যাচ্ছেন অনন্য উচ্চতায় এবং বিশ্বে তিনি নন্দিতও হচ্ছে সেইভাবে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছেন তাঁর নানামুখী দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের কারণে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্ত বায়নের মাধ্যমে। (মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, গণতন্ত্রের বহ্নিশিখা শেখ হাসিনা, ২০১৬, পৃ.২১)। একই সুরে প্রবীণ সাংবাদিক সাহিত্যিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ঐ একই প্রকাশনায় লিখেছেন, "আমার বিশ্বাস, হাসিনার শাসনামল একদিন অতীতের হোসেনশাহী শাসনামলের মতো বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে সংযুক্ত হবে।" (ঐ পৃ.৩৩)। সমাজবিজ্ঞানী অনুপম সেনের মতে, "শেখ হাসিনা একইসঙ্গে বজ্রের মতো কঠিন-কঠোর ও ফুলের মতো কোমল নেত্রী।

আর এভাবেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হয়ে যান মমতাময়ী এবং মানবকল্যাণে ব্রতী এবং অনন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক। তিনি তাঁর মানবকল্যাণী নীতি ও কর্মকাণ্ডের জন্যে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার, জাতিসংঘের আইসিটি পুরস্কার, ইউনেস্কোর 'ট্রি অব পিস' পুরস্কার, প্ল্যানেট ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি পুরস্কারসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রবক্তা শেখ হাসিনার বিশ্বমঞ্চে সরব উপস্থিতি সকলেরই চোখ পড়ছে। আমরা প্রত্যাশা করি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আরো অনেকটাই পথ পাড়ি দেবেন। শান্তি অন্বেষায় তাঁর এই অভিযাত্রা সফল হোক।

জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতীক। তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ যেভাবে বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল-তিনি দৃঢ় মনোবলে সে সব কিছু বাংলার মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনাও তিনি সামাল দিয়েছেন

দক্ষ হাতে। দুর্নীতি দমনে তার অর্জন মোটেই খাটো করে দেখার মতে নয় অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রাদর্শ যেমন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল-শেখ হাসিনার স্বপ্নও তা-ই। সেই লক্ষ্যেই তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া বাংলার জনপদে আজ তিনি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আন্দোলনের স্লোগান তুলে দেশের চেহারা বদলে দিয়েছেন। দেশের মানুষ প্রথম দিকে ডিজিটাল বাংলাদেশের মমার্থ বুঝতে দেরি করলেও আজ সকলেই স্বীকার করছে বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির এক নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও ল্যাপটপ জরুরি কাজ সমাধা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুর্বলের উপর সবলের খবরদারি এক ঐতিহাসিক সত্য। এই কথা দুর্বল দেশের বেলায়ও সমানভাবে প্রযুক্ত। বাংলাদেশের উপর অনেকেই অযৌক্তিক অভিভাবকত্ব প্রদর্শন করেছে এবং এখনো করতে চাচ্ছে। এদেশের নির্বাচন হলে. আমেরিকা পর্যবেক্ষণ করতে আসে, আসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। কিন্তু তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে আজ আমরা সকলেই জানি-আমেরিকাতেও নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তারাও খামখেয়ালের বশে এবং নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য দেশের উপর চাপিয়ে দেয় অন্যায় যুদ্ধ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গরিব দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন না-তারা ধনীদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন এতটাই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে যে, আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের রক্তচক্ষুকেও আর ভয় পায় না। বিগত কয়েক বছরে শেখ হাসিনা এ কথার প্রমাণ বহুবার বাংলাদেশের মানুষের সামনে রেখেছেন।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে তিনি সাধ্যের চেয়েও বেশি কিছু দিয়েছেন-সীমাহীন প্রতিকূলতার মুখে পদ্মাসেতু নির্মাণ কাজ শুরু যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি তারই সুযোগ্য নেতৃত্বের ফসল। উন্নয়নশীল বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালনার জন্য শেখ হাসিনার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাদেশকে শেখ হাসিনা দিয়েছেন অনেক কিছুই-কিন্তু বাংলাদেশ তাকে রক্তাক্ত-ক্ষত বিক্ষত করা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। আজ বাংলাদেশের সামনে সময় এসেছে নির্ভীক এই দেশপ্রেমীকে যথার্থ মর্যাদার শুভেচ্ছা জানানো।

বাঙালি জাতির প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে সংস্কৃতজন হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই আমাদের মুক্তি। আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রতিটি কর্মী যদি সংস্কৃতি সচেতন হয়ে ওঠেন-প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মী যদি লোকজীবনের আনন্দ-বেদনার খোঁজ রাখেন- প্রত্যেকেই যদি বঙ্গবন্ধুর মতো অকৃত্রিম ভালোবাসতে পারেন প্রতিটি বঙ্গসন্তানকে, তাহলে প্রত্যেকের মধ্যে জাগ্রত হবে দেশপ্রেম ভ্রাতৃত্ববোধ-পরমতসহিষ্ণুতা-ঔদার্য-সহনশীলতা। আমাদের রাজনৈতিক কর্মীরা যদি অন্তর দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসতে পারেন-বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলেই বাঙালির জীবনে মুক্তি আসা সম্ভব। আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একজন মানুষের কাছে কখনোই দেশের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে না। এসব আবেগস্পর্শী ভালোবাসার কথা জননেত্রী শেখ হাসিনা বেশ ভালোই জানেন, কেন না আমার ধারণা বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসুরী হিসেবে তিনি পিতার যে গুণগুলোকে উত্তরাধিকার হিসেবে অর্জন করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে আবেগ, দেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ, সাহস, সততা এবং মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। যে কারণে আমি এবং আমরাও তাঁকে ভালোবাসি-শ্রদ্ধা করি। আমরা তাঁর দলের কর্মী না হয়েও তাঁর মঙ্গল ও সাফল্য কামনায় একাত্ম হই। আমাদের বুকে স্বপ্ন জাগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, সেই স্বপ্ন হাতের মুঠোয় পাবার পথে তিনি এগিয়েও যাচ্ছিলেন। সেই স্বপ্নের পথের পদযাত্রায় বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে আমরা দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম; জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার অঙ্গিকার জানিয়ে আমাদের বুকের ভাঙা স্বপ্নকে শূশ্রূষা দিয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন; তাঁর পিতাকে তো আমরা বাঙালি জাতি অন্তর থেকে পিতা বলে স্বীকার করেছি। সঙ্গত কারণেই তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা থেকেই যায়।

সাম্প্রতিক একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে দু'টি কথা নিবেদন করতে চাই। বাংলাদেশের মিডিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে 'পদ্মাসেতু' নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। সে আলোচনার কথা সবই পাঠক জানেন। বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির কথা বলে পদ্মাসেতুর জন্য ঋণবরাদ্দ প্রত্যাহার করেছে। আর বাংলাদেশ সরকার বলছে কোনো দুর্নীতি হয়নি। তারপরও বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপত্র হিসাবে মন্ত্রী এবং আমলা সরানো হয়েছে।

অমর একুশে আজ বিশ্বজনের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির রক্তদান বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল ঘটনা। বাঙালির এই

বলিদান বৃথা যায়নি। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যথাযথ কার্যকর উদ্যোগ ও তৎপরতার কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজনীন সম্মান পেল। বাঙালির লাল সবুজের পতাকা আজ বিশ্বের দেশে দেশে উড্ডীন হবে হিরন্ময় অহংকারে বাঙালির এই ভাষাবিজয় যাঁর কল্যাণে হয়েছে তিনি আর কেউ নয় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার ভাষাকন্যা শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁরই কন্যা বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বাঙালির একুশ'কে প্রতিষ্ঠিত করে আরো একবার বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে সুমহান উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। আর এ জন্যেই যথার্থ অর্থেই তিনি আমাদের ভাষা কন্যা।

তুমি আমাদের আশ্রয়

আঁধার আচ্ছন্ন কাল থেকে কেটেছে কতটা অমবস্যা
বঙ্গবন্ধু'র আলোর বিচ্ছুরণ তোমাতেও প্রতিফলিত
মানুষের সংকটে, বিপদে তোমারই উপস্থিতির আলো
সে থেকে পূর্ণিমা চাঁদের মত তুমি
সূর্য কিরণের ছায়ায় আমাদের আলো দিয়ে যাও।

সাগরকে জয় করেছো-তোমার নেতৃত্বে তোমার মেধায়
বিপুল বিস্ময়ে বিশ্বকে নাড়িয়েছো- একাগ্রতার মন্ত্রে
পৃথিবীকে বুঝতে দিয়েছো, মানুষের ভালোবাসার চেয়ে
আর বড় কিছু নেই, হিংস্রতা গ্রেনেড বোমা আর বারুদ
কিছুই তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, মানুষের
ভালোবাসার কাছে সবই পরাজিত ।

কল্যাণের প্রদীপ শিখা সর্ব মাঙ্গল্যে প্রজ্জ্বলিত
তোমারই আশীর্বাদের আলোয় তাঁতি, জেলে, কামার কুমার
ভেতরের অন্ধকার তাড়িয়ে ভোরের পাখির ডাকে
যাত্রা করেছে শুরু হিমালয় সম পিতার ব্যক্তিত্বের কাছে

শিখেছ মহত্মকে মানবতাকে-সাগরের মত সীমাহীন তরঙ্গায়িত
হৃদয় তোমাকেও এনে দিয়েছে বিশালত্ব

আকাশের মত নীলাভ সৌন্দর্য-মণ্ডিত
নক্ষত্ররাজি তোমাকে করেছে উদার
তুমি মাতৃময়ী কল্যাণদাত্রী, আমাদের আশ্রয়ের ঠিকানা।

রাজনীতি ও রাষ্ট্রকর্মের বাইরেও অন্য এক শেখ হাসিনাকে আমরা চিনি। যিনি বাঙালির চিরচেনা আদর্শ জননী.. জায়া.. ভগিনী। দেশকে ভালোবেসে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাষা সাহিত্যের কৃতি ছাত্রী, সময় পেলেই তিনি সাহিত্য রচনা এবং সম্পাদনার মতো কঠিন কাজেও মনোনিবেশ করেন। 'স্মৃতির দখিন দুয়ার' মনোরম ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় এ শিরোনামের লেখাটি তিনি লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখাগুলো হলো, 'বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা', 'সহেনা মানবতার অবমাননা', 'ওরা টোকাই কেন', 'বাংলাদেশের স্বৈরতন্ত্রের জন্ম', 'সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র', 'দারিদ্র্য দূরীকরণঃ কিছু চিন্তা-ভাবনা', 'বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন,' আমার স্বপ্ন, আমার সংগ্রাম'। এইসব লেখায় বিশেষভাবে ধরা দিয়েছে, এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি এবং গণমানুষের জীবনচেতনা সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গী ও জীবনবীক্ষা। একটি সুখী সমৃদ্ধ উন্নত আধুনিক ডিজিটার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর ভাষায়, বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি চমৎকার। এটা আন্তর্জাতিক বিশ্বের জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয়।

নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেনের ভাষায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ পাকিস্তান থেকে এগিয়ে। এমনকি সামাজিক সূচকের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারত থেকে এগিয়ে। অনেক বড় বড় প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করার পরও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু করে। আজ তা সমাপ্তির পথে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতু ও পদ্মা সেতুতে রেলপথ, বঙ্গবন্ধু সেতুতে পৃথক রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ, মেট্রো রেল, এলিভেটরি

এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল, রামপাল ও মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ সর্বমোট ১১৯টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩,২০০ থেকে ১৬,১৪৯ মেগাওয়াট, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩.৫ থেকে ৩৩.০৪ বিলিয়ন ডলার, রফতানি আয় ১০.৫২ থেকে ৩৪.৪২ বিলিয়ন ডলার, পায়রা বন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনসহ অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭.২৮ শতাংশ করে জনগণের মাথাপিছু আয় ১,৬১০ ডলারে উন্নীত করেছেন। সবল-সমর্থ আর্থ-সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করার ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি।

আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'বাংলাদেশ ২০২৩ নাগাদ বিশ্বের ২৯তম ও ২০৫০ নাগাদ ২৩তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত হয়ে উন্নত দেশের তালিকায় স্থান করে নেবে।' সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের এসব কৃতিত্বের জন্য জাতিসংঘসহ আন্ত র্জাতিক সংস্থাগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ পর্যন্ত ১৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রামে তার যে সাফল্য বা অর্জন তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রশংসনীয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিস্ময়কর। পাশাপাশি তিনি তাঁর দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে সুসংহত করেছেন, শক্তিশালী করেছেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের মতো বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত, ভৌগোলিক অর্থনৈতিক , সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিল সমস্যাসংকুল একটি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। প্রথমত, নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়ে আসলেও ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই এরকম একটি দেশে খুবই শক্ত এক চ্যালেঞ্জ। মেয়াদকালে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ নয়। দ্বিতীয়ত দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন বা তা দৃশ্যমান করা একই রকম চ্যালেঞ্জ। ইদানিং উন্নয়ন তত্ত্বে সব রকমের ভৌত-আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মুল্যায়নে সুশাসনের শর্তটি অবশ্য পালনীয় মনে করা হচ্ছে। সুশাসনের ধারণা আবার সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সমাজের একরকম নয়, অবশ্য জবাবদিহিতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের প্রশ্নটি

সর্বজনগ্রাহ্য, সন্দেহ নেই। অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থা সবার কাম্য। দুর্নীতি উন্নয়নের অনুষঙ্গ হবে, এটি আদৌকাম্য নয়। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের ১৪ বছরে অর্জনের তালিকা যেমন সুদীর্ঘ তেমনি অনেক, ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যময় ও সুদূরপ্রসারী ফলবাহী। তাঁর প্রথম পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্বকালের বিশাল অর্জন অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করা; কিছু অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও একথা মানা যায়। যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু (যমুনা) বহুমুখী সেতু নির্মাণ উদ্বোধন করা, বিশেষত, শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে সেতুতে রেল সংযোগ যুক্ত করা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় অর্জন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকার্য শুরু করাটাও ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় অর্জন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকার্য শুরু করাটাও ছিল শেখ হাসিনার সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্ততার প্রমাণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়াদের সরকার পরিচালনার সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি করা, ও রাজনৈতিক স্থিতিশলীতা বজায় রাখা, মায়ানমার ও ভারতের সাথে আইনি লড়াই করে সমুদ্র বিজয়, দীর্ঘস্থায়ী ছিটমহল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পাশাপাশি দেশের যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামোতে ব্যাপক অগ্রগতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের ব্যাপক উন্নয়ন, সর্বোপরি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (মাথাপিছু আয় বিচারে নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করা), দারিদ্র্য মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া ইত্যাদি নানা খাতে পরিমাপ যোগ্য উন্নয়ন বা অগ্রগতি সাধন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্জন।

শিক্ষা সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুমোদন অবশ্যই শেখ হাসিনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, অবশ্য এর সাফল্য নির্ভর করছে যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যে। এক্ষেত্রে জরুরি হচ্ছে প্রাসঙ্গিক আইন অনুমোদন করানো ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠার, তাতে শিক্ষায় সু-শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাস একটি অপরিহার্য করণীয়। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নানা ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক ধারায় আনার চেষ্টা করা। কাজটি অত্যন্ত কঠিন । তবে মনে রাখা উচিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গঠিত ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ ছিল।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন, যে কারণে তিনি ২০১৫ সালে জাতিসংঘের

পরিবেশ বিষয়ক সম্মানজনক 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার অর্জন করেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অনুমোদন করছেন। অবশ্য বাগেরহাটের রামপালে নির্মিতব্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কিছু নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে পরিবেশবাদী ও ইউনেস্কোর আপত্তি রয়েছে, তবে প্রকল্পের পক্ষে সরকারেরও যুক্তি রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, শেখ হাসিনা পরিবেশ সচেতন মানুষ, তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশে দেশের জনগণ, অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন, ব্যক্তি ও সংস্থা অবিরাম ভূমিকা রেখে চলেছে। সাথে রাষ্ট্রের বা সরকারের ভূমিকা থাকে। সরকার প্রধান যখন একজন সংস্কৃতি সচেতন শেখ হাসিনা, তখন সাংস্কৃতিক অবকাঠামো ও সার্বিক পরিবেশ নির্মাণে তাঁর বিশেষ ভূমিকা থাকতেই পারে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যক্ষ ভূমিকার মধ্যে উল্লেখ করতেই হয় নববর্ষ উদ্‌যাপনে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'বৈশাখী ভাতা' প্রবর্তন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহও এই ব্যবস্থার অনুসরণ করছে অসম্প্রদায়িক আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে এই ভাতার ভূমিকা থাকবে বলেই আমরা মনে করি।

রাজধানী ঢাকা নগরীতে একটি কেন্দ্রীয় 'সংস্কৃতি বলয়' পরিকল্পনা ও নির্মাণ শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রসূত একটি প্রকল্প। সেগুনবাগিচার শিল্পকলা একাডেমী, রমনার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভ ও ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর, তথা বাংলা একাডেমী, শহীদ মিনার, টিএসসি, জাতীয় জাদুঘর ইত্যাদি সমন্বয়ে বাস্তবায়ন হবে 'সংস্কৃতি বলয়। এটি খুবই অর্থবহ একটি চিন্তা। কাঁচের স্থাপত্য 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' ক্রমান্বয়ে ঢাকা তথা বাংলাদেশের প্রধানতম সৌধ বা'আইকনিক স্ট্রাকচার' হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া স্তম্বটি বাংলাদেশের এক নারী ও এক পুরুষ স্থপতির যেন নকশায় নির্মিত। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত নকশা মডেল অনুযায়ী স্ত ম্ভটি নির্মিত। উন্মুক্ত স্বাধীনতা চত্বরের আরো বিস্তৃত পরিকল্পনার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে মূল প্রেরণা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মঞ্চের স্থানটিকে যোগ্য ঐতিহাসিক মর্যাদার চিরস্মরণীয় করে রাখার চিন্তা।

পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে জেঁকে বসা জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনই সর্বপ্রথম অধপতনের বীজ বুনেছে স্বদেশের

বুকে। রাজনীতিকে রাজনীতিবিদদের কাছে কঠিন করার লক্ষে কোরবানির হাটের মত রাজনীতির হাটেরও শুরু হয়েছে নেতার কেনাবেচা। ত্যাগই যে রাজনীতিবিদদের কাছে ছিল একমাত্র প্রার্থনা, তাদের প্রলুব্ধ করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে ক্ষমতাসীন দলে এনে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে ভোগের সাগরে। সামরিক শাসন খুব ভাল করেই জানত যে একটি দেশের ভবিষ্যত ধ্বংস করতে হলে তার রাজনীতিকে ধ্বংস করে দিতে হয়। একটি দেশের ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে হলে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে তছনছ করে দিতে হয়। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান নিপুণ হাতে এই ধ্বংসাত্মক কাজগুলো করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গেছেন প্রমোদ ভ্রমণে। আহ! উচ্ছন্নে যাবার পথে কী চমৎকার হাতছানি! ক্ষমতা সুসংহত করবার জন্য সেনা ছাউনিতে বইয়েছেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে রাজাকারদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছেন, অন্যতম শীর্ষ রাজাকার শাহ আজিজকে বানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। উত্তরসূরীর পথ বেয়ে দেশের আরো বারোটা বাজিয়েছেন তার পরবর্তী সামরিক শাসক হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। দীর্ঘ সামরিক শাসনের বিষে শীল হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ আজো তার মাশুল দিয়ে যাচ্ছে এই যে চারিদিকে এত অনাচার-অনৈতিকতা, দুর্নীতি-সন্ত্রাস, তার একটা বড় অংশই সামরিক শাসনের ঔরসজাত। গত বিশ বছরের গণতান্ত্রিক শাসনের অর্ধেক সময় আবার এই সামরিক। শাসনেরই ছায়াকাল। ফলে বাংলাদেশে রাজনীতি গণমুখী হয়ে তেমন দাঁড়াতেই পারছে না।

তার বর্তমান নেতৃত্বের কালেই পৃথিবীব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেকখানি উজ্জ্বল হয়েছে। বিশেষ করে বিগত জামায়াত-বিএনপির আমলে জঙ্গীবাদও সন্ত্রাসের যে কালিমা লেগেছিল দেশের ললাটে, তা পূরোপূরিই দূর হয়েছে। বরং জনগণের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা, শিশু-মাতৃ মৃত্যু হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়নে তার সরকারের সাফল্য বিশ্ব নেতত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার প্রস্তাবিত শান্তির দর্শন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে। এসবই জননেত্রী, রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার সাফল্যের মুকুটে এক একটি পালক যোগ করছে, আর বাঙালি হিসেবে আমাদের করছে গর্বিত।

বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে একটা বিধ্বংসী ট্রেন্ড-চালু হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের সন্তানেরা তাদের বাবা-মার নাম

ভাঙিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পুত্রদ্বয়ের দুর্নীতির অভিযোগতো বিদেশের আদালতেই প্রমাণিত। এরকম নষ্ট ধারার বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সন্তানেরা আপন কৃতিত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল। প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের অটিজম সম্পর্কিত সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী প্রচুর মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তরুণ কম্পিউটার বিজ্ঞানী, পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় সুদূর আমেরিকা থেকে মায়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে সহায়তা প্রদান করে চলেছেন। কেবল রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবেই নয়, মা হিসেবেও তাই তিনি ঈর্ষনীয়ভাবে সফল। কেবল নিজের সন্তানই নয়, যখনই কোন সন্তান বিপন্ন হয়েছে, মা হিসেবে তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন স্নেহের কোমল দুটি হাত। নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডে সব হারানো মেয়েদের তিনি আপন স্নেহে বুকে টেনে নিয়েছেন, দিয়েছেন মাতৃত্বের উত্তাপ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিশাল কর্মীবাহিনী শেখ হাসিনার এই মাতৃরূপটি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন রোজ।

১৯৯০-এ জেনারেল এরশাদের পতন পর দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও শেখ হাসিনার ভূমিকা অসাধারণ। সে ভিন্ন ইতিহাস কিন্তু ১৯৯১-৯৬ পর্যায়ে নির্বাচিত সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে সাজানো নির্বাচন কমিশনসহ দলীয় প্রভাবের আওতায় নির্বাচনের নামে প্রহসন ঠেকাতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে। যে বিএনপি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৯০ দিনের অস্থায়ী সরকারের অধীনে নির্বাচন করে ক্ষমতায় গেল, সেই দল যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অস্বীকার করে তখন সচেতন মানুষ বিস্মিত হয়। সেই বিস্ময়ই শেখ হাসিনাকে আরও বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়, যা ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগকে দেশের শাসনভার গ্রহণের সুযোগ এনে দেয়। বাংলাদেশকে তিনি আবার একাত্তরের চেতনার দিকে ফেরাতে সচেষ্ট হন।

কিন্তু সে পথ বড় দূর্গম। সামরিক স্বৈরাচারের আমলেই শেখ হাসিনাকে প্রকাশ্যে গুলি করে চট্টগ্রামে হত্যার চেষ্টা হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে নিরন্তর মৃত্যুঝুঁকি তাড়া করছে তাকে। ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ভোটকেন্দ্র দেখতে গেলে গুলি ও বোমা হামলা হয়

তার ওপর। ভাগ্যগুণে বেঁচে যান তিনি। ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ট্রেনে যাওয়ার সময় ঈশ্বরদী ও নাটোর স্টেশনের প্রবেশমুখে তাকে লক্ষ করে গুলি ছোড়া হয়েছিল। ফাটানো হয়েছিল অসংখ্য বোমা। এরপর ১৯৯৫-৯৬ সালে একাধিকবার তার সমাবেশে বোমা ও গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ১৯৯৬ সালে ২৩ জুন প্রাধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে একের পর এক তাকে হত্যার চেষ্টা চলছে। কোটালিপাড়া হেলিপ্যাডে মাইন পুঁতে রাখা থেকে শুরু করে ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা পর্যন্ত বহুবার তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এখনও সে চেষ্টায় দেশি-বিদেশি চক্রান্ত তৎপর।

ভারত ও বাংলা, বিশেষ করে দুই বাংলার এই মহামিলনে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে নতুন করে মৈত্রীর যে সেতুবন্ধ তৈরি হলো, তা দেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে হয়ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে নিজের কণ্ঠেই গান ধরতেন 'বাঙালির ঘরে যতো ভাইবোন, এক হউক এক হউক হে ভগবান।' বাঙালির রাজনৈতিক ঐক্যের কথা আজ বলা হয়ত অবাস্তব ও অবান্তর। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য এই ডাক দুই বাংলার মানুষের মনেই বিরাজিত।

জার্মান ভাষা দুই জার্মানিকে আবার একত্রিত করেছে। বাংলাভাষা বাংলার রাজনৈতিক বিভাজনের বাস্তবতা মেনে নিয়ে তার অভিন্ন সাংস্কৃতিক জাতীয়তা পুনর্নির্মাণ করেছে। এই নির্মাণ কার্যের একজন প্রধান স্থপতি শেখ হাসিনা যে হতে পেরেছেন এজন্যে আমরা গর্বিত। বাংলাদেশ ভবনে থাকবে রবীন্দ্রনাথ ও শেখ মুজিব মিউজিয়াম। শাশ্বত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণা, রবীন্দ্রভাবনায় ভাবিত হওয়া, শান্তি ও মানবতার জন্য অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহার করার জন্য এই ভবনের দ্বার থাকবে দুই বাংলার তরুণদের জন্যই অবারিত।

আশা করা যায়, শান্তি নিকেতনে বাংলাদেশ ভবন হবে এই নবীন তরুণ প্রজন্ম তৈরির কর্মশালা, শান্তি নিকেতনের বিশ্বজনীনতার সঙ্গে যুক্ত হবে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনাও। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার সঙ্গে এই চেতনার সাযুজ্য সহজেই লক্ষণীয়। এই সাযুজ্য হিংস্র হাতে ভাঙতে চেয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার দানব। শেখ হাসিনার কৃতিত্ব সেই দানবকে পরাভূত করে সেই সাযুজ্য ও সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্রনাথ মোদী দুই প্রধানমন্ত্রীই শান্তিনিকেতনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলেও তাদের বৈঠকে যে রাজনৈতিক কথাবার্তা হয়েছে

তাতে সন্দেহ নেই। সেই কথাবার্তা দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতা সম্পর্কে। ভারত বাংলাদেশের বড় প্রতিবেশী এবং দেশটির স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের ছিল বড় ভূমিকা। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের একটা নৈতিক প্রভাব থাকবে এবং আছেও।

এ সম্পর্কটিকে বিষিয়ে দিয়ে অথবা দিল্লিকে বিভ্রান্ত করে বাংলাদেশের রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করার এবং নিজেদের সুবিধা লোটার একটা চক্রান্ত বাংলাদেশে আগেও ছিল এবং একটি সাধারণ নির্বাচনকে সামনে নিয়ে এখন সেই চক্রান্ত আবার দানা বেঁধেছে। কিন্তু বিজেপি'র মতো দলের সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েও নরেন্দ্রনাথ মোদী আগের কংগ্রেস সরকারের মতো হাসিনা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখেছেন, এমনকি আরো সংহত করেছেন। কারণ ভারতের দু'টি বড় দলের সরকারই জানে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের বিকল্প হচ্ছে গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে একটি ঘোর সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিদের মদদদাতা সরকার। যারা ক্ষমতায় এলে ভারতের স্বার্থ ও নিরাপত্তাও বিপন্ন হবে।

ভারতের সঙ্গে অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান হাসিনা সরকার করে ফেলেছেন। কেবল তিস্তার মতো কয়েকটি সমস্যা ঝুলে আছে। দিল্লি এই সমাধানেও রাজি। বাধা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির গোঁ। তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে হাসিনা-বিরোধী তা নন। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েই তিনি বাংলাদেশের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং শেখ হাসিনাকে দিদি সম্বোধন করেছিলেন।

শান্তি নিকেতনের বাংলাদেশ ভবন শুধু একটি ইট কাঠ পাথরের বাড়ি নয়, তা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের একটি স্থাপত্যও। এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রাজনৈতিক মেলবন্ধনকেও দৃঢ় করবে। মোদী সরকার এবং নিশ্চিতভাবে মমতা সরকারও হাসিনা সরকার ও বাংলাদেশের আরো কাছাকাছি আসবেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে সারা এশিয়ায় শান্তি ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের সেতুটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ভারত ও চীনের শতাব্দী-প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের নবায়নের জন্য শান্তি নিকেতনে একটি চীনা ভবন স্থাপন করেছিলেন। এ বছর নরেন্দ্রনাথ মোদী শান্তিনিকেতনে সফরে যাওয়ার আগেই চীন সরকার এই চীনা ভবন সংস্কারের জন্য এক কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে স্থাপন করেছেন চীনা ভবন, শেখ হাসিনা প্রতিষ্ঠা

করলেন বাংলাদেশ ভবন। বাংলাদেশ, ভারত ও চীনের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সকল অশান্তি ও যুদ্ধভীতি দূর করে এশিয়ার আকাশে একদিন রাজনৈতিক শান্তিরও পায়রা ওড়াবে এটা আশা করা অবাস্তবত নয়।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও সাফল্য...

মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপনের মাধ্যমে বিশ্বের উন্নত ও প্রযুক্তিগত অভিজাত ৫৭ তম দেশে তালিকায় দেশের নাম অন্তর্ভূক্ত করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সাফল্যের মাইল ফলক স্পর্শ করেছে। সৃষ্টি করেছে নজিরবিহীন বিরল ইতিহাস। (উৎক্ষেপন-১২.০৫.২০১৮ তারিখ মধ্যরাত)।

স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি দেয়ায় বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা ও সম্মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২২.০৩.২০১৮।

নির্ধারিত সময়ের আগেই জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল) অর্জন করে বিশ্বে বাংলাদেশ বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখায় বাংলাদেশ এখন 'ইমার্জিং টাইগার'-এর মর্যাদা পাচ্ছে।

ধারাবাহিকভাবে ৭ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যশত স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিগত আড়াই দশকে দারিদ্র্যের হার ৫৭.৬ শতাংশ থেকে ২৪.৪ শতাংশে নামিয়ে এনে বাংলাদেশ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

দারিদ্র্যের আনুপাতিক হার ১৮.৫ থেকে ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনাও একটি বিশ্ব রেকর্ড।

মাথাপিছু গড় আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলারে উন্নীত করার মধ্য দিয়ে দেশ এখন উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হওয়াও একটি রেকর্ড ।

জাতীয় অর্থনীতির আকার প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানো অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি ইতিবাচক সূচক।

গড় আয়ু ৭২ বছরেরও বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি সরকারের সুনজরের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পদ্মা সেতুর দৃশ্যমান নির্মাণকাজ সমগ্র বিশ্বে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফল নেতৃত্ব এবং চ্যালেঞ্জিং উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশকে বিশ্বের উন্নয়নের মডেল হিসাবে ঘোষণা করেছে জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে 'প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতি' ও সন্ত্রাস দমনে কার্যকরি ভূমিকা সমগ্র বিশ্বে দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বিশ্বনন্দিত নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ কূটনেতিক ভূমিকার ফলে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে সাড়ে ১৯ হাজার বর্গকিলোমিটার সমূদ্র এলাকা বাংলাদেশ পাওয়াকে ঐতিহাসিক সমূদ্র বিজয় হিসাবে উল্লেখ করেছে বিশ্ব।

জননন্দিত নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ৬৩ বছরের অমিমাংসিত ১১১ টি ছিটমহল বাংলাদেশ ফিরে পাওয়ায় ৫২ হাজার মানুষ বন্দি দশা থেকে মুক্তি পেয়ে নাগরিকের মর্যাদা পেয়েছে।

বিশ্বের স্বল্পোন্নত ১৪৭ দেশের মধ্যে মাতৃ, শিশু ও নবজাতকের মৃত্যু হার হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

চাকুরিতে মেয়েদের কোটা ১০ শতাংশ নির্ধারণ করায় ৩৪ শতাংশ নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

বছর শুরুর দিনেই দেশের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে একদিনে প্রায় ৩৪ কোটি বই বিতরণ একটি সাফল্য।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে শিশু শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের ১৬টি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন।

স্কুলে ভর্তির হার ৯৯ শতাংশে উন্নতীকরণ।

যানজট নিরসনে রাজধানী ঢাকায় দৃষ্টিনন্দন ফ্লাইওভার নির্মাণ।

রাজধানী ঢাকায় যানজট নিরসনে মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

সুপরিকল্পিত ব্যয় বহুল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের নির্মাণ কাজও চলমান।

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে প্রধানমন্ত্রী স্পীকার, সংসদ উপনেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা নারী হওয়ার গৌরব অর্জন।

গণতন্ত্রের মানস কন্যা প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে এখন জেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলায় প্রায় ১৫ হাজারের বেশি নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

নারী-পুরুষ বৈষম্যে বিশ্বের ১৪২ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের দশম স্থান লাভ।

দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৬ কোটি দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা সেবা দিয়ে বিশ্বে রেকর্ড স্থাপন।

গাজীপুর থেকে গুলিস্তান হয়ে কেরানীগঞ্জ পর্যন্ত র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণ কাজ শেষ হলে ঢাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা যুগান্তকারী সাফল্য বয়ে আনবে।

গণমানুষের নেত্রী মাননীয় প্রাধানমন্ত্রীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আন্ত র্জাতিক ক্ষুধা নিবারণ সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য স্বল্পোন্নত ১৪২ টি দেশের সভাপতি হয়ে দেশকে গর্বিত করেছেন।

জনদরদী নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বল্প সময়ের মধ্যে সঠিক ও সাহসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩২০০ মেঘাওয়াট থেকে আজ ১৬ হাজারের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করে বাংলাদেশ বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কে গতিশীল করা, অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে তথ্য কমিশন গঠন করে তথ্য পাওয়ার নাগরিক অধিকারকে নিশ্চিত করা এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হিসাবে জেলা ও উপজেলা

পরিষদের মাধ্যমে তৃণমূলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ও জননেত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম সাফল্য।

জননেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয়ের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত হওয়ায় উন্নয়ন ও অগ্রগতি আর ত্বরান্বিত হয়েছে।

বিশ্বনেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবতার কর্মী ও জাতিসংঘের অটিজম বিষয়ক পরামর্শক সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের প্রচেষ্টায় সারা বাংলাদেশসহ পৃথিবীতে আজ অটিজমকে সচেতনতায় এনে জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়ার সহায়তা করেছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক নেতৃত্বগুণে স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী বিশ্বের ১৬৩ দেশের ভোটে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশন (সিপিএ) চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হওয়া।

দূরদর্শী ও দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা ও নেতৃত্বের ফলে সারা বিশ্বের ১৯৩ টি দেশের ভোটে প্রথম বারের মত সংসদ সদস্য সাবের হাসেন চৌধুরী ইন্টারপার্লামেন্টারি অর্গানাইজেশনের (আইপিও) সভাপতি নির্বাচিত হওয়া।

বিদেশ সফর শেষে বিমান বন্দর থেকে এই বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি সংসদের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন এবং প্রতিদিন দীর্ঘ সময় সরকারি কাজে নিজেকে নিয়োগ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারাদিন শত কর্মব্যস্থতার মাঝেও সময়মত আল্লাহর এবাদতে নিজেকে সমর্পন করে প্রমাণ করেছেন তিনি একজন আদর্শ ও সুদক্ষ রাষ্ট্র নায়ক।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নতুন মন্ত্রণালয় করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে রাজধানীর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপক কাজ চলছে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ কার্যক্রম চলমান। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই টানেল নির্মাণ কাজ শেষ হলে বাংলাদেশ বর্হিবিশ্বে সুনাম অর্জন করবে।

১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করে শিল্প বিকাশের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে।

মানুষ শুধু একটি দেশেরই নাগরিক নয়, ছোট্ট একটি ভূখণ্ড সম্বন্ধে সজাগ ও যত্নশীল হলেই চলবে না। তাকে ভাবতে হবে সমগ্র পৃথিবীর কথা। মানব জাতির একটি মাত্রই দেশ। সেটির নাম পৃথিবী। এই সত্যটি শেখ হাসিনার মতো করে আর কোনো সরকারপ্রধান বোঝেন নি। তাই তিনি অনন্য। মূলত রাজনীতির মানুষ। যে কারণে দেশের মানুষের আজকের সময়ের কথা যেমন ভাবছেন; আগামী প্রজন্মের কথাও তিনি ভাবেন । তিনি মনে করেন এই দেশ শুধু আজকের সময়ের জন্য নয়; অনাগত দিনের মানুষের জন্যও এই দেশ। শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা। বাংলাদেশের বিদগ্ধজনরা যারা তার রাজনীতির সাথে যুক্ত না তারাও ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনাকে পছন্দ করেন। ২০১৫ সালের ৬৯তম জন্মদিনের প্রাক্কালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' অর্জন করেন। এবং যথারীতি তিনি তা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে উৎসর্গ করেন। এটি বাংলাদেশের জন্য কম অর্জন নয়। শেখ হাসিনার সততা ও দেশপ্রেমের জন্য নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হাফিংটন পোস্টের প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'জনগণকে রক্ষায় কারও দিকে তাকিয়ে নেই বাংলাদেশ।' একমাত্র এবং একমাত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। ২০০৯ জেনেভা সম্মেলনে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সারাবিশ্বের পরিবেশ আন্দোলনের নেতা। সত্যি সত্যি আজ শেখ হাসিনা চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ। আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানের জন্ম হওয়ার বহু বছর পূর্বে সাধক পরুষরা অভিজ্ঞ পরিবেশবিজ্ঞানীর মতোই সাবধান বাণী উচ্চারণ করতেন। উন্নত বিশ্ব যখন ভোগবাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে গিয়ে সারা পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট করেছে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনুন্নত বিশ্ব। শেখ হাসিনা খুব ভালো করেই জানেন, প্রকৃতির একটি নিজস্ব স্বভাবধর্ম আছে, একটি নিজস্ব নিয়ম আছে। এই নিয়মকে অবিরত লঙ্ঘন করতে থাকলে, প্রকৃতির নিয়ম সীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে, তাকে ক্রমাগত উপেক্ষা করতে থাকলে পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্বংসের পথও প্রশস্ত হয়ে ওঠে। এইটেই তো আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানের মূল কথা।

আমরা জানি, ২০১৫ সালেই ইউনেস্কোর মহাসচিব ইরিনা বোকাভো শেখ হাসিনার হাতে 'পিস ট্রি' পদক তুলে দিয়েছেন। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার বক্তব্যেও সারার্থ। 'এই সাহসী নারী আলোকবর্তিকা হিসেবে সারা পৃথিবীতে পথ দেখাচ্ছেন।' শেখ হাসিনা স্পষ্টত বিশ্বাস করেন, পরিবেশ বিপর্যয় ঘটলে কৃষির ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেবে। এইখানে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন–

"তার পর এল কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জনশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে আহায্যে আয়োজন ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে, এইজন্য তাতে স্বার্থপরতাকে শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত করে রেখেছে। সেই সঙ্গে জাগল ধর্মনীতি। কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়। কেননা, বহু লোক একত্র হলে যা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের পরে । জীবিকা যত সহজ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ হয় প্রীতিমূলক ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। বস্তুত মানবসভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা।"

[দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হলকর্ষণ', ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ]

শেখ হাসিনা এখন শুধু একটি নামই নয়, একটি প্রতিষ্ঠান। Work is Worship, যার জীবনের মূলমন্ত্র কর্ম-জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গঠিত এক অসাধারণ জীবন তার। শেখ হাসিনা বাঙালি জাতির Ralling Point, Cementing Bond। সুখে থাকবার, স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার আকর্ষণ মানুষের জন্য খুবই স্বাভাবিক। সাধারণের জন্য এটাই কাঙ্ক্ষিত জীবনযাপন। ত্যাগের কথা শাস্ত্রে আছে, মনীষীদের জীবন গ্রন্থে আছে, চলমান জীবনাচরণে থাকাটা অস্বাভাবিক। শেখ হাসিনার চরম শত্রুও বলবেন, শেখ হাসিনা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। মাত্র কয়েকদিন আগে বিখ্যাত পত্রিকা 'গার্ডিয়ান'-এর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আই ডু পলিটিক্স ফর দ্য পিপল' (আমি জনগণের জন্য রাজনীতি করি)। সারা পৃথিবীর পরিবেশ কর্মীদের কাছে একজন আলোকবর্তিকা। জানি না, কোন এক অজানা কারণে অনেক কিছুর সাথে মিলে যায়। কোনো এক জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'সত্তা আমার, জানি না সে কোথা থেকে/হল উত্থিত

নিত্যধাবিত স্রোতে। একজন বিশিষ্টজন একবার শেখ হাসিনার জন্মদিনের লেখায় বলেছিলেন, শেখ হাসিনা বোধহয় খুব ভালো করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সিপাই' এবং 'খোয়াবনামা' উপন্যাস পড়েছেন, খুব ভালো করে শওকত ওসমানের 'বনী আদম' ও 'জননী' উপন্যাস পড়েছেন এবং পড়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক গল্প। পড়তে পড়তে ভেবেছেন মানুষ, গ্রাম-বাংলার হতদরিদ্র মানুষ কীভাবে ভাতের জন্য লড়াই করে, সুযোগ পেলেই ভাতের লড়াইকে ভোটের লড়াইয়ের দিকে নিয়ে আসে। তারা লড়াকু মানুষ, অজেয় মানুষ, অমর মানুষ, এই মানুষজনের কাছে শেখ হাসিনার দায়ভাগ আছে। এই দায়ভাগই শেখ হাসিনার রাজনীতি কিংবা তার নিয়তি। পরিবেশ বিপর্যস্ত হলে এই লড়াকু মানুষরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা তার পিতৃপুরুষের জন্মস্থান কেনিয়া সফরে গিয়ে বলেছেন, 'কেনিয়া যেন বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে এই দুই দেশকে অনুসরণ করে।' এটা যে কত বড় একটা স্বীকৃতি, ভাবা যায় না। এটাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বের অসাধারণত্ব। তার সাফল্যের পিছনে রয়েছে তার মহান পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবনের অমলিন শিক্ষা, দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর অনুরাগ, সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, প্রবল ইচ্ছেশক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অসাধারণ আত্মবিশ্বাস। আজ পরিবেশ সচেতন মানুষের মনে লেগেছে সবুজের মায়া, মানুষ আজ বুঝতে পারছে বনসৃজনের আবশ্যিক প্রয়োজন। পরিবেশ আন্দোলন বিশ্বব্যাপী দানা বেঁধে না উঠলে বাস্তববাদী বুদ্ধিজীবীরা যারা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে শুধু রোমান্টিক মানসিকতাই খুঁজে পান, হয়তো বলতেন ওসব ভাববিলাসী রোমান্টিক কবির পদ্যময় উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু আজ কবির বনসৃজনের বাণী, অরণ্যের প্রাণে সাড়া জাগানো অস্তিত্বের কথা সাড়া জাগিয়েছে শুধু পরিবেশবিজ্ঞানী সংরক্ষণবাদীদের অন্তরেই নয়, সাধারণ বিশ্ববাসীর মনেও। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বাসস্থানের চতুর্দিকে আগমন-নির্গমনের পথে, পথের পাশে জনসাধারণ চাইছেন সবুজের মায়ায় আবদ্ধ হতে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি... ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।' শেখ হাসিনারও বিশ্বাস দেশকে ভালোবাসবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্তব্য দেশকে জানা। শেখ হাসিনা বাংলার মানুষকে ভালোবাসেন পিতা শেখ মুজিবের মতো করে। শেখ হাসিনা এখন বিশ্ব নেতৃত্বের সম্মান পেয়েছেন।

তিনি বিশ্ব জলবায়ু নিয়ে সাহসী ও সময় উপযোগী বক্তব্য রাখছেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বিশেষ জাতিসংঘ পুরস্কার পাওয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। শিশুমৃত্যু হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশকে এই পুরস্কার দিয়েছে জাতিসংঘ। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই এই পুরস্কার অর্জন করেছে। সারা দুনিয়ার গণমাধ্যম আজ শেখ হাসিনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মানুষ আপন সভ্যতাকে যখন অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে তখন জয়ের স্পর্ধায় বস্তুর লোভে তুলতে থাকে যে সীমার নিয়মের দ্বারা তার অভ্যুত্থান পরিমিত। সেই সীমায় সৌন্দর্য, সেই সীমার কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় ঔদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনোই ক্ষমা করে না। প্রায় সকল সভ্যতায় অবশেষে এসে পড়ে এই ঔদ্ধত্য এবং নিয়ে আসে বিনাশ। প্রকৃতির নিয়ম সীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করে কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালিতে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এ কথাগুলো বলতেন তখন অনেকেই এগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেনি। এমনকি যেসব দেশ পরিবেশ নিয়ে এখন কাজ করছে; সেসব দেশও তখন ভাবেনি। ২০১০ সালের জেনেভা সম্মেলনে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার করণীয় নিয়ে বিস্তারিত অভিমত দিয়েছিলেন। এখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাই অনুসরণ করছেন। শেখ হাসিনা স্পষ্ট করে জানেন, মানুষ শুধু একটি দেশেরই নাগরিক নয়, ছোট্ট একটি ভূখণ্ড সম্বন্ধে সজাগ ও যত্নশীল হলেই চলবে না। তাকে ভাবতে হবে সমগ্র পৃথিবীর কথা। মানব জাতির একটি মাত্রই দেশ। সেটির নাম পৃথিবী।

তুমিইতো বাংলাদেশ

বিশ্বনন্দিত মাতৃময়ী নারী তুমিতো অবলা নও
বিশ্বকে জয় করে আজ তুমি বাঙালির প্রজ্বলিত প্রতীক
ষোলকোটি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে

তুমি আজ গর্বিত বাঙালি বিশ্বজয়ী নেত্রী
তোমার তুলনা শুধুই তুমি, গর্বিত বঙ্গভূমি।

ক্ষুধায় পীড়িত নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষেরে তুমি
দিয়েছো অপার শক্তি, দিয়েছো বল,
দিয়েছো সাগরের ভূমি জল
অতঃপর দিয়েছো ক্ষুধার অন্ন অসীম ঐশ্বর্য
তুমিতো বাঙালিকে করেছো গর্বিত মহান
দেশকে করেছো গৌরবদীপ্ত বাংলাদেশ।

বিশ্বের বুকে গর্বিত স্বদেশের মানচিত্র জয় পতাকা
তোমারই কীর্তিতে তোমারই গৌরবে
উড়ছে দিকে দিকে তুমিতো গর্বিত নারী নও শুধু
তুমিতো বিশ্বের নন্দিত শীর্ষ চিন্তাবিদ
তোমার তুলনা শুধুই তুমি, তুমিইতো বাঙলাদেশ।

জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তুমিতো মাথা নোয়াবার নও
তুমি বাঙালির গৌরবিনী মহীয়সি নারীর প্রদীপ্ত শিখা
জয় বাংলা বলে জয়বঙ্গবন্ধু বলে জয় হোক সত্য সুন্দরের
তোমার এগিয়ে চলার পথে আর থাকবেনা কোন কন্টক বাধা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৭টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও পদক অর্জন করেছেন। যার সর্বশেষটি হলো– জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ'। এই পুরস্কার লাভের একদিন পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘ 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' লাভ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। নোবেল পুরস্কার যে ৬টি বিষয়ে দেওয়া হয়, সেখানে পরিবেশ

নেই। তবে জাতিসংঘের পরিবেশ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' আখ্যা পেয়ে থাকে পরিবেশের নোবেল হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বছর পরিবেশ বিষয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ সেই পুরস্কার পেয়েছেন। এর আগে এ বছর শেখ হাসিনা রাজনীতিতে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের জন্য ডবিস্নউআইপি (ওম্যান ইন পার্লামেন্ট) গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ২৫ মার্চ ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে নারী ও শিশু শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তিবৃক্ষ পদক' পুরস্কারে ভূষিত করে। খাদ্য উৎপাদন ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান করে।

২০১৩ সালে খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন, 'একটি বাড়ি ও একটি খামার প্রকল্প' ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তি মেলায় সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক 'মান্থন অ্যাওয়ার্ড' এবং জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) দারিদ্র্যতা, অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় 'ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড' পদকে ভূষিত করে।

এর আগে ২০১২ সালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য আইএনইএসসিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কালচারাল ডাইভারসিটি পদকে ভূষিত করে। ২০১১ সালের ২৬ জানুয়ারি ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সের স্পিকার জন ব্রেক্রো এমপি প্রধানমন্ত্রীকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দূরদর্শী নেতৃত্ব, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা, আঞ্চলিক শান্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে অনবদ্য অবদানের জন্য গ্লোবাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন।

এ ছাড়াও একই বছর 'সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড,' স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) 'সাউথ-সাউথ নিউজ' এবং জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সাউথ-সাউথ

অ্যাওয়ার্ড-২০১১' : ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট হেলথ এই পুরস্কারে ভূষিত করে।

শিশুমৃত্যু হ্রাস সংক্রান্ত এমডিপি-৪ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। একই বছরের ২৩ নভেম্বর আন্তর্জাতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য এসটি পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করে। ১২ জানুয়ারি বিশ্বখ্যাত 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক-২০০৯'-এ ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রী। ২০০৫ সালের জুন মাসে গণতন্ত্র, সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া।

২০০০ সালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকন ওমেনস কলেজ 'পার্ল এস বাক পদক' প্রদান করে। একই বছর ৪ ফেব্রুয়ারি ব্যাসেলসের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর অনারিয়াস কসা এবং ৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটের 'ইউনিভার্সিটি অব বার্ডিগ্রেপোর্ট' বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নে অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে 'ডক্টরস অব হিউম্যান লেটার্স' প্রদান করে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১৯৯৯ সালের ২০ অক্টোবর 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্বীকৃতিস্বরূপ এফএও কর্তৃক 'সেরেস পদক' লাভ করেন তিনি।

১৯৯৮ সালে নরওয়ের রাজধানী অসলোয় মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এম কে গান্ধী' পুরস্কারে ভূষিত করে। একই বছরের এপ্রিলে নিখিল ভারত শান্তি পরিষদ শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য তাকে 'মাদার তেরেসা পদক' এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখার জন্য ইউনেস্কো শেখ হাসিনাকে 'ফেলিক্স হুফে বইনি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। একই বছর ২৮ জানুয়ারি শান্তি নিকেতনের বিশ্বভারতী এক আড়ম্বরপূর্ণ বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৯৭ সালে লায়ন্স ক্লাবসমূহের আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক 'রাষ্ট্রপ্রধান পদক' প্রদান এবং রোটারী ইন্টারন্যাশনালের রোটারী ফাউন্ডেশন শেখ হাসিনাকে 'পল হ্যারিস ফেলো' নির্বাচন এবং ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের

সম্মাননা মেডেল প্রদান করে। এ ছাড়াও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শান্তি, গণতন্ত্র ও উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনে অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ হাসিনাকে 'নেতাজী মেমোরিয়াল পদক ১৯৯৭' প্রদান করে।

২৫ অক্টোবর গ্রেট ব্রিটেনের ডান্ডি এবার্তে বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 'ডক্টর অব লিবারেল আর্টস' ডিগ্রি, ১৫ জুলাই জাপানের বিখ্যাত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি এবং ৬ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ ' উপাধি প্রদান করে।

দেশের বিশিষ্টজনরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও পদক লাভকে জাতির জন্য গর্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শেখ হাসিনার জীবন কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। এখন এটা শুধু একটি নামই নয়, এটা একটি প্রতিষ্ঠান। work is worship, যার জীবনের মূলমন্ত্র কর্ম-জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গঠিত এক অসাধারণ জীবন তার । শেখ হাসিনা বাঙালি জাতির Ralling Point, Cementing Bond। জননেত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের একটি রূপক। একজন বিশিষ্টজন একবার শেখ হাসিনাকে এক লেখায় বলেছিলেন, শেখ হাসিনা বোধহয় খুব ভালো করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সিপাই'এবং 'খোয়াবনামা' উপন্যাস পড়েছেন, খুব ভালো করে শওকত ওসমানের 'বনী আদম' ও 'জননী' উপন্যাস পড়েছেন এবং পড়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক গল্প। পড়তে পড়তে ভেবেছেন মানুষ, গ্রাম-বাংলার হতদরিদ্র মানুষ কীভাবে ভাতের জন্য লড়াই করে, সুযোগ পেলেই ভাতের লড়াইকে ভোটের লড়াইয়ের দিকে নিয়ে আসে। তারা লড়াকু মানুষ, অজেয় মানুষ, অমর মানুষ, এই মানুষজনের কাছে শেখ হাসিনার দায়ভাগ আছে। এই দায়ভাগই শেখ হাসিনার রাজনীতি কিংবা তার নিয়তি।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে সেদিন জনসমুদ্রে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'সবকিছু হারিয়ে আমি আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি।

বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তি-সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য আমি এসেছি। আমি আওয়ামী লীগের নেত্রী হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে মেয়ে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের সাথে থাকতে চাই।'

এর মাত্র পাঁচ দিন আগে ১১ মে তারিখে বিশ্বখ্যাত 'নিউজউইক'পত্রিকা বক্স আইটেম হিসেবে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। শেখ হাসিনা যখন দেশে ফেরেন তখন সময়টা খুব খারাপ ছিল। বলতে গেলে যে কোনো সময় একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, খুনিরা যেন সব জায়গায় ওত পেতে আছে।

শেখ হাসিনা স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'তিনি নিহত হওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত নন; এমনকি যে সরকারের মোকাবিলা করবেন তার শক্তিকে তিনি বাধা বলে গণ্য করবেন না। জীবনে ঝুঁকি নিতেই হয়। মৃত্যুকে ভয় করলে জীবন মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হয়।' 'সীমার মাঝে অসীম তুমি/বাজাও আপন সুর/তোমার মাঝে আমার প্রকাশ/তাই এত সুমধুর।'

সর্বমঙ্গলা

নীলকণ্ঠ পাখি এক অগ্নিময় ভূভাগে
তুমি ছায়া দিয়ে যাও
তুমিতো জাননা তুমি অসহায় মানুষের
নীপীড়িত মানুষের মা-ও।

তোমার মায়ায় তোমার ভালোবাসায়
বেঁচে থাকে কত মানুষ আলো আশায়
স্বপ্ন তাদের, তুমি আছো পাশে
সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে আছো ভালোবাসায়।
যত আসুক ঝড় ঝঞ্ঝা যাবে ভেসে যাবে জঙ্গি যন্ত্রণা
বাঙালি জাতির মুক্তিপথের দিশারী তুমি
তোমারই দীপ্ত আলোক ছটায় ভেসে যাবে কত অন্যায়
আমরা তোমার কোটি সন্তান আছি এক সাথে।
ঐক্যমন্ত্রে আজ ধাবমান দেশের কল্যাণে
বিশ্ব শান্তির অগ্রপথিক তুমি সর্বজয়ী সর্বমঙ্গলা।

তোমার ব্যথা বেদনায় মধুমতির বুকে উঠে উথাল-পাথাল ঢেউ
কাঁদে নদী পদ্মা যমুনা বয়ে যায় বেদনাবুকে নীরবধি।

তোমাকে যে যেতে হবে অনেকদূর, অনেক পথ
পাড়ি দিতে হবে উত্তাল সাগর অনন্ত আকাশে-রথ
তোমার অগ্রযাত্রায় বিশ্ব আজ অবাক তাকিয়ে রয়
তোমার যাত্রাপথে আর থাকবেনা কোন বাধা হবে হবে জয়।

বংশলতিকা

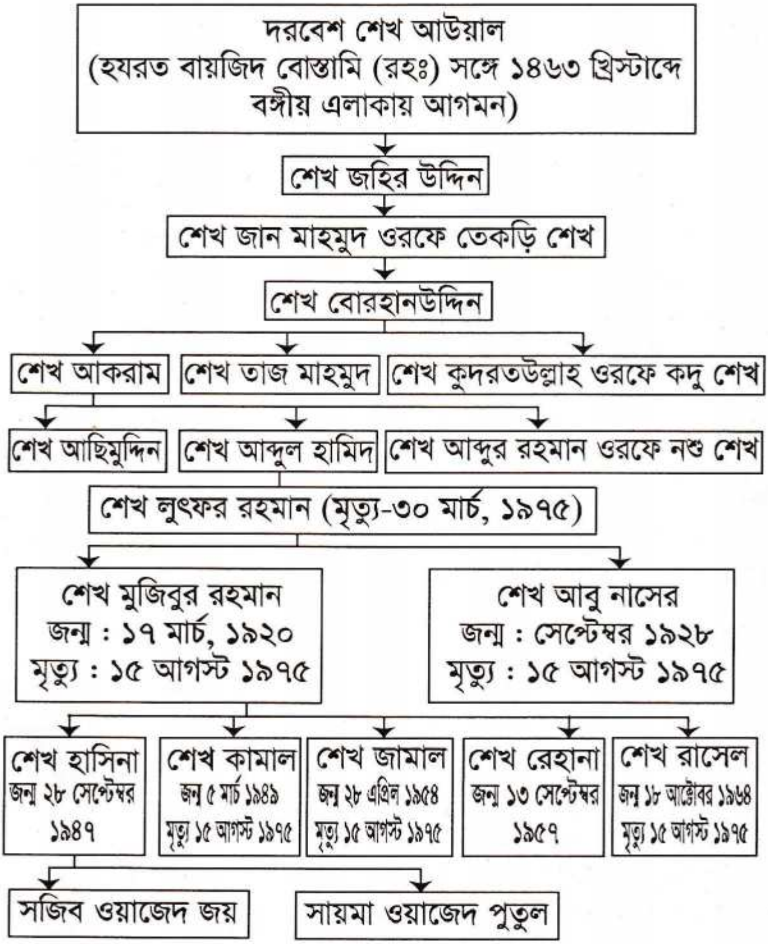

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

শেখ হাসিনা– রাজনীতিবিদ থেকে দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠ কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। টুঙ্গিপাড়া রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে। এখন টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত। আগে গোপালগঞ্জ ছিল ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা শহর। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ায় থাকতেন। সেখানেই কেরাল কোপা পাঠশালায় তার হাতে খড়ি। ১৯৫৪ সালে বাবা- মায়ের সাথে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

তিনি ঢাকার আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপরে তিনি বকসী বাজারের বর্তমান বদরুন্নেসা কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে আসার আগেই শেখ হাসিনা সরাসরি ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি ৬২-র শিক্ষা আন্দোলনে যোগ দেন। গভর্মেন্ট ইন্টারমিডিয়েট কলেজ তথা বদরুন্নেছা কলেজে পড়াবস্থায় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ ও পরিবারের প্রভাবহেতু ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সম্মত হন। সাংগঠনিক ভিত্তির কথা চিন্তা করলে সে বর্ষে ছাত্রলীগ মনোনীত একজনও প্রার্থী নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু শেখ হাসিনা তার ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও শেখ মুজিবের কন্যার সুবাদে বিপুল ভোটে ১৯৬৬ সালে কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনকে শেখ মুজিব ঘোষিত ৬ দফার প্রারম্ভিক বিজয় বলে অনেকে আখ্যায়িত করেন। আসলে সে বিজয় ছিল তাঁর নেতৃত্বের সূচনা পর্ব। প্রবাদ আছে-যে পাখি উড়বে, তা বাসায় ধড়পড় করে। শেখ হাসিনার বেলায় তা ঘটেছিল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায়। স্বৈরাচারী শাসকদের উপর প্রণীত ২০ নম্বর প্রশ্নের জবাব না দিয়েই তিনি পরীক্ষা দেন। ফেল না হোক ভাল ফলাফলের ঝুঁকি থাকলেও তিনি তা করেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্সে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও তিনি রোকেয়া হলের

ছাত্রী সংসদের নির্বাচনে সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন। এই সময় তিনি ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে অধিক মনোযোগ দেন। ১৯৬৭ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবস্থায় ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নেন এবং তদানিন্তন কুখ্যাত এন এস এফ-এর প্রতিবন্ধকতার মুখে ছাত্রলীগকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে মাকে সাথে নিয়ে বাবার সাথে কৌশলগত যোগাযোগ রেখে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন।

অনার্সে পড়াবস্থায় তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহ বন্ধন ও আরও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে তিনি অনার্স সমাপ্ত করতে পারেননি । ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ পাস করে এম. এ ১ম. এ ১ম পর্বে ভর্তি হোন।

কালের পথ বেয়ে শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু হলেন। '৭০ সালের নির্বাচন বঙ্গবন্ধুকে বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করল'। ৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন এবং পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হলেন। মুক্তিযুদ্ধের ৭-৮ মাস হাসিনা, রেহানা, রাসেল, বেগম মুজিব একই বাড়িতে নজরবন্দী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত জামালও একই বাসায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মা ও মেয়ের যৌথ কৌশলী ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক সহায়তা করেছিল। এ সময়ে কামালের বন্ধু নজরুল ও অন্যান্যদের মাধ্যমে যুদ্ধের খবরাদি, কৌশলগত তথ্য ও নির্দেশনা আদান-প্রদান হত। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে হাসিনাও মুক্ত হন। তারপর বঙ্গবন্ধু হলেন প্রেসিডেন্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের কালো রাত্রিতে কেবলমাত্র শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় শত্রুর নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পেলেন। বাবা-মা, ভাই- বোনদের মৃত্যু সংবাদে হাসিনা ভেঙ্গে পড়লেন। শত্রুর আঘাত আসতে পারে ভেবে ইউরোপের জীবন পিছনে ফেলে তিনি স্বামীসহ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। নির্বাসিত জীবন থেকে দলীয় নেতাদের বিশেষ অনুরোধে ও কর্তব্যবোধে তাড়িত হয়ে শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে এলেন। দেশে ফেরার দিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি ছিল।

দুর্যোগ উপেক্ষা করেও বিমানবন্দরে হাজার হাজার মানুষ তাদের মহান নেতার কন্যাকে দেখতে ও স্বাগত জানাতে ভীড় জমালেন। দেশে ফিরে আসার আগেই তাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তাঁর অর্জন কম নাই। এই সময়টাকে বরং তার রাজনৈতিক পরিপক্কতার কাল হিসাবে বর্ণনা করা যায়। দেশে ফিরেই তিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও গণতন্ত্র পূনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তিনি সংসদে প্রথমবারের মত নির্বাচিত হলেন ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর আসনে বসলেন। জনস্বার্থ বিবেচনা করে তিনি ১৯৮৮ সালের পদত্যাগ করেন। তারপর যুগপৎ আন্দোলন-সংগ্রাম। এরি মাঝে তাকে হত্যার প্রচেষ্টা কয়েকবার হয়েছে। এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করা হয় তিনি সেই জোটেরও প্রধান ছিলেন। এরশাদ শাসনামলে তিনি বেশ কয়েকবার গৃহবন্দী ছিলেন। শারীরিক আক্রমনের শিকারও হয়েছিলেন। তবুও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনিই মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৯০ সালের প্রচণ্ড গণআন্দোলনে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলেন। শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা, একাগ্রতা ও নমনীয়তার কারণে সবাই ধরে নিয়েছিল ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর হাসিনাই প্রধানমন্ত্রী হবেন। শতাংশের হারে বেশি ভোট পেয়েও সুক্ষ্ম কারচুপির কারণে তিনি বিএনপি অপেক্ষা কম সীট পেলেন। যে কারণে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর আকর্ষণীয় পদটি থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। জাতি বঞ্চিত হল মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের নেতৃত্ব থেকে।

১৯৯১ সালে জামায়েত ইসলামী তাদের যুদ্ধাপরাধী নাগরিক গোলাম আযমকে আমীর বা সভাপতি হিসেবে ঘোষণা দিলে দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়। গোলাম আযমকে আমীর করে ত্রিশ লাখ শহীদ আর মুক্তিযুদ্ধের ২ লাখ ৬৯ হাজার ধর্ষিতার প্রতি বিদ্রুপ করা হল। পরিণামে ঘাতক বিরোধী আন্দোলন শুরু হল আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে। ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহবায়িকা হিসেবে জাহানারা

ইমানের নির্বাচনে শেখ হাসিনার সক্রিয় সমর্থন ছিল। এই আন্দোলনের মূল দাবী ছিল ঘাতক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমসহ ৭১ এর সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট রাজনীতি নিষিদ্ধ, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মীয় স্থানগুলোতে রাজনীতি বন্ধ করা। আন্দোলনে শেখ হাসিনার আওয়ামীলীগ শরিফ সংগঠন হিসেবে যোগ দেয়। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে আন্দোলনকারী শক্তি বিশেষত: বুদ্ধিজীবীগণ অফুরন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করে। শেখ হাসিনা না থাকলে জামায়াতের ন্যায় ক্যাডার ভিত্তিক সশস্ত্র ফ্যাসিস্ট রাজনীতি নিষিদ্ধ, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মীয় স্থানগুলোতে রাজনীতি বন্ধ করা। আন্দোলনে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ শরিক সংগঠন হিসেবে যোগ দেয়। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে আন্দোলনকারী শক্তি বিশেষত: বুদ্ধিজীবীগণ অফুরন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করে। শেখ হাসিনা না থাকলে জামায়াতের ন্যায় ক্যাডার ভিত্তিক সশস্ত্র ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কঠিন ছিল। ১৯৯২ সালেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১০১ জন সংসদ সদস্য গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের দাবী জানিয়ে তা স্পীকারের কাছে পেশ করেন। তার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে গণআদালতের ২৪ জনের মুক্তি, গোলাম আজমের বিচার সহ ৪ দফা প্রস্তাব সংসদের গৃহীত হয়।

ঘাতক বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি সরকার পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী কয়েকটি নির্বাচনের দাবি তুলে শেখ হাসিনা আন্দোলন শুরু করেন। তাকে শারীরিকভাবে শেষ করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকে। তিনি অকুতোভয়ে এগিয়ে যান।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রবল গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠে। এই নির্বাচন দিয়ে বিএনপি পুনরায় ক্ষমতার অধিকারী হয়। কিন্তু সংসদের একটি অধিবেশনের পর সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। শেখ হাসিনার জনতার মঞ্চই সরকার পতনকে ত্বরান্বিত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচন ষড়যন্ত্রের কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বিএনপি-রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১২ জনের বেশী সেনা কর্মকর্তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত

ও কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করে। এবারে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মুক্তিযোদ্ধা জনতার মঞ্চ তৈরি হয়। একটানা ২২ দিন জনতার মঞ্চ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচারনায় জনমত সৃষ্টি এবং শেখ হাসিনার কৌশলী পদক্ষেপের কারণে ১২ জুনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শেখ হাসিনা প্রথম বারের মত রাষ্ট্রীয় ক্ষতায় অধিষ্ঠিত হন। এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পর থেকে তার রাষ্ট্রনায়কোচিত স্বরূপ উদঘাটিত হতে শুরু করে।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুরো সময়টা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁর সরকারকে আওয়ামী লীগ অপেক্ষা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের ঐক্যমত্যের সরকার মনে করতেন। তাঁর সরকারে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ ও বিএনপি'র নির্বাচিত সদস্যরা মন্ত্রী হিসাবে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, তার নিদর্শন ও মূল্যবোধ সংরক্ষণে তিনি কতিপয় ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। অপ্রতুল হলেও ঐসব ব্যবস্থায় আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভোটাধিকার নিশ্চিত হবার পর শেখ হাসিনা জনগণের ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে। এই লক্ষ অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও নীতি প্রণীত হয়েছিল, একই সাথে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছি। জনমঙ্গল নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিতিহার অংশ হিসাবে তিনি সংসদীয় কমিটিগুলো গঠিত ও পুনর্গঠিত করেন। এসব কমিটিতে মন্ত্রীর পরিবর্তে কোন সাংসদকেই চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তার সরকার গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে ও উন্নয়নের হাতিয়ার ও বাহন বানাতে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে গণপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান। দুঃস্থ মানুষের বিশেষতঃ বিধবা বয়স্কদের দূর্দশা ক্ষাণিকটা লাঘবের জন্য হলেও তিনি ভাতা প্রবর্তন করেছেন। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে অত্যন্ত কঠোর ও সময়োপযোগী আইন প্রণীত হয়েছে। দূগোর্গ ব্যবস্থাপনা ও সন্ত্রাস দমনে তাঁর সরকারের সফলতা একেবারে কম নয়।

তবে তাঁর প্রথমবারের সরকারের বিশাল অর্জন হচ্ছে ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি চুক্তি সম্পাদন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি

চুক্তি ও ইনডেমনিটি বিল রদ করে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিচার পর্বের সূচনা। এ'গুলো ছিল অনেক পুরানো সমস্যা। পানি সমস্যা পাকিস্তান আমলের আর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা প্রায় ২৪ বছরের পুরানো ছিল। আত্মঘাতি ও ভ্রাতৃঘাতি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা প্রচুর রক্ত ঝরিয়েছে; স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছিল এবং বহির্বিশ্বে মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালির ভামূর্তিকে চুরমার করে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সংকট সৃষ্টি করেছিল। শেখ হাসিনা তার কৌশলী নেতৃত্বে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এই অঞ্চলকে দেশের মূল স্রোতের সাথে সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। গঙ্গার পানি চুক্তি ও পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে উন্নয়নের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্তসহ প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে। তাঁর সরকারের এইসব ইতিবাচক পদক্ষেপের স্বীকৃতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও মিলেছে। বিশ্বের একাধিক শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে একটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছেন। আন্তর্জাতিক একাধিক শান্তি পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু কাঙ্খিত শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উপ-মহাদেশের পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধের প্রচেষ্টায় দেশে-বিদেশে তিনি আলোচিত হয়েছেন। শান্তি প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান অনন্য বলেই নোবেল পুরস্কার তিনি পাবেন বলে প্রত্যাশা ছিল। তারই মডেলে আয়ারল্যান্ডে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করায় দু' আইরিশ নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে। তাই সব মিলিয়ে তার অর্জনকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তাঁর আমলের অপর একটি বিশার অর্জন হচ্ছে বিশ্বের ১১তম দীর্ঘতম সেতু বঙ্গবন্ধু সেতুর উদ্বোধন। ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন তাঁর প্রথম শাসনামলের দু'বছর পূর্তি দিনে এটা উদ্বোধন করা হয়। পূর্ববর্তী সরকার আমলে সেতুটির কাজ শুরু হলেও মাত্র দু' বছরে এই সেতুর তিন-চতুর্থাংশ কাজ সমাপ্ত করে তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেন। সম্প্রীতি, সংযুক্তি ও উন্নয়নের দুয়ার এই সেতু খুলে দিয়েছে বলে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

তার আমলের অপর একটি অর্জন হচ্ছে কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিল যা বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারের পথ সুগম করেছে। বিশেষ ট্রাইবুনালে ঘাতকদের বিচার না করে প্রচলিত আদালতেই বঙ্গবন্ধু

হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে। যে কারণে অতীতে যেসব ঋণ সুবিধা আন্তর্জাতিক সংস্থা বন্ধ করেছিল তা আবারও মঞ্জুর করা হয়েছে। তার আমলে মাক্রো ইকোনমিক ব্যবস্থাপনার দূর্বলতা কাটিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুফল লুফে নিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। দেশে ঋণখেলাপী সংস্কৃতি প্রতিহত করতে উঠতি বুর্জোয়াদের বিরাগভাজন অনেক পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিল। সে আমলে প্রতিষ্ঠিত দেউলিয়া আদালত তন্মধ্যে অন্যতম। যে তারল্য সংকটের ধূয়া তুলে সমগ্র অর্থনীতিকে অস্থির ও ভয়াবহ করা হয়েছিল তা নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। তার প্রথম শাসনামলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি কিংবা বেতন বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যমূল্য কিছুটা বেড়েছিল, কিন্তু সুষ্ঠু ম্যাক্রো ইকোনমিক ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশের ভাগ্য সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়াসহ পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঘ্রদের মত হয়নি কিংবা পূর্ববর্তী সরকারের আমলের মত দুঃসহ পর্যায়ে পৌছেনি।

শেখ হাসিনার প্রথমামলের কতিপয় পদক্ষেপ জাতির জন্যে মঙ্গলজনক হলেও দলীয় রাজনীতিকে অসন্তুষ্ট করেছিল। এগুলোর মধ্যে আছে নির্মোহভাবে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষা বিলোপ টেন্ডার গ্রহণে লটারীর ব্যবস্থা প্রবর্তন। তার আমলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তাঁর সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের যত নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়েছিল পূর্ববর্তী ২১ বছরেও ততসংখ্যক সন্ত্রাসী কোন সরকার গ্রেফতার করেনি। মেডিকেল কলেজের ভর্তিতে মৌখিক পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় অন্যায় পথে ভর্তির পথ অনেকটা বন্ধ হয়েছে। টেন্ডারবাজী থেকে উদ্ভুত সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে লটারীর মাধ্যমে উচ্চ ও নিম্নদরদাতা নির্ধারণে সন্ত্রাসের প্রকোপ কমেছে। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জন মঙ্গলে তিনি এ'সব বলবৎ রেখেছেন। তন্মধ্যে অন-লাইনে টেন্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তন সময়ে অন্যতম। অন-লাইন ব্যবস্থা দেশে এমন অসংখ্য কিছুটা প্রবর্তিত হয়েছে যা এক সময়ে অকল্পনীয় ছিল।

তাঁর প্রথম শাসনামলে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে জাতিসংঘের ঘোষণা আদায়ও তাঁর অনন্য কৃতিত্ব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা তার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল। বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ঘোষণার জন্য তার চলমান প্রয়াসও

সফলতা অর্জন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পূর্ববর্তী সরকার আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে স্মৃতি সৌধের কাজ এবারে সমাপ্ত হয়েছে।

তাঁর শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধাদের যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা পূর্বে কোন আমলে এমনটি হয়নি। দুঃস্থ মানুষের মাথাগোঁজার ঠাঁই করে দিতে তার সরকার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও বহু নির্মাণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। একটি বাড়ী, একটি খামার এক অনন্য কর্মসূচি। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক তাদের লেনদেন কার্য শুরু করেছে। বন্যা ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্ম অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করে শেখ হাসিনা দেশি ও বিদেশিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তার প্রথম শাসনামলে যেখানে বিদেশি পত্রিকার পূর্বাভাস ছিল যে আকস্মিক বন্যায় দু'কোটি মানুষ মারা যাবে, সেখানে মালের ক্ষতি মাত্রাতিরিক্ত হলেও মানুষ মরেছে ২ হাজারেরও অনেক কম, তাও কয়জন না খেয়ে মরেছে সে তথ্য বিরোধী পক্ষও উপস্থাপণ করতে পারেনি।

তার প্রথমামলের সরকার ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছিল। সেই কবে ম্যালথাস নামক একজন ধর্মযাজক বলেছিলেন যে, 'জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে আর খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে'। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে বহু মানুষ অভুক্ত থেকে অতীতে যেমন মারা গেছে ভবিষ্যতেও মারা যাবে কিংবা প্রকৃতি প্রতিহিংসা বশতঃ ঝড়-ঝঞ্জা, রোগ-শোক, যুদ্ধ-বিগ্রহ দিয়ে জনসংখ্যা ও খাদ্য উপাদনের মধ্যে এক ধরনের সমতা রক্ষা করবেই । আমি এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলাম স্কুল জীবনে এবং এক জাতীয় হতাশা ও নৈরাশ্য আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমার ছেলে বেলায় বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটির মত; আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল এখন যা আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি। তখন জন্মের হার ছিল যেমনি বেশি, তেমনি শিশু মৃত্যু হার ছিল বেশি, ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ ছিল অনেক কম। ১৯৬৬-২০০০ তে জনসংখ্যা বেড়েছে সেদিনের তুলনায় তিনগুন। আবাদী জমির পরিমাণ বিবিধ কারণে অন্তত। এক তৃতীয়াংশ কমেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমলেও শিশু ও ধাত্রী মৃত্যুর হার কমেছে,

গড় আয়ু সাতাশ থেকে বেড়ে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় আড়াই গুণ বেশী। ফলতঃ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ছিল অকল্পণীয়। আশ্চর্য্য হলেও সত্যি সেই সময়ে অর্থ্যাৎ ১৯৬৬-২০০০ সালে বাংলাদেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়, খাদ্যে উদ্ধৃত্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। অথচ ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন খাদ্য ঘাটতি ছিল ৪০ লক্ষ টন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দুটো বন্যা হয়েছে। এতদস্বত্বেও খাদ্যে উদ্ধৃত্ত অর্জন ম্যালথাসের তত্ত্বকে নিঃসন্দেহে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। শেখ হাসিনা যখন ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পন করেন, তখন দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ টন। দ্বিতীয়বারের শাসনামলেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হচ্ছে এবং খাদ্য আমদানীর পরিবর্তে রফতানির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

এদেশে নারীরাও যে মানুষ সে কথা শেখ হাসিনার আগে কে এমন উপলব্ধি করেছেন আর কেই বা তাদের ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করেছেন? আমার নামের সাথে মায়ের নাম লিখতে বাধ্য হয়ে আমি শুধু আনন্দিত নই, কৃতজ্ঞ। তেমনি ভাবে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে শেখ হাসিনা তথা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ সরকার আমাকে জীবিত অবস্থায় সম্মানিত করেছে আর কবরে গমনকালেও মহিমান্বিত করেছে।

আন্দোলন সংগ্রামে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকলেও প্রথমামলে তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল নগন্য। তাঁর ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের অবস্থাও তদ্রুপ ছিল। অনেক মন্ত্রীই ছিলেন তাঁর বয়োজেষ্ট। একটি শক্তিশালী অথচ আক্রমণাত্মক বিরোধী দল ছিল। একটি গণবিরোধী অদক্ষ আমরা সুকৌশলে সমাজের প্রতিপক্ষ শক্তিকে জাগিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র ছিল। ২০০১ সালে শেখ হাসিনা সফলভাবে তার মেয়াদ সমাপ্ত করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান লতিফুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তিনি তার সাফল্যের ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে নির্বাচনে কোন কৌশলী ভূমিকাও নেননি। লতিফুর রহমান ও তাঁর মিত্রদের কুট-কৌশলেও পরাজয় ঘটে।

আবারও বাংলাদেশই শুধু সংকটে নয় শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত জীবনও অপরিমেয় সংকটে নিপতিত হয়। তাকে মেরে ফেলার প্রচেষ্টাও অব্যাহত

থাকে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামী মানুষটি নিজেই বার বার সন্ত্রাসীদের কু-নজরে পড়তে থাকে। ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট এর গ্রেনেড হামলায় আল্লাহ মাবুদ তাঁকে মহৎ কিছু করার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এ'সব সত্ত্বেও তিনি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি।

এতসব প্রতিবন্ধকতা ঠেলে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনে তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে দ্বিতীয়বারের মত সরকার গঠন করেন। নির্বাচনের বহু আগেই তিনি দিন বদলের সনদ জনসম্মুখে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বারের ক্ষমতা আরোহণের পূর্বেই তিনি তার দলের রূপকল্প ঘোষণা করেন। তার মিশন ও পর্যায়ক্রমে করণীয় সম্পর্কে আগেই ইস্তেহার জারি করেন। তন্মধ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত, সন্ত্রাস নির্মুল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান অন্যতম।

ইতোমধ্যে তার দ্বিতীয় শাসনামলের তিন বছরের বেশি দিন চলে গেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়কে আংশিক হলেও কার্যকরী করতে সক্ষম হন। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাস পরেই একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন। এ'দুটো ব্যাথাভার জাতি দীর্ঘদিন বহন করছিল।

একটির আপাততঃ সুরাহা হয়েছে। জাতির প্রত্যাশা মোতাবেক শেখ হাসিনা বিশেষ আদালতে নিষ্পত্তি না করে প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে বিচার কার্য শেষ করে দূরদর্শিতা নয়, রাষ্ট্র নায়ক সুলভ আচরণের প্রমাণ আরও একবার রাখলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও জাতীয় প্রত্যাশা। এখনও ৮৬ শতাংশ মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় । এই বিচারের জন্য শেখ হাসিনার পূর্ব প্রস্তুতি ছিল বিধায় তিনি বিগত জাতীয় নির্বাচনে এমন সব প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিলেন, যাদের কোন না কোনভাবে ঘাতক বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ততা ছিল। এ'কারণে অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ে আন্তর্জাতিক মানবতা বিরোধী আইন সংসদে সর্ব-সম্মতিক্রমে পাস হয়, বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং প্রতি একটির বদলে দুটো ট্রাইবুনাল করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বর্তমান শাসনামলে শেখ হাসিনা কোটি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ

করবেন। সরকার এ বছরের মধ্যে সে বিচারসহ গ্রেনেড হামলা, অস্ত্র আমদানি, দূর্নীতির যাবতীয় মামলা শেষ করতে বদ্ধ পরিকর।

বর্তমান শাসন কালের প্রারম্ভে তিনি যে পরিমাণ সাহস, ধৈর্য ও কর্ম-কুশলতা নিয়ে বি ডি আর বিদ্রোহ দমন করেছেন তা অনন্য। প্রতিপক্ষের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নিলে সারা জাতি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত। দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত তমসাচ্ছন্ন হয়ে যেত।

বর্তমান শাসনামলে তিনি প্রথম আমলে গৃহীত আরও কতিপয় বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধান দিচ্ছেন, তন্মধ্যে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন, খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার প্রয়াস, কমিউনিটি হাসপাতাল গুলো পুনঃ চালু করণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয়।

প্রসারের পদক্ষেপগুলো রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতি এক যুগান্তরকারী পদক্ষেপ দেখল। বিরোধী দল ও বিপক্ষের যৎসামান্য বাধার মুখে যে শিক্ষা নীতি কার্যকর হচ্ছে তা জাতিকে বহুদূর এগিয়ে নেবে, এই আমলে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য তিনি যে আইন প্রণয়ন করেছেন তা প্রশংসার দাবীদার। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খেতাবগুলো শুরু মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্তও একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

এমনি বহুবিধ অর্জন তার শাসনামলে ঘটেছে। স্থানাভাবে আলোচনা সীমিত রাখলাম। বেশি দূর না গিয়ে বিগত মার্চ মাসের কথাই ধরা যাক। ঐতিহাসিকভাবে মার্চে বহু কিছু বাঙালির জীবনে ঘটেছে। এই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মেছিলেন। এই মাসে তাঁর ভাষা আন্দোলনে নয়ন কাড়া অংশ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ যেমন ঘটেছিল, তেমনি ঘটেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। সেই ১৯৪৮ সাল থেকে যে জাতি স্বায়ত্ব শাসন বা স্বাধীকারের কথা চিন্তা করতেন তারাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ সুপ্তভঙ্গ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। আর এই বছর এই মাসের ১৪ তারিখে শেখ হাসিনার কৌশলী ও দূরদর্শি নেতৃত্বের ফলে সাগর গর্ভের ১১১৬০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গার উপর আমরা কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করি। এই ব্যাপারে যতই উল্টোপাল্টা কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হোক, এই বিশাল অর্জনের সূচনা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হাতে আর সমাপ্তি

থাকে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামী মানুষটি নিজেই বার বার সন্ত্রাসীদের কু-নজরে পড়তে থাকে। ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট এর গ্রেনেড হামলায় আল্লাহ মাবুদ তাঁকে মহৎ কিছু করার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এ'সব সত্ত্বেও তিনি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি।

এতসব প্রতিবন্ধকতা ঠেলে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনে তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে দ্বিতীয়বারের মত সরকার গঠন করেন। নির্বাচনের বহু আগেই তিনি দিন বদলের সনদ জনসম্মুখে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বারের ক্ষমতা আরোহণের পূর্বেই তিনি তার দলের রূপকল্প ঘোষণা করেন। তার মিশন ও পর্যায়ক্রমে করণীয় সম্পর্কে আগেই ইস্তেহার জারি করেন। তন্মধ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত, সন্ত্রাস নির্মুল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান অন্যতম।

ইতোমধ্যে তার দ্বিতীয় শাসনামলের তিন বছরের বেশি দিন চলে গেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়কে আংশিক হলেও কার্যকরী করতে সক্ষম হন। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাস পরেই একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন। এ'দুটো ব্যাথাভার জাতি দীর্ঘদিন বহন করছিল।

একটির আপাততঃ সুরাহা হয়েছে। জাতির প্রত্যাশা মোতাবেক শেখ হাসিনা বিশেষ আদালতে নিষ্পত্তি না করে প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে বিচার কার্য শেষ করে দূরদর্শিতা নয়, রাষ্ট্র নায়ক সুলভ আচরণের প্রমাণ আরও একবার রাখলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও জাতীয় প্রত্যাশা। এখনও ৮৬ শতাংশ মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় । এই বিচারের জন্য শেখ হাসিনার পূর্ব প্রস্তুতি ছিল বিধায় তিনি বিগত জাতীয় নির্বাচনে এমন সব প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিলেন, যাদের কোন না কোনভাবে ঘাতক বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ততা ছিল। এ'কারণে অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ে আন্তর্জাতিক মানবতা বিরোধী আইন সংসদে সর্ব-সম্মতিক্রমে পাস হয়, বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং প্রতি একটির বদলে দুটো ট্রাইবুনাল করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বর্তমান শাসনামলে শেখ হাসিনা কোটি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ

করবেন। সরকার এ বছরের মধ্যে সে বিচারসহ গ্রেনেড হামলা, অস্ত্র আমদানি, দূর্নীতির যাবতীয় মামলা শেষ করতে বদ্ধ পরিকর।

বর্তমান শাসন কালের প্রারম্ভে তিনি যে পরিমাণ সাহস, ধৈর্য ও কর্ম-কুশলতা নিয়ে বি ডি আর বিদ্রোহ দমন করেছেন তা অনন্য। প্রতিপক্ষের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নিলে সারা জাতি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত। দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত তমসাচ্ছন্ন হয়ে যেত।

বর্তমান শাসনামলে তিনি প্রথম আমলে গৃহীত আরও কতিপয় বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধান দিচ্ছেন, তন্মধ্যে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন, খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার প্রয়াস, কমিউনিটি হাসপাতাল গুলো পুনঃ চালু করণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয়।

প্রসারের পদক্ষেপগুলো রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতি এক যুগান্তরকারী পদক্ষেপ দেখল। বিরোধী দল ও বিপক্ষের যৎসামান্য বাধার মুখে যে শিক্ষা নীতি কার্যকর হচ্ছে তা জাতিকে বহুদূর এগিয়ে নেবে, এই আমলে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য তিনি যে আইন প্রণয়ন করেছেন তা প্রশংসার দাবীদার। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খেতাবগুলো শুরু মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্তও একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

এমনি বহুবিধ অর্জন তার শাসনামলে ঘটেছে। স্থানাভাবে আলোচনা সীমিত রাখলাম। বেশি দূর না গিয়ে বিগত মার্চ মাসের কথাই ধরা যাক। ঐতিহাসিকভাবে মার্চে বহু কিছু বাঙালির জীবনে ঘটেছে। এই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মেছিলেন। এই মাসে তাঁর ভাষা আন্দোলনে নয়ন কাড়া অংশ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ যেমন ঘটেছিল, তেমনি ঘটেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। সেই ১৯৪৮ সাল থেকে যে জাতি স্বায়ত্ব শাসন বা স্বাধীকারের কথা চিন্তা করতেন তারাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ সুপ্তভঙ্গ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। আর এই বছর এই মাসের ১৪ তারিখে শেখ হাসিনার কৌশলী ও দূরদর্শি নেতৃত্বের ফলে সাগর গর্ভের ১১১৬০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গার উপর আমরা কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করি। এই ব্যাপারে যতই উল্টোপাল্টা কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হোক, এই বিশাল অর্জনের সূচনা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হাতে আর সমাপ্তি

ঘটেছে শেখ হাসিনার হাতে। আমার ধারণা ২০২১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে পারলে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের নয় উচ্চ-আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে। আমাদের অবস্থা গ্রহীতার অবস্থান থেকে দাতার অবস্থানে উন্নীত হবে।

শেখ হাসিনা এবারে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বাংলাদেশ, দূর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে বিদ্যমান সম্পদের সু-ব্যবহার দিয়ে বাংলাদেশ কে তার সুবর্ণ জয়ন্তীতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার টার্গেট তিনি দিয়েছিলেন। সমুদ্র গর্ভে বিশাল সম্পদের সু-ব্যবহার করা গেলে এ'সময়ে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের নয়, উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবে।

এতসবের পরও মনে হচ্ছে তিনি দু'পা এগিয়ে এক পা পেছনে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। এ'সব হচ্ছে বিরোধীদের অহেতুক বিরোধীতা, দলীয় নেতাকর্মীদের অবিমৃশ্যকারিতা ও বিশ্ব বাজারের বৈরীতার কারণে। তবে আশা জেগে আছে। আমার মনে হয় দ্রব্যমূল্যে লাগাম টানা, বিদ্যুৎ সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান, যানজট নিরসন এবং সর্বোপরি দরিদ্র মানুষের মুখে স্বল্প মূল্যে আহার তুলে দিতে পারলে শহুরে বাবু এবং সুশীলদের মুখে ছাই দিয়ে তিনি আবারও নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তিও তাকে ছাড়া দ্বিতীয় কিছু ভাবতে পারছে না।

শেখ হাসিনার অন্যান্য গুণাবলী হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতি একনিষ্ঠতা, দেশপ্রেম ও সাধারণ মানুষ, নারী ও শিশুদের জন্যে অতুলনীয় দরদ। বিশ্বাঙ্গনে এ'সব আলোড়ন তুলেছে। ১৯৮১ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতির পথ পরিক্রমায় তার ভূমিকা মূল্যায়ন করল এ'কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় শেখ হাসিনা একজন রাজনীতি বিদ থেকে দক্ষ রাষ্ট্র নায়কে উন্নীত হয়েছেন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৬ হচ্ছে তার রাজনৈতিক পরিপক্কতার সময়। ১৯৯৬ সাল থেকে তিনি প্রমাণ করতে শুরু করেছেন তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদ নন, একজন রাষ্ট্রনায়ক। এত কিছুর পরও তিনি একজন সুদক্ষ লেখক। তিনি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন তাতে অচিরেই তাকে আমরা একজন ক্যারেশমেটিক নেতার আসনে দেখতে পাব। বিশ্বাঙ্গনেও

তার ব্যাপক পরিচিতি, জাতিসংঘে উত্থাপিত তার শান্তি ও উন্নয়নের মডেল আবারও বিশ্বে সারা জাগাতে শুরু করেছে। আশা করছি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন করে তিনি বিশ্বাঙ্গনে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে পারবেন। শেখ হাসিনা বলতে গেলে সারা জীবন দুর্যোগ ও দুঃসময়ের যাত্রী। মনে হয় স্রষ্টা তাকে দিয়ে মহৎ কিছু করিয়ে নেবার জন্য ভয়াবহ ও বিধ্বংসী গ্রেনেড হামলা থেকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমাদের প্রত্যাশা বাস্তবে রূপ নিক সেটাও আর এক প্রত্যাশা।

অধ্যাপক এমিরেটাস্ ড.এ.কে আব্দুল মোমেন

বিশ্ব পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুকন্যা

মানবতাই সবার ঊর্ধ্বে... তেমনি এক আলোকিত পরিমণ্ডল থেকে উঠে এসেছেন শেখ হাসিনা। সাম্প্রতিককালে মায়ানমারের নির্যাতিত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের তিনি সেই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে মহানুভবতা দেখিয়েছেন তা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন এবং তাঁর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন এবং তাঁর এ মহানুভবতা সরাবিশ্বে বাংলাদেশের জন্যে বয়ে নিয়ে এসেছে সুনাম, সমর্থন ও পরম শ্রদ্ধাবোধ। জয়তু শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা এমন এক পরিবার থেকে এসেছেন, দেশ ও মানবতার জন্য আত্মত্যাগ যাদের অপরিসীম। তাঁর পিতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাটা জীবন অতিবাহিত করে গেছেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। জীবনের দীর্ঘ সময়। এক্ষেত্রে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন একটি শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র-যেখানে সকলের জন্য সমানাধিকার, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল এমন একটি দেশ যার মূল ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, শান্তি-সমৃদ্ধি এবং জননিরাপত্তা' যেখানে থাকবে না ক্ষুধা-দারিদ্র্য, শোষণ এবং অবিচার।

মানুষের জন্য শেখ হাসিনার জীবনসংগ্রাম এখানেই শেষ নয়, তিনি এ পর্যন্ত ২৩ বার প্রাণঘাতী হামলার শিকার হয়েছে। প্রায় প্রতিটি হামলার ক্ষেত্রেই তার প্রিয় রাজনৈতিক সহকর্মীদের অনেকেই নিহত বা আহত হয়েছেন, নয়তো পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে, প্রিয় সহযোদ্ধাদের হারিয়েও শেখ হাসিনা দমে যাননি। তাঁর লড়াই-সংগ্রাম চলছে। সারাবিশ্বে আর কোনো দেশে এমন একজন নেতা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি নিজের সর্বস্ব হারিয়েও দেশের আপামর জনগণের ভোট ও

ভাতের অধিকার এবং একটি উন্নত-সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছেন। দেশে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষাসহ সকল মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি কাজ করে চলেছেন নিরন্তর।

এতে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই যে, দেশ ও বিশ্বপরিমণ্ডলে শেখ হাসিনা আজ গণতন্ত্র উন্নয়ন, ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রতীক। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘে অনেক প্রস্তাব আনে, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ, টেকসই উন্নয়ন এবং সকল জাতিসত্তার অব্যাহত উন্নয়ন ও মুক্তি। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরই নেতৃত্বে ও তাঁরই আনীত প্রস্তাবের কারণে জাতিসংঘে আজ 'উন্নয়নের অধিকার' একটি মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশের সভাপতিত্বে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ১৩২৫ নম্বর প্রস্তাবের কল্যাণে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের নেতা শেখ হাসিনার কল্যাণেই আজ জাতিসংঘে 'শান্তির সংস্কৃতি' চালু হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী জোরালোভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ আজ সর্বোচ্চ সেনা সদস্যদাতা রাষ্ট্র। যুদ্ধ-আক্রান্ত রাষ্ট্রে যাতে সাধারণ মানুষ এবং শান্তিরক্ষীরা সুরক্ষিত থাকে সে বিষয়ে শেখ হাসিনা বদ্ধপরিকর। বিশ্বে তিনিই একমাত্র নেতা যিনি বড়দিনের ছুটির মাঝেও জাতিসংঘ মহাসচিবের অনুরোধে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শান্তিরক্ষী প্রেরণ নির্দেশনা দিয়েছে। শান্তিরক্ষী প্রেরণে তিনি কখনই কার্পণ্য করেননি। এটি আনন্দের ব্যাপার যে, বাংলাদেশ একাই প্রায় আজ অবধি ১ লাখ ৫২ হাজার শান্তিরক্ষী জাতিসংঘে পাঠিয়েছে। বস্তুত জাতিসংঘে প্রতি দশজনে একজন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী। এই শান্তিরক্ষী বাহিনীর সমন্বয়ে জাতিসংঘ সারা পৃথিবীতে তুলনামূলকভাবে কম খরচে শান্তিরক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছে এবং এসব সৈন্যের অনেকেই শান্তি রক্ষার জন্য তাদের জীবনের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। তারা প্রকৃত অর্থেই শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারের দাবিদার।

শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘে দুটি যুগান্তকারী প্রস্তাব আনে ২০১২ সালে, যা সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বসভায় গৃহীত হয়। এর

প্রথমটি ছিল অটিজম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত, আর দ্বিতীয়টি জনগণের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত। তিনি বিশ্বাস করেন, সবারই অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, কারোরই বাদ পড়ার কথা নয়। মানবতা ও উন্নয়নে সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখতে পারে। তাই অটিজমে আক্রান্ত এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবন-যন্ত্রণা ও বঞ্চনার বিষয়টি যখন তাঁর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন আমাদের কাছে তুলে ধরলেন আমরা তখন এ নিয়ে কাজ করি। বাংলাদেশ দ্রুত এ বিষয়টি বিশ্বসভায় উত্থাপন করে এবং বিশ্ব নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমর্থন আদায় করে।

অটিজম এবং প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত অনেক বড় বড় সভা আহ্বান করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘ এবং তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সামনে বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার পরপরই তা প্রথমত সেকেন্ড কমিটিতে, যার সভাপতি ছিল বাংলাদেশ সেখানে পেশ করা হলে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘের সাধারণ সভা ও সবকটি জাতিসংঘ সংস্থার কর্মকাণ্ডে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। এক্ষেত্রে বৈশ্বিক নেতৃত্বটি অবশ্যই বাংলাদেশের এবং দেশটির নেতা শেখ হাসিনার।

শেখ হাসিনার 'জনগণের ক্ষমতায়ন' ধারণাটি জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনসহ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুরণিত হয়েছে। ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত 'রিও+২০ বিশ্ব সম্মেলনে' বিশ্ব নেতৃবৃন্দ 'কেমন ভবিষ্যত চাই' শীর্ষক দলিল গ্রহণ করেন, যার মধ্যে শেখ হাসিনা প্রণীত জনগণের ক্ষমতায়ন নীতিমালা এবং তার সঙ্গে জড়িত আদর্শ অনুসৃত হয়। উক্ত সম্মেলনে দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যার মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে সকলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জন। সম্প্রতি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব যা '2030 Agenda for Sustainable Development or SDGs নামে পরিচিত সেটির মুল ভিত্তিই ছিল রিও+২০ তে অনুসৃত 'কেমন ভবিষ্যতে চাই' শীর্ষক দলিল, যেখানে শেখ হাসিনার জনগণের ক্ষমতায়নের প্রতিফলন রয়েছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা জাতিসংঘে গ্রহণ করেন ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথার্থভাবেই শেখ হাসিনা প্রণীত জনগণের ক্ষমতায়ন

নীতিমালার আলোকে সবার অন্তর্ভুক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দরিদ্র দূরীকরণ, জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, সুশাসন ইত্যাদি নির্ধারিত হয়।

তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে জাতিসংঘে বাংলাদেশ কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিটি বিষয়ই এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শহর ও নগর এবং অভিবাসন উন্নয়ন, মানসম্মত শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন লিঙ্গ সমতা, শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার, জলসম্পদের আন্তঃদেশীয় ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য নীল অর্থনীতি (সাগর ও মহাসাগর), বিশ্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ, শান্তি ও স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন, পারস্পারিক সহযোগিতা, এমও আই, এলডিসি ইস্যু ইত্যাদি।

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে অবিস্মরণীয় অগ্রগতি, তা মূলত সম্ভব হয়েছে দেশটির নেতা শেখ হাসিনার উন্নয়ন চিন্তা এবং জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর অবিচল প্রতিজ্ঞার কারণেই। সম্পদের ব্যাপক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কেবল নেতৃত্বের বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা এবং সঠিক দিকনির্দেশনার কারণেই বাংলাদেশ এই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া ডায়নামিক পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে উৎসাহভরে যার ফলে অর্জন সহজ হয়। একদা যে দেশকে বলা হয়েছিল 'তলাবিহীন ঝুড়ি' যার 'সফল হওযার কোনো সম্ভাবনাই' বিশ্ব মোড়লেরা দেখেনি, সেই দেশের গড় গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আজ ৭.২৮ শতাংশ, তাও আবার একনাগাড়ে সাত বছর ধরে। চরম দারিদ্র্য ১৯৯১ সালে যেখানে ছিল ৫৭.৮ শতাংশ, ২০১৫ সালে তা কমে এসেছে ২২.৪ শতাংশেরও নিচে। একই সঙ্গে নবজাত শিশু মৃত্যুর হার ৭৩ শতাংশ কমিয়ে আনতে পেরেছে বাংলাদেশ। বিশ্বের সর্বাধিক জনঅধ্যুষিত ও স্বল্প আয়তনের এক দেশের জন্য এই সাফল্য একেবারে কম নয়। আর এই অর্জন সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই।

দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিরোধিতা এবং নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও শেখ হাসিনা তাঁর দৃঢ় ও আপোসহীন সিদ্ধান্তের দ্বারা দেশকে উন্নয়নের পথে

যেভাবে পরিচালিত করছেন এবং করেছেন, তার কল্যাণেই বাংলাদেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। অথচ পূর্বে দীর্ঘ সময় ধরে দেশটি ছিল খাদ্য ঘাটতির মধ্যে। এই ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য শেখ হাসিনা এবং তাঁর দেশবাসী বিশ্বসভায় সাধুবাদ পেতেই পারেন। আর তারই প্রমাণ আমরা দেখি যখন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেন, বাংলাদেশ হচ্ছে 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল এবং 'নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল নক্ষত্র'। আমেরিকার প্রভাবশালী ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ভাষায় বাংলাদেশ হচ্ছে 'দক্ষিণ এশিয়ার আলোকবর্তিকা আর গোল্ডম্যান শ্যাক্স তাদের গ্লোবাল অবস্থানে বাংলাদেশকে এন-১১ তে উন্নীত করেছে, যার অর্থ হচ্ছে ১১টি অগ্রসরমান অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ। নিউইয়র্ক টাইমস মনে করে যদি উগ্র সন্ত্রাসবাদ কোথাও মাথাচাড়া দেয় তাহলে তা দেবে পাকিস্তানে, কখনও বাংলাদেশে নয়। কারণ শেখ হাসিনার নারী শিক্ষার জোর ও নারীর সক্ষমতায়ন।

দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান দেশের সুনাম অর্জন করেছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনার নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে একাধিক পদকে ভূষিত করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য 'এমডিজি-৮ পুরস্কার' (২০১০)। সাউথ-সাউথ পুরস্কারে' তিনি ভূষিত হন ২০১৩ সালে.. .. দেশজুড়ে ১৩ হাজার ৮০০ কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের কাছে পৌছে দেয়া এবং ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণকে সফলভাবে ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তির সংযোগের আওতায় নিয়ে আসার স্বীকৃতিস্বরূপ। ২০১৪ সালে তাঁকে 'সাউথ-সাউথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয় বিশ্বের দক্ষিণের দেশগুলোতে নেতৃত্বের দূরদর্শিতার স্বাক্ষর হিসেবে ২০১৫ সালে তিনি জাতিসংঘ কর্তৃক দুটি পুরস্কারে ভূষিত হন। এগুলো হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব মোকাবেলায় সফলতার জন্য 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' পুরস্কার এবং টেলিযোগাযোগ খাতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন সংস্থার পুরস্কার' বা আইটিইউ অ্যাওয়ার্ড'।

২০০০ সালে যখন জাতিসংঘে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ঘোষণা প্রদান করা হয় তখন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নেতা হিসেবে

সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবার ২০১৫ সালে যখন ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গৃহীত হয় তখনও তিনি বাংলাদেশ সরকারপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘে নেতৃত্বদান করেন। তিনিই বিশ্বের একমাত্র নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বা নেতা, শুধু মহিলাদের মধ্যে নয়, সবার মধ্যে যিনি জাতিসংঘের উন্নয়ন সংক্রান্ত এ দু-দুটি মাইলফলক ঘোষণার সময় নিজের দেশের নেতা হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর দেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে মর্মে ২০০০ সালের সম্মেলনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতি দেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সামনে। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছেন। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম, যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পেরেছে। ২০১৫ সালের সম্মেলনে আবার যখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কেটসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করলেন (যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে) তখন শেখ হাসিনা বিশ্বসভায় এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর দেশ এই লক্ষ্যমাত্রাও যথাসময়ে পূরণ করবে। শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁরই স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী ও বিশ্বনেত্রী শেখ হাসিনা। এ হবে এমন এক বাংলাদেশ যেখানে সবাই পাবে সমানাধিকার, ন্যায়বিচার এবং সুষম উন্নয়নের সুযোগ। যেখানে সমৃদ্ধি ও শান্তির মাঝে বাস করবে দেশের প্রতিটি মানুষ। সেই' সোনার বাংলার' স্বপ্নই দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

আধুনিক বিশ্বে বাংলাদেশ আরও একটি কারণে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করছে, তা হলো একটি শক্ত, সৃজনশীল ও পরিশ্রমী অভিবাসী শ্রমিকদের দেশ হিসেবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ বাংলাদেশের প্রায় ৯০ লাখ প্রবাসী নাগরিক রয়েছেন, যারা কঠোর পরিশ্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছেন, তাদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছেন।

সমুদ্র-সীমা নিয়ে প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল সে বিষয়ে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সমুদ্র-আইন সংক্রান্ত

ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত শেখ হাসিনা গ্রহণ করেন, তারই ফলস্বরূপ বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমার ওপর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র ভারত এবং মিয়ানমারও তাদের আইনগত ন্যায্য পাওনা পেয়েছে। কোনো সংঘাত বা যুদ্ধ ছাড়া আইনের মাধ্যমে এহেন বিরোধ নিষ্পত্তির ঘটনা পৃথিবীতে বিরল।

দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশী নাগরিকদের অধিকার আদায়ে এবং নির্যাতিত জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নে এতটা সোচ্চার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কণ্ঠস্বর হতে পারে বলেই হয়তো বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে এবং বিভিন্ন কমিটি নির্বাচনে জয়লাভ করে নির্বাচিত হয়েছে। বস্তুত এ সময়ের মধ্যে কোনো আন্তর্জাতিক নির্বাচনেই বাংলাদেশ পরাজিত হয়নি; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের কথা ভেবে, বাংলাদেশ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে ওইসব নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহারও করে নিয়েছে। বাংলাদেশের নেতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি জাতি সংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তথা বিশ্ব নেতৃত্বেও আস্থা এবং প্রগাঢ় ভরসারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রায় ৫২টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে।

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটির ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে ২০১০ সালে বাংলাদেশ উক্ত কমিটির প্রস্তাবসমূহ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মতৈক্য অর্জনে সফল হয়। 'মানবপাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘের বন্ধু' রাষ্ট্রসমূহের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘের প্রস্তাব পাসের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মানবপাচার প্রতিরোধ ও অবসানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে উটের জকি ও দাস হিসেবে শিশুদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মাঝে সোচ্চার জনমত গড়ে তোলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হয়ে যাওয়া বাংলাদেশী শিশুদের উদ্ধারের নির্দেশ দেন ও তাদের উদ্ধার পরবর্তী পুনর্বাসনের পদক্ষেপ সংক্রান্ত সার্ক সম্মেলনে ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘের ' ফ্রেন্ডস অব মিডিয়েশন 'ফ্রেন্ডস অব ইন-অ্যালিনেবল, রাইটস অব প্যালেস্টাইন 'ফ্রেন্ডস অব নো ফুড ওয়েস্ট, নো ফুড লস' হি ফর সি'

এডুকেশন ফাস্ট, হেলথ ইনায়েটিব ইত্যাদি ভূমিকায় মানবতার মর্যাদা রক্ষা এবং জাতিসংঘ সদনের লক্ষ্য অজর্ননের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বস্তুতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘে একটি অত্যন্ত সম্মানজনক সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বর্তমানে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কেবল সর্বোচ্চ সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবেই নয়, সক্ষমতার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকারী দেশ হিসেবেও বাংলাদেশের সুনাম আজ জাতিসংঘে ব্যাপক। জাতিসংঘের 'হি অ্যান্ড শী' প্রোগ্রামের চ্যাম্পিয়ন হিসেবেও বাংলাদেশের নাম চলে আসে সবার আগে। জাতিসংঘ বাংলাদেশকে মডেল কান্ট্রি হিসেবে গণ্য করা হয়। মহাসচিবের নেতৃত্বে শান্তিরক্ষী নিয়োগ সংক্রান্ত সিনিয়র পরামর্শক কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীদের বা নীল হেলমেটের অভ্যন্তরার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং শান্তিরক্ষীদের বেতন ভাতা শতকরা ৩৭ পারসেন্ট বাড়াতে সক্ষম হয়। তাছাড়া প্রতিটি মৃত্যুর জন্য ৫০ হাজার ডলার থেকে ৭০ হাজার ডলারে উন্নীত করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য ১৯৯২ সালের পর এটাই সর্বোচ্চ বৃদ্ধি। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত প্রথম আঞ্চলিক রিভিউ কমিটির মিটিং বাংলাদেশ ঢাকাতে আয়োজন করে ২০১৪ সালের শুরুতে এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণ দান করে। প্রতি ১০ শান্তিরক্ষীর মধ্যে একজন বাংলাদেশী। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ নারী শান্তি রক্ষীদের জন্য নীল হেলমেট, বর্ম ও তলোয়ার চালানো এবং পুলিশের দু-দুটি নারী ইউনিট জাতিসংঘে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করছে।

শেখ হাসিনা কথা নয়, কাজে বিশ্বাসী। লক্ষ্য অর্জনে তিনি পিছপা নন এক কদমও। তার অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে বাংলাদেশের কর্মজীবী জনসংখ্যার মাঝে আজ নারীর অংশগ্রহণ প্রায় ৩৬ শতাংশে উন্নতি হয়েছে, যা পূর্বে ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। আজ বাংলাদেশে সরকারপ্রধান একজন নারী। জাতীয় সংসদের স্পিকার এবং সংসদ উপনেতাও নারী। বিরোধী দল প্রধানও নারী। নারীর ক্ষমতায়নের এক অনবদ্য সংযোগ। বিশ্বে এটাই অনন্য দৃষ্টান্ত। তাছাড়া তৃণমূলেও শত শত নারী আজ নির্বাচিত প্রতিনিধি। বাংলাদেশ জাতিসংঘের রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম যেখানে বছরের শুরুতে দেশব্যাপী

শিশুদের মধ্যে ৩২৬ মিলিয়ন বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ সেই রাষ্ট্র যেখানে এনজিওরাও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের সঙ্গে সমান তালে অংশগ্রহণ করে। তাই বাংলাদেশ আজ তার উদ্ভাবনী সুশাসন প্রক্রিয়া এবং যুক্তির নিরিখে চলার জন্য বিশ্ব দরবারে সম্মানিত। সামগ্রিক এই প্রক্রিয়ায় সন্দেহ বা বিস্ময়ের কোনো অবকাশই নেই যে, বাংলাদেশের নেতা শেখ হাসিনা আজ জাতিসংঘ তথা বিশ্ব পরিমণ্ডলে শান্তি ও ন্যায্যতার এক মূর্ত প্রতীক হিসেবে নিজের দেশ ও জনগণকে তুলে ধরেছেন সবার ওপরে। জয়তু বিশ্বনেতা শেখ হাসিনা।

অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

অনন্য ছাত্রনেত্রী

৬০ দশকে বাংলার জনগণের তখনকার যুবক এবং সাধারণ মানুষের প্রিয় মুখ তার বিশাল কর্মী বাহিনীর কাছে যিনি পরিচিত 'মুজিব ভাই' হিসেবে। তিনি বাঙালির মুক্তি সনদ ৬-দফা ঘোষণা করেন। ৬-দফা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানি অথবা এদেশের সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরাই এর বিরোধিতা করেনি, তখনকার আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ এবং নামিদামি নেতারাই মুজিব ভাইয়ের ৬-দফার বিরোধিতা করে দলত্যাগ করেন। এরকম অবস্থায় যিনি পরবর্তীকালে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে আবির্ভূত হন সেই শেখ মুজিবুর রহমান, নবীন কিন্তু বিশ্বস্ত কর্মীবাহিনী নিয়ে বাঙলার আনাচে কানাচে ৬-দফা প্রচার শুরু করেন। এ পরিস্থিতিতে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের কুখ্যাত গভর্নর মোনেম খান তার প্রভু ইয়াহিয়া খানের ভাষার প্রতিধ্বনি করে অস্ত্রের ভাষা, নির্যাতনের ভাষা, তথা ষড়যন্ত্রের ভাষা ব্যবহার করতে থাকে, যাতে করে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা জনগণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে না পারে।

ঠিক এমনই সময়ে, তখনকার সরকারি ইন্টারমিডিয়েট মহিলা কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচন হয়। তখন এটাকে ইডেন কলেজই বলা হতো। বর্তমান ইডেন কলেজের গোড়াপত্তন হয় তার কিছুদিন পর। ছাত্রীদের মধ্যে বৃহত্তম সংগঠন ছিল ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র ইউনিয়ন দু'ভাগে ভাগ হওয়ার পর মেয়েদের মধ্যে একচ্ছত্র জনপ্রিয় সংগঠন ছিল ছাত্র উইনিয়ন মতিয়া গ্রুপ তখন সাংগঠনিকভাবে ছিল বেশ দুর্বল। মেয়েদের অনেক কলেজেই ছাত্রলীগ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে বড় ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারতো না। ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও তাই আমরা যারা তখন ছাত্রলীগ রাজনীতির সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িত তারা জানতাম, এ ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের বিজয় ছিল পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু তখনকার ছাত্রলীগের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ছাত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রসংসদে ভিপি পদে নির্বাচন করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। আমরা যারা এ বিষয়টির সঙ্গে জড়িত ছিলাম, তারা যেহেতু শেখ হাসিনার নির্বাচনে বিজয়ের কোনো সম্ভাবনাই

ছিল না তাই এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রলীগের নেতৃত্ব স্থানীয় ছাত্র হিসেবে আমাদের মেয়েদের এ কলেজের নির্বাচনের ব্যাপারে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেন। এমনকি নিজস্ব সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বেশ শক্তিশালী একটি মহিলা কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এমন অবস্থার মধ্যে আমাদের মাথায় বাঁজ পড়ার মতো একটি দুঃসংবাদ আমাদের কানে পৌছে, কুখ্যাত গভর্নর মোনেম খান ঘোষণা করে 'শেখ মুজিবের মেয়ে যদি নির্বাচনে জয়ী হয় তাহলে সেটি হবে ৬- দফার প্রতি ম্যান্ডেট।' সুতরাং এমন অবস্থায় মোনেম খাঁ তার সব গুণ্ডাবাহিনী এনএসএফসহ সবাইকে শেখ হাসিনার বিজয় প্রতিহত করার জন্য মাঠে ময়দানে থাকতে বলে। কলেজ কর্তৃপক্ষকেও ধমকি-হুমকি দেয়া হতে থাকে। নির্বাচনের প্রচারণা চলতে থাকে। আমাদের পক্ষে (মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র) পোস্টার লেখা, কিছু লিফলেট ছাপানো অথবা কিছু সিংগাড়া পাঠানো ছাড়া বিরাট কিছু করার ছিল না। তবে, তখনকার দিনের অবস্থা বিবেচনা করলে খুব গর্বের সঙ্গে বলতে হয় যে, কাজটি আমরা খুবই আন্ত রিকতার সঙ্গে করেছি। নির্বিঘ্নে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আমরা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের মাঝে এবং নবকুমার স্কুলের দিকে ছোট্ট জটলা করে অধীর আগ্রহে ফলাফলের জন্য বসে থাকলাম। তবে মোটামুটি সকলেই একমত ছিলাম, আমাদের ছাত্রনেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে হারবেন কিন্তু কত ভোটে হারলেন সেটি জানার আগ্রহ ছিল। কারণ পরিশ্রম তো কম করিনি। নির্বাচনের ফলাফল বেরুলে প্রথম যখন শুনলাম যে, শতকরা প্রায় ৭০ ভাগের বেশি ভোট পেয়ে শেখ হাসিনা নির্বাচিত হয়েছেন তখন আমাদের ছাত্রলীগের একজন কর্মী ইউনুস ভাই কেঁদে ফেলেছিলেন। নুরুল হোসেন ভাই বললেন যে, আগে ঠিকমতো খোঁজ খবর নিয়ে দেখ, জিতলেই হলো বেশি ভোটের দরকার নেই। কেননা, শেখ হাসিনা নির্বাচিত হওয়া মানে ছাত্রসমাজ তথা যুবসমাজের মধ্যে ৬-দফার পক্ষে ম্যান্ডেট পেয়ে যাব আমরা। সেদিন সত্যিকারের ৬ দফার পক্ষে ম্যান্ডেট গ্রহণ করেছিলেন তখনকার ছাত্রলীগের নেত্রী শেখ হাসিনা। এ কারণে যখন করা হয়, ৬-দফাই হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার মূলভিত্তি। সঠিক ইতিহাস

লিপিবদ্ধ করার স্বার্থে উল্লেখ করতে হয় যে, এ মুল ভিত্তির প্রথম ম্যান্ডেট গ্রহণকারী হচ্ছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

এই ৬-দফার ম্যান্ডেট গ্রহণকারী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাই এবং আল্লাহ যেন তাঁকে দীর্ঘ, সুস্থ জীবন দান করেন এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রাখেন বাংলার মানুষের দিনবদলের সাফল্য আনার জন্য।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

বাংলাদেশ ভবন শান্তিনিকেতনে শান্তির পায়রা

পঁচিশে মে শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন হলো। তারিখটি এক ঐতিহাসিক দিন হিসেবে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হলো। এই উপলক্ষে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রনাথ মোদী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং আরো অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। শেখ হাসিনা শান্তি নিকেতনে বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা নবনির্মিত বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন করেছেন। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মোদী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জির উপস্থিতির কথা আগেই বলেছি।

ভারত ও বাংলা, বিশেষ করে দুই বাংলার এই মহামিলনে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে নতুন করে মৈত্রীর যে সেতুবন্ধ তৈরি হলো, তা দেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে হয়ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে নিজের কণ্ঠেই গান ধরতেন 'বাঙালির ঘরে যতো ভাইবোন, এক হউক এক হউক হে ভগবান।' বাঙালির রাজনৈতিক ঐক্যের কথা আজ বলা হয়ত অবাস্তব ও অবান্তর। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য এই ডাক দুই বাংলার মানুষের মনেই বিরাজিত।

জার্মান ভাষা দুই জার্মানিকে আবার একত্রিত করেছে। বাংলাভাষা বাংলার রাজনৈতিক বিভাজনের বাস্তবতা মেনে নিয়ে তার অভিন্ন সাংস্কৃতিক জাতীয়তা পুনর্নির্মাণ করেছে। এই নির্মাণ কার্যের একজন প্রধান স্থপতি শেখ হাসিনা যে হতে পেরেছেন এজন্যে আমরা গর্বিত। বাংলাদেশ ভবনে থাকবে রবীন্দ্রনাথ ও শেখ মুজিব মিউজিয়াম। শাশ্বত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণা, রবীন্দ্রভাবনায় ভাবিত হওয়া, শান্তি ও মানবতার জন্য অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহার করার জন্য এই ভবনের দ্বার থাকবে দুই বাংলার তরুণদের জন্যই অবারিত।

আশা করা যায়, শান্তি নিকেতনে বাংলাদেশ ভবন হবে এই নবীন তরুণ প্রজন্ম তৈরির কর্মশালা, শান্তি নিকেতনের বিশ্বজনীনতার সঙ্গে যুক্ত হবে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনাও। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার সঙ্গে এই চেতনার সাযুজ্য সহজেই লক্ষণীয়। এই সাযুজ্য হিংস্র হাতে ভাঙতে চেয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার দানব। শেখ হাসিনার কৃতিত্ব সেই দানবকে পরাভূত করে সেই সাযুজ্য ও সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

সাতচল্লিশ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক শাসকেরা ভেবেছিলেন, দুই বাংলার রাজনৈতিক বিভাগের সুযোগ নিয়ে পূর্ববাংলাকে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) তারা বাঙালির শাশ্বত ভাষা ও সংস্কৃতির শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের গৌরবময় আত্মপরিচয় মুছে দিতে পারবেন। এজন্যে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার সঙ্গে ঢাকার সমস্ত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে দুই বাংলার মধ্যে এক কালচারাল বার্লিন ওয়াল তৈরি করেছিলেন।

এই 'বার্লিন-ওয়ালে' প্রথম আঘাত লাগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন শুরু হওয়ার পর। মুজিব নেতৃত্বের অভ্যুদয় এবং অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক শাসকদের এই সাংস্কৃতিক বার্লিন-ওয়াল সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। এই দেয়াল ভাঙার যুদ্ধে মৃত্যুর ওপার থেকে রবীন্দ্রনাথেরও নেতৃত্বদান অতুলনীয়। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরাচারী শাসন উচ্ছেদে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির তারুণ্য যে আন্দোলন শুরু করে তার মূল প্রেরণা এসেছে রবীন্দ্র সংগীত থেকে। বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা" গানকে অঘোষিতভাবে ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলার জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেন।

এজন্যেই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সংগীতের প্রতি ছিল পাকিস্তানি শাসকদের চরম আক্রোশ। তারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সফল হননি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছিল অস্ত্র, কণ্ঠে ছিল গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' শুধু এই অস্ত্রের সঙ্গে নয়, এই সংগীতের সঙ্গে যুদ্ধেও পাকিস্তানি হানাদারেরা পরাজিত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলাদেশের মানুষের অশেষ ঋণ। দীর্ঘকাল পর শেখ হাসিনা সেই অপরিশোধ্য ঋণের কিছুটা হলেও শোধ করেছেন। তিনি প্রমাণ করলেন, বাংলাদেশের বাঙালি শুধু গঙ্গা-তিস্তার পানিরই ন্যায্য হিস্যা চায় না; তারা রবীন্দ্রনাথের বিশাল ঐতিহ্যেরও সমান অংশীদারিত্ব চায়। ভাঙা "বার্লিন দেয়ালের" উপর তিনি তাই শান্তি ও সহযোগিতার নতুন স্থাপত্য, নতুন ভবন তৈরি করেছেন। ২৫ মে তারই উদ্বোধন হয়ে গেল।

উদ্বোধন হলো শান্তি ও সহযোগিতার এক নতুন যুগের। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রনাথ মোদীর বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শান্তি নিকেতনে আসার ফলে হাসিনা-মোদী একটি প্রত্যাশিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গেও শেখ হাসিনার বৈঠক হওয়ার কথা। হয়ত হয়ে গেছে। এই লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত আমি তার কোনো খবর পাইনি।

শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্রনাথ মোদী দুই প্রধানমন্ত্রীই শান্তিনিকেতনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলেও তাদের বৈঠকে যে রাজনৈতিক কথাবার্তা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সেই কথাবার্তা দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতা সম্পর্কে। ভারত বাংলাদেশের বড় প্রতিবেশী এবং দেশটির স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের ছিল বড় ভূমিকা। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের একটা নৈতিক প্রভাব থাকবে এবং আছেও।

এ সম্পর্কটিকে বিষিয়ে দিয়ে অথবা দিল্লিকে বিভ্রান্ত করে বাংলাদেশের রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করার এবং নিজেদের সুবিধা লোটার একটা চক্রান্ত বাংলাদেশে আগেও ছিল এবং একটি সাধারণ নির্বাচনকে সামনে নিয়ে এখন সেই চক্রান্ত আবার দানা বেঁধেছে। কিন্তু বিজেপি'র মতো দলের সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েও নরেন্দ্রনাথ মোদী আগের কংগ্রেস সরকারের মতো হাসিনা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখেছেন, এমনকি আরো সংহত করেছেন। কারণ ভারতের দু'টি বড় দলের সরকারই জানে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের বিকল্প হচ্ছে গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে একটি ঘোর সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিদের মদদদাতা সরকার। যারা ক্ষমতায় এলে ভারতের স্বার্থ ও নিরাপত্তাও বিপন্ন হবে।

ভারতের সঙ্গে অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান হাসিনা সরকার করে ফেলেছেন। কেবল তিস্তার মতো কয়েকটি সমস্যা ঝুলে আছে। দিল্লি এই সমাধানেও রাজি। বাধা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির গোঁ। তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে হাসিনা-বিরোধী তা নন। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েই তিনি বাংলাদেশের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং শেখ হাসিনাকে দিদি সম্বোধন করেছিলেন।

তারপর রাতারাতি মমতা ব্যানার্জিকে পাল্টে যেতে হলো কেন? তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। তিনি তার তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একা একদিকে সংঘবদ্ধ বাম ও অন্যদিকে বিজেপিকে মোকাবিলা করে এখনো ক্ষমতায় টিকে আছেন। এর একটা বড় কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সমর্থন। এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে বড় অংশ মুসলমান এবং তাদের বড় ও প্রভাবশালী অংশটিই হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যাওয়া বিহারি সম্প্রদায়।

এরা পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক ও সামাজিকভাবে এখন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং রাজনৈতিক ভাবেও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই প্রচণ্ডভাবে বাংলাদেশ বিশেষত হাসিনা সরকারের বিরোধী। বাংলাদেশের জামায়াতের সঙ্গেও এদের গোপন ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। শুধু মমতা ব্যানার্জির সরকার নয় তার আগের বামফ্রন্ট সরকারও ক্ষমতায় থাকার জন্য এদের প্রভাব এড়াতে পারেননি। এদের প্রভাবেই বাম সরকার তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে তাড়িয়েছিলেন, তার বই নিষিদ্ধ করেছিলেন। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষক আন্দোলনে দিল্লি জামে মসজিদের ইমামকে আমন্ত্রণ করে পশ্চিমবঙ্গে এনে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ধিকৃত হয়েছিলেন।

মমতা ব্যানার্জির আমলেও এরাই সাবেক ইসলামিয়া কলেজের (বর্তমানে মওলানা আজাদ কলেজ) ছাত্রাবাস বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিপুত কক্ষটিতে ঢুকে ভাঙচুর করেছে। অনেকেই বলেন, মমতা ব্যানার্জি নিজে চাইলেও এই ভোট বাক্সের চাপে তিস্তার বাঁধ নিয়ে হাসিনা সরকারের সঙ্গে কোনো মীমাংসায় এগিয়ে আসতে পারছেন না। আমি এখনো পর্যন্ত জানি না, শেখ হাসিনার এবারের শান্তি নিকেতন সফরের সময় মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে প্রত্যাশিত বৈঠকটি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তিস্তা

বাঁধের সমস্যা নিয়ে কোনো কথা হয়েছে কিনা। আমার বিশ্বাস, তিস্তা ও অন্যান্য সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান শিগগিরই হবে এবং তা হবে যদি আগামী নির্বাচনে হাসিনা সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারেন। মমতা ব্যানার্জিও মন বদলাতে বাধ্য হবেন। বিএনপি-জামায়াত বা সুশীল সমাজের 'গুড গভর্নমেন্ট' ক্ষমতায় এলে সমস্যাটি ফারাক্কা সমস্যার মতো অনন্তকাল ঝুলে থাকবে। যার সমাধান হাসিনা সরকার ক্ষমতায় এসে করেছেন।

শান্তি নিকেতনের বাংলাদেশ ভবন শুধু একটি ইট কাঠ পাথরের বাড়ি নয়, তা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের একটি স্থাপত্যও। এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রাজনৈতিক মেলবন্ধনকেও দৃঢ় করবে। মোদী সরকার এবং নিশ্চিতভাবে মমতা সরকারও হাসিনা সরকার ও বাংলাদেশের আরো কাছাকাছি আসবেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে সারা এশিয়ায় শান্তি ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের সেতুটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ভারত ও চীনের শতাব্দী-প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের নবায়নের জন্য শান্তি নিকেতনে একটি চীনা ভবন স্থাপন করেছিলেন। এ বছর নরেন্দ্রনাথ মোদী শান্তিনিকেতনে সফরে যাওয়ার আগেই চীন সরকার এই চীনা ভবন সংস্কারের জন্য এক কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে স্থাপন করেছেন চীনা ভবন, শেখ হাসিনা প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলাদেশ ভবন। বাংলাদেশ, ভারত ও চীনের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সকল অশান্তি ও যুদ্ধভীতি দূর করে এশিয়ার আকাশে একদিন রাজনৈতিক শান্তিরও পায়রা ওড়াবে এটা আশা করা অবাস্তবতা নয়।

লন্ডন, ২৬ মে, শনিবার, ২০১৮

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুকন্যা শুধু পলিটিশিয়ান নন স্টেটসম্যানও

বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতো এককালে ছিল একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম, কেবল রাজনৈতিক পার্টি নয়। এখন অবশ্য তা নয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে কংগ্রেসে শুধু ডান বাম মধ্য বামদেরই সমাবেশ ঘটেনি, চরম প্রগতিশীল ও চরম প্রতিক্রিয়াশীলদেরও সম্মিলন তাতে ঘটেছিল। ভারতের সোস্যালিস্ট পার্টি, এমনকি অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টিও অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের এফিলিয়েটেড পার্টি ছিল। তখন একটি মাত্র লক্ষ্যে ভারতের সকল দল (একমাত্র হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগসহ কিছু ছোট দল ছাড়া) কংগ্রেসের প্ল্যাটফরমে ঐক্যবদ্ধ ছিল, লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন দল তাদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে যায়। কম্যুনিস্ট পার্টি আলদা হতে চায়নি। কিন্তু ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকার জন্য নেহরু কমিশন (জওয়াহের লাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত) কম্যুনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেন। কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ড. গোবিন্দ অধিকারী এই সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কংগ্রেস তা অগ্রাহ্য করে। পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করেন, 'কংগ্রেস এখন থেকে একটি রাজনৈতিক পার্টি, আর রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম নয়। কংগ্রেস তার নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে এখন থেকে জনগনের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।'

পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগ ভারতের কংগ্রেসের মতো একটি ঘোষিত রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম হয়নি; কিন্তু এই দলে ডান বাম, প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল সকল মতের (জামায়াত ও মুসলিম লীগপন্থীরা ছাড়া) মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছি। পাকিস্তানের অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই দলের নেতা-কর্মীদের এক বিরাট অংশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। আওয়ামী লীগ বাস্তবে একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমে

পরিণত হয়। এই প্ল্যাটফরমের লক্ষ্য ছিল মূলত স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যটি অর্জিত হওয়ার পর অবশ্য আওয়ামী লীগের এই রাজনৈতিক প্লাটফরমের চরিত্রটি আর বজায় থাকেনি। বাম রাজনীতির একটা অংশ স্বাধীনতার আগেই আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা অবশ্য জনবিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিলেন। দেশের রাজনীতিতে তাদের অস্তিত্ব এখন দূরবীণ দিয়ে খুঁজতে হয়। নেহরুর মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঘোষণা করেননি যে, আওয়ামী লীগ আর রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম নয়, বরং একটি রাজনৈতিক পার্টি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মাথায় তিনি আওয়ামী লীগকে নিয়ে এককভাবে নির্বাচন করেন। এবং এককভাবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে।

নিজের দল নিয়ে সরকার গঠন করলেও বঙ্গবন্ধু সদ্য অর্জিত স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষা করার লক্ষ্যে একা পথ চলতে চাননি। তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্য দুটি প্রধান দল কম্যুনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্‌ফর) সহ একটি রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করেছিলেন। তার নাম ছিল গণঐক্য জোট। এই ঐক্যজোটেরই সম্প্রসারিত রূপ বাকশাল। এটি একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা নয়। তিনি নিজের দলের ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রধান দলগুলো নিয়ে এই মোর্চা গঠন করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বাধীনতাবিরোধীদের সম্মিলিত চক্রান্ত থেকে স্বাধীনতা এবং তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষা করা।

বঙ্গবন্ধুর পর তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা দীর্ঘ একুশ বছর পর নির্বাচনে জয়ী হয়ে একক সরকার গঠনের চেষ্টা করেননি। দেশের স্বাধীনতার শত্রুরা যে কতটা পরাক্রান্ত এবং তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চক্রের যোগসাজশ কতটা শক্তিশালী তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠন করেছিলেন ঐকমত্যের সরকার । তার বর্তমান সরকারও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট সরকার। তার এই সরকারে ডানপন্থী এবং বামপন্থী দু'ধরনের দলই আছে। আছেন মধ্যপন্থীরাও। ফলে ২০১৪ সালের নির্বাচন বিএনপির বর্জন করায় যারা এই মহাজোট

সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা জেগে ঘুমানোর ভান করেন। বাস্তবতাকে মেনে নিতে চান না। এই বাস্তবতা হলো, গত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বা মহাজোট ক্ষমতায় না এলে বাংলাদেশের গণসমাজকে তালেবানী দাপট থেকে রক্ষা করা যেত না।

এই রাজনৈতিক পটভূমিতে আওয়ামী লাগের ২০১৬ সালের কুড়িতম জাতীয় সম্মেলন একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। বলা চলে এমনটি আগে কখনও ঘটেনি। শুধু সকল দলমতের মানুষ এই সম্মেলনে ভিড় জমায়নি; পৃথিবীর ছোট-বড় অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে এসেছেন। এসেছেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশের গণ্যমান্য প্রতিনিধিরা। তাদের অধিকাংশই হাসিনা-নেতৃত্ব সম্পর্কে একবাক্যে বলেছেন, 'আপনি শুধু বাংলাদেশের নেতা নন, সারা দক্ষিণ এশিয়ারই একজন নেতা।'

এটা সত্য শেখ হাসিনা এখন শুধু একজন পলিটিশিয়ান নন, তিনি একজন স্টেটম্যানও। দেশের রাজনীতিতে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বস্বীকৃত সাফল্য অর্জন করে তার নেতৃত্ব আজ একটি ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে তার নেতৃত্বের প্রভাব স্পষ্ট। তিনিই এই প্রতিষ্ঠা নিজের যোগ্যতায় অর্জন করেন। এখন তিনি নিজের আলোকেই আলোকিত। এখানে একটি ভয়ের কথা এই যে, আওয়ামী লীগ একটি ৬৭ বছরের প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠন এবং এককালের জাতীয় রাজনীতির প্ল্যাটফরম হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে একমাত্র-হাসিনা নেতৃত্ব ছাড়া তার কোনো বড় মূলধন নেই।

দলটিতে সুযোগসন্ধানী, সুবিধাবাদীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এই অবস্থা দল এবং হাসিনা-নেতৃত্ব দুয়ের জন্যই কল্যাণকর নয়। ভরসার কথা, শেখ হাসিনা এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং এবারের সম্মেলনে দলের নেতা ও কর্মীদের কাছে তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন, 'আত্মসংশোধন করুন, জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। আগামী নির্বাচনেও জয়ী হওয়ার জন্য দলকে প্রস্তত করুন। ' এই প্রস্তুতির লক্ষ্যে তিনি দলের মহাসচিব পদে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

এটা আমার অত্যুক্তি নয়, দক্ষিণ এশিয়ায় হাসিনা-নেতৃত্ব আজ যেমন স্বীকৃত সত্য, তেমনি আওয়ামী লীগকেও কেবল বাংলাদেশে নয়, গোটা

দক্ষিণ এশিয়াতেই গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি মোর্চা অথবা প্লাটফরম হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। এককালে যে চরিত্রটি ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের, আওয়ামী লীগ পুরোপুরি সেই চরিত্রে পৌঁছতে না পারুক তাকে তার কাছাকাছি পৌঁছতে হবে। যদি দলটি তা পারে তা হলে .শুধু বাংলাদেশেই নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোতেও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান শক্তিশালী করার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সাহায্য যোগাতে পারবে।

একটি প্রাচীন জীর্ণ বটগাছের মতো এখন আওয়ামী লীগের অবস্থা । একে আবার তাজা করে তুলতে হলে গাছটির মরা ডালপাতা, যাতেদুর্নীতি ও সন্ত্রাসের ঘুণ ধরেছে, তা নির্মম হাতে ছেঁটে ফেলতে হবে। নতুন পাতা গজাবার সুযোগ তৈরি করতে হবে। বর্তমানে দলটির অবস্থা যাই হোক, তার পুরনো প্লুরাল চরিত্রটি ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য দলের ভেতরে যে সার্জিক্যাল অপারেশন দরকার, এবারের সম্মেলনের পরিবেশ দেখে মনে হলো, শেখ হাসিনা সেই সার্জিক্যাল অপারেশনের জন্য প্রস্তুত। তবে তিনি রাতারাতি কিছু ঘটাবেন না। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো তার চিকিৎসা হবে ধীর কিন্তু সাফল্য নিশ্চিত।

এখন বাংলাদেশে শেখ হাসিনার মতো একজন অভিজ্ঞ ও দেশহিতৈষী নেত্রীর আরও কিছুকাল ক্ষমতায় থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন পুনর্গঠিত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের মতো একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মোর্চার তার পেছনে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ। কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক মোর্চার সমর্থন ছাড়া কোনো রাজনৈতিক সরকারের সাফল্য স্থায়ী হতে পারে না। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'আমার রাজনীতির অস্ত্র জনতার ঐক্য। শেখ হাসিনাও জনতার এই ঐক্যের জোরে দেশে সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন। শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক চরিত্র ফিরিয়ে এনেছেন। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ডদান করেছেন। সবচাইতে বড় কথা, যে জঙ্গিবাদ বিশ্বসন্ত্রাসের চেহারা ধারণ করে বাংলাদেশেও তার থাবা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল তার নখর তিনি ভোঁতা করে দিয়েছেন।

নেতার এই সাফল্যকে ধরে রাখা, দেশের উন্নয়নের সফল জনগণের দুয়ারে পৌছে দেয়া, সর্বোপরি স্বাধীনতার অপহৃত অর্জনগুলো পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে জনবিচ্ছিন্নতা দূর করতে হবে। স্বাধীনতা-পুনর্গঠিত ও

শক্তিশালী হতে হবে। জনবিচ্ছিন্নতা দূর করতে হবে। স্বাধীনতা-পূর্বকালের মতো একটি রাজনৈতিক পার্টি থেকে জাতীয় প্ল্যাট ফরমের অবস্থান আবার গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান সম্মেলন থেকে আওয়ামী লীগের এই পুনর্জাগরণের এবং পার্টি থেকে প্ল্যাটফরমে রূপান্তরিত হওয়ার কাজটি যদি শুরু হয়, তাহলে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে এবং আমাদের জাতীয় রাজনীতিতেও দলের এই কুড়িতম সম্মেলন একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

আবদুল মান্নান

তিনি এখন বাংলাদেশের জানালা

২৮ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭০ তম জন্মবার্ষিকী। তাঁকে জন্মদিনের টুপি খোলা অভিবাদন। শেখ হাসিনা কখনো তাঁর জন্মদিন ঘটা করে পালন করেন না।

আওয়ামী লীগের অন্ধ সমর্থক না হয়েও নির্মোহভাবে চিন্তা করলে স্বীকার করতেই হবে, শেখ হাসিনার শাসনকালে বাংলাদেশ বিশ্বপরিমণ্ডলে যে স্থানে গেছে তাই বলতে হবে। একই সঙ্গে তিনি নিজে বর্তমান বিশ্বে একজন সর্বজনসম্মানিত স্টেটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত। সম্প্রতি জার্মানিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জার্মানির পুনঃনির্বাচিত চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল তাঁর নির্বাচনী পোস্টারে তাঁর ছবির সঙ্গে শেখ হাসিনার ছবি ব্যবহার করে শুধু শেখ হাসিনাকেই নয়, বাংলাদেশকেও সম্মানিত করেছেন।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা যখন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষকে অন্ন জোগাতে পারলে বাড়তি ১০ লাখ মানুষকেও খাওয়াতে পারেন, তখন বলতেই হয়, এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সাহসের প্রয়োজন হয়। শেখ হাসিনার এই মন্তব্য ও বাংলাদেশের লাখ লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু প্রবেশের অনুমতি দিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে মানবতার জননী' (উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। যেদিন তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিলেন, সেদিন দেশের ও দেশের বাইরের মানুষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে তিনি কী বলেন। তিনি তাঁদের হতাশ করেননি। তিনি রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পাঁচ দফা সুপারিশ পেশ করেন। তাঁর এই বক্তব্য দেশে ও দেশের বাইরে সব মহলে প্রশংসিত হয়েছে। অবশ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে বিএনপির ফখরুল-রিজভী গং। তাঁদের মতে, শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়টি জাতিসংঘে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেননি। যেখানে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আর সরকার বলছে, মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের সসম্মানে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে, সেখানে বিএনপি ঘরানার কিছু পেশাজীবী আর সুধী বলছেন,

রোহিঙ্গাদের সে দেশে ফেরত দেওয়া চলবে না। তাঁরা মনে করছেন, এমনটি হলে বিএনপি-জামায়াতের ভোটব্যাংক সমৃদ্ধ হবে। এটি বর্তমান সরকার আর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরেকটি বড় ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস। শেখ হাসিনার ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে এসব ষড়যন্ত্রের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। এত নেতিবাচক সংবাদের মধ্যে বিশ্বখ্যাত মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস ম্যাগাজিন এশিয়ার প্রথম পাঁচটি দুর্নীতিপরায়ণ দেশের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে বাংলাদেশের নাম নেই। তালিকার শীর্ষে আছে ভারত, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান আর মিয়ানমার। এই সংবাদটি দেশের গণমাধ্যমে তেমন একটি গুরুত্ব পায়নি। ঘটনাটি যদি উল্টো হতো তাহলে দেশের বেশির ভাগ গণমাধ্যমে তা শিরোনাম হতো।

১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আটদলীয় জোটের জনসভায় যাওয়ার পথে সভাস্থলের অদূরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য এরশাদের পুলিশ বাহিনী তাঁকে বহনকারী ট্রাকের উদ্দেশ্যে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধুকন্যাকে বাঁচানোর জন্য দলের ২৪ জন নেতাকর্মী পুলিশের গুলিতে নিহত হন। সে সময়কার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশপ্রধান ছিলেন মেজর মির্জা রকিবুল হুদা (অব.) যিনি একাত্তর সালে পাকিস্তানের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর জিয়া এমন ১৪ জন সেনা কর্মকর্তাকে পুলিশ বাহিনীতে আত্তীকরণ করেছিলেন। সেই মির্জা রকিবুল হুদাকে বেগম জিয়া ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় গিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য যে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয়েছিল, সেদিন সেই হামলা থেকে বঙ্গবন্ধুকন্যাকে রক্ষা করার জন্য আবারও দলের ২৪ জন নিবেদিতপ্রাণ নেতাকর্মী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। কেন জানি মনে হয়, দলে সুযোগসন্ধানী হাইব্রিড নেতাকর্মীদের ভিড়ে শেখ হাসিনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত নেতাকর্মীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে।

আবেদ খান

শতাব্দীর 'জোয়ান অব আর্ক'

আমি অত্যন্ত অনুভব করেছি যখন জানলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফরসঙ্গীদের মধ্যে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এহসানুল করিম হেলাল টেলিফোনে আমাকে সংবাদটি জানালেন। হেলাল আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। সুজন, মিষ্টভাষী হেলাল প্রধানমন্ত্রীর দফতরের দায়িত্ব নিয়ে আসাতে প্রীত বোধ করেছিলাম এই কারণে যে, তিনি অন্তত তাঁর প্রাপ্ত পদটির মর্যাদা রাখতে পারবেন। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি কিংবা এই সফরের অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে একাধিক পর্বে লেখার উপকরণ সাজিয়েছি। পরবর্তীতে সেসব লেখা যাবে। মূল সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েই এবারের কলম ধরা।

যাত্রা উদ্দেশ্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ। দশদিনের নিউইয়র্ক সফর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারটি সৌভাগ্যবাহী, সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচাইতে উত্তেজনাকর চারটি ঘটনার জন্য আমার কাছে এই সফরটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকবে। এক আইটিইউ-এর কাছ থেকে 'আইসিটির সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' পুরস্কার গ্রহণ দুই. জাতিসংঘের অত্যন্ত সম্মানজনক পুরস্কার 'ইউএন চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ; তিনি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলায় ভাষণ প্রদান এবং চার. কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রোটুন্ডা লো মেমোরিয়াল লাইব্রেরি মিলনায়তনে বক্তৃতা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা করে আসছেন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই। যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ হাসিনা সেটাই অনুসরণ করে চলেছেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাঁর পিতার অনুসৃত পথেই পা রেখে চলছেন এই ক্ষেত্রে। কিন্তু আমার ব্যাখ্যা তা নয়। আমি মনে করি।

তিনি বাঙালি হিসেবে বাংলাভাষার মর্যাদা, গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্যই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এটা তাঁর কমিটমেন্ট-এরই অংশ এর আগে জাতিসংঘে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছি। এবার সরাসরি অধিবেশন কক্ষে বসে প্রত্যক্ষ করলাম অভাবনীয় এবং শিহরণ জাগানো সেই অভিজ্ঞতা! বিশ্বসভায় বাংলাভাষায় প্রদত্ত ভাষণ হেডফোনের মাধ্যমে অনূদিত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে পৃথিবীর অধিবেশনে উপস্থিত সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানদের কর্ণকুহরে, তাঁদের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠছে বাংলায় বর্ণিত শব্দধ্বনির যথার্থ অর্থ। অধিবেশন কক্ষে বসে সেই দৃশ্য দেখে নিজেকে একজন গর্বিত বাঙালি মনে হচ্ছিল।

যে দুটি অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার লাভ করেছেন, সেই দুটি অনুষ্ঠানে অবশ্য আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। যাঁদের যাবার সুযোগ ছিল তাঁদের কাছে থেকে শুনেছি- দুটি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের প্রাপ্তির পাল্লাটি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্রমান্বয়ে এত ভারী করে দিচ্ছে যার ফলে এর ওপরে নতুন অর্জন এখন কেবল একটি সংযোগ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

তবে আমি সবচাইতে আলোড়িত এবং বিমুগ্ধ হয়েছি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানটিতে। পুরো অনুষ্ঠানটি আমার স্মৃতিপটে আশ্চর্যজনকভাবে জীবন্ত হয়ে আছে। সেখানে আমি আবিষ্কার করলাম অন্য এক শেখ হাসিনাকে। দেখলাম দৃপ্ত পদক্ষেপে ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তিনি মঞ্চে এলেন। তাঁর সংরক্ষিত আসনে বসে উপস্থিত দর্শকদের দিতে হাত নাড়ালেন। শান্ত সমাহিতভাবে পাশে রাখা গ্লাস থেকে পানি পান করলেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পাঠাগার মিলনায়তনটি ভর্তি ছিল ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে। তাদের মধ্যে প্রায় ষাটজনের মতো ছিল বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী। ভারতীয় ছিল, চীনা ছাত্রছাত্রী ছিল আর বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরাও।

আমরা আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ঘন্টাখানেক আগে। কঠোর তল্লাশি পেরিয়ে যখন দর্শক সারিতে বসলাম

তখন মনে হয়েছিল, এ তো দারুণ এক জায়গা! এখানে পৃথিবীর অনেক দেশের রাজনীতিক এসে মুখোমুখি হন ছাত্রছাত্রীদের। এই অনুষ্ঠানেরও মূল উদ্যোগ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরামের। আয়োজক স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্যবাহী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সেদিন একমাত্র বক্তা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বক্তব্য দেবেন 'গার্লস লিড দ্য ওয়ে' বিষয়ের ওপর। বার বার ভাবছিলাম বিষয়টা নিয়ে কী বলবেন তিনি! হল-ভর্তি সব তুখোড় ছেলেমেয়ে। এটি এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে একটু এদিক-ওদিক তাকালেই দু-একজন নোবেল-পদক বিজয়ীকে দেখা যায়, তাঁদের শুধু চিনলে হয়। এরকম একটা বিদ্যাপীঠেই এসেছি আমরা। আমাদের অনুষ্ঠানস্থলের অনতিদূরে একজন যশস্বী ব্যক্তির মূর্তি আছে, যাঁকে বলা হয় আধুনিক সাংবাদিকতার প্রাণপুরুষ-জোসেফ পুলিৎজার। যিনি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন ফ্যাকাল্টি যাঁর নামে প্রবর্তিত হয়েছে সাংবাদিকতার নোবেল পুরস্কার হিসেবে পরিগণিত পুলিৎজার পুরস্কার। এই রকম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি বক্তৃতা দেবেন, নানাবিধ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেবেন । ভাবা যায়! শুরু হলো অনুষ্ঠান। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. লি সি বোলিঙ্গার স্বয়ং স্বাগত-ভাষণ দিয়ে সূচনা করলেন অনুষ্ঠানের। জানিয়ে দিলেন এই মিলনায়তনে কত তুখোড় রাজনীতিক বক্তব্য দিতে এসেছেন, ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিমোহিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ড. বোলিঙ্গার স্বয়ং সঞ্চালকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বিভিন্ন অবদানের প্রসঙ্গ তুলে। তারপর জানালেন এই এক ঘন্টার সীমাবদ্ধ সময়ে শেখ হাসিনা কতটুকু কথা বলবেন, কতটুকু সময় বরাদ্দ প্রশ্নোত্তর পর্বের। তারপর ফ্লোর ছেড়ে দিলেন মূল আলোচককে।

স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। চমৎকার সাবলীল এবং প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে কথা শুরু করলেন। কণ্ঠস্বরে কোনো জড়তা নেই, বাক্যবয়ানে শব্দচয়নে অভ্রান্ত প্রক্ষেপণ। বিষয়বস্তু থেকে বিচ্যুতি নেই, অথচ ওই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উঠে এলো অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থেকে উন্নয়ন-যাত্রায় নারীর অবদান- কোনো কিছুই অনুক্ত রইল না। আজ যে দেশ

দ্রুততার সঙ্গে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তার পেছনে আছে সদিচ্ছা, অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মপন্থা গ্রহণ, নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা, শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান-এ-সবই তুলে ধরলেন তিনি। চমৎকার প্রাঞ্জল ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার মাঝখানে হঠাৎ কিছুক্ষণ বাংলায় বক্তব্য দিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে। তুমুল করতালির মধ্যে তিনি তাঁদের আহ্বান জানালেন পৃথিবী অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর অধীন বিদ্যা দেশ ও মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য।

প্রধানমন্ত্রীর সম্মোহনী বক্তব্য প্রদানের পর ড. বোলিঙ্গার আবেগঘন কণ্ঠে কয়েকটি বাক্যে অভিব্যক্তি জানিয়ে সূচনা করলেন প্রশ্নোত্তর পর্বের। প্রথম প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন তিনি। ধর্মীয় উগ্রবাদ বাংলাদেশের জন্য কতখানি হুমকি-এই প্রশ্নের উত্তরে যে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাখ্য দিলেন, তা চমৎকৃত হওয়ার মতো। তিনি বললেন, সমাজের অন্ধকার দূর করতে হলে জ্ঞানের মশাল জ্বালাতে হবে। শিক্ষাকে মানুষের অধিকারে পরিণত করতে হবে। তারপর থেকে শুরু হলো ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের পালা। যে ইংরেজিতে প্রশ্ন করছে তিনি ইংরেজিতেই তার উত্তর দিচ্ছেন। যারা বাংলায় প্রশ্ন করছে তাদেরকে তিনি উত্তর দিচ্ছেন বাংলায়। দেখলাম, বুদ্ধির প্রাচুর্যে এবং যুক্তির শাণিত ব্যাখ্যায় তিনি সব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন- কখনও গভীর মমতা দিয়ে তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন যেভাবেই হোক দেশটাকে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে বক্তা এবং শ্রোতা-উভয়কেই তৃষ্ণার্ত থাকতে হলো। কীভাবে এবং কত দ্রুত যেন বয়ে গেল সময়। ওই অনুষ্ঠানে বসেই আমি ভাবছিলাম এ কোন শেখ হাসিনাকে দেখছি আমি? সেই ষাটের দশকের গোড়ায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিজিটার্স কক্ষে রাজবন্দী 'লিডার' মুজিবভাইকে দেখতে আসা তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দেখেছিলাম যে হাসিনাকে, তার সঙ্গে আজকের শেখ হাসিনার কী বিশাল পার্থক্য। আমার মনে হলো- প্রজ্ঞায়, জ্ঞানে পরিপক্বতায় তিনি আমাদের ভৌগোলিক সীমানাকে পেরিয়ে গেছেন। জাতীয় পরিমণ্ডল ছাপিয়ে তিনি আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছেন একজন বিশ্বনেতায়। শেখ হাসিনা ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন তৃণমূল পর্যায় থেকে। এমন

সময় তিনি ছাত্র রাজনীতির অন্যতম নেত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন যখন বঙ্গবন্ধু কারান্তরালে, তাঁর বিরুদ্ধে চলছে অন্তহীন কুৎসা প্রচারণা। ঠিক তেমনি সময় তিনি সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় ছাত্রপরিষদ নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে আপন জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। তারপর অতি সন্তর্পণেই সরে গেছেন। রাজনীতির পাদপ্রদীপ থেকে। স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছেন নিজ থেকেই। তখন মুজিবভাই-ভাবী আমাদের কাছের মানুষ হলেও তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, মস্কোপন্থি রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সাংবাদিকতা করি, সাংবাদিক ইউনিয়ন করি, শ্রমিক সংগঠন করি, সাংস্কৃতিক আন্দোলন করি। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে সাংবাদিকতা পেশাকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি। বাকশাল হয়েছে, সাংবাদিকদের বাকশালে যোগদানের বিরোধিতা করেছি, ইত্তেফাকের চাকরি গেছে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর যেদিন চাকরি ফেরত পেয়েছি, প্রচুর ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও জাতির জনককে তাঁর যোগ্য সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করে গেছি-তখনও শেখ হাসিনা দেশে ফেরেননি।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি হয়তো, এই বিষয়টি নিয়ে না হয় পরে লেখা যাবে। বলছিলাম, শেখ হাসিনার রাজনীতিক হয়ে ওঠার কথা, ভাঙনের কূল থেকে একটি গড়ে তোলার কথা, ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি দেশকে ধীরে ধীরে তৈরি করে মর্যাদাবান আত্মসম্মানবোধ পরায়ণ, উন্নয়নের সোপান অতিক্রম করে সফলতার সিংহদুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার ক্লান্তিহীন প্রয়াসে নিয়োজিত এক সাহসী নারীর কথা-যাঁর এক চোখে স্বপ্ন আরেক চোখে সেই স্বপ্নপূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতিচ্ছবির চিহ্ন।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ দিয়েছেন জাতিকে আর শেখ হাসিনা দিয়েছেন আধুনিক বাংলাদেশের রূপরেখা, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অদম্য সাহস ও শক্তি। আজ গোটা পৃথিবী কেন এই একবিংশ শতাব্দীর 'জোয়ান অব আর্ক'কে দেখে শ্রদ্ধায় অবনত হয়-সেটা উপলব্ধি করলাম সেদিন সেই কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির রোটুন্ডা লো মেমোরিয়াল লাইব্রেরির মিলনায়তনের অনুষ্ঠানে। আমার জন্য এ এক অনুপম অভিজ্ঞতা, সন্দেহ নেই।

বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য যে, আমরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা তাঁরই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে পেয়েছি, যিনি

বাংলাদেশকে, বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে অভিসিক্ত করেছে। একজন শেখ হাসিনা আজ শুধু বাংলাদেশের প্রতীক নয়, তিনি বিশ্বমানবতারও প্রতীক। মানবিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার তিনি দিয়েছেন এই জাতিকে। শেখ হাসিনা যতদিন আছেন, ততদিন আমরা নির্ভয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারবো। আজকে তিনি আছেন বলেই আমরা বুঝতে পারিনা তিনি এ জাতি ও এদেশের জন্য কতটা অপরিহার্য

আয়াত আলী পাটওয়ারী

যা বলি তা সত্য কথা?

বাঙালি জাতির পিতা বিশ্ববাসীর এক মহান নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা যিনি ইতিমধ্যে বিশ্বের এক সেরা নারী নেত্রী হিসেবে খ্যাত। যিনি বর্তমানে ও দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়, রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে মহীয়ান গরীয়ান, তাঁর সম্পর্কে আমাকে লিখতে বলা হয়েছে গদ্য।

আমি বেশ ক'বছর পদ্য লিখেছি, কিন্তু গদ্য লিখতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছি তারপর কি অভিধায় শুরু করি, ভেবে পাই না। কি লিখতে গিয়ে কি ভুল করি, কে জানে? এটা ভাবতে ভাবতেই হুঁশ' নামে পদ্য ভাসে চোখের সামনে

যা বলি তা কি সত্য কথা
বোঝাতে পারি কি মনের ব্যথা?
আমি পেছনে পড়ে থাকি
শুধু বাঁচাতেই সততা।
আমি দু'পা সামনে হেঁটে
একপা যে পেছনে হটি
আমি ঘুরে ফিরে দেখি
করেছি কিনা কোন ত্রুটি।

গদ্য মধ্যে পদ্য ঘুরপাক খায় বেশি বেশি, মাথার খুলির ভেতরটায়। পদ্য নিয়েই একটি গদ্যের গল্প আছে আমার কাছে। একেবারে সত্যের গল্প বঙ্গবন্ধুর তনয়া শেখ হাসিনা আমার কাছে শুধু রাজনৈতিক নেত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রীই নয়, তার আরো পরিচয় আছে। তিনি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত বিশ্বশান্তির দূত, তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য অভিধা আছে তাঁর। তিনি একজন সুলেখিকা তাঁর লেখা অসংখ্য গ্রন্থ এরইমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আমার মনে আছে দেশের সেরা প্রকাশনী আগামী প্রকাশনী থেকে প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়- "ওরা টোকাই কেন?" নামে। আমি তখন বইমেলায় আগামী প্রকাশনীতে নিয়মিত। আমার লেখা বইয়ের ক্রেতার অভাব নেই-।

কিছুক্ষণ পরপরই-বইপ্রেমী ক্রেতা আসে, উত্তর দক্ষিণ দুই প্রান্তেই শেখ হাসিনার বই বিক্রি হচ্ছে। আমি অন্তরদগ্ধ হয়ে বইটা পড়ছি আর ভাবছি প্রথম প্রকাশনাই হিট! বিষয়বস্তুও অতি মানবিক। বঙ্গবন্ধুর কন্যা কিংবা নেত্রী বলেই কি এতটা বিক্রি হচ্ছে? গল্প বিন্যাস কবিতা তো নয়, তবু চলতে বইটা পড়তে পড়তে বুঝে নিলাম যে, নামে নয়-লেখার গুণেই বইটির এতোটা কাটতি। তারপর তো আরো বই বেরুতে থাকলো শেখ হাসিনার। একের পর প্রকাশনা শুধু 'আগামীতেই সীমাবদ্ধ রইল না। অন্যান্য বিখ্যাত প্রকাশনীগুলোও শেখ হাসিনার বই ছাপছে। অনেকে নানাভাবে চেষ্টা করছে নেত্রীর বই প্রকাশ করে সৌভাগ্যবান হতে। আমি অবাক হই রাষ্ট্রীয় কাজে দিনরাত এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি লিখছেন! ছাপা হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ সংস্করণও ছাড়িয়ে যাচ্ছে কোনকোন বইয়ের। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অনেক । সংখ্যা এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

কবিতারও সমঝদার তিনি। জাতীয় কবিতা পরিষদের ফেব্রুয়ারি উৎসবে কাউকে জানান না দিয়ে হুট করে হাজির হয়েছেন এমনটাও ঘটেছে। তবে সে সময়টায় প্রধানমন্ত্রী হননি বটে।

ওয়ান ইলেভেন-এর পর ২০০৭-এ তখন জরুরি অবস্থায় কারাবন্দি নেত্রী। মামলারও আসামী। শেরেবাংলা নগরে বিচার চলছে। আইনজীবী হিসেবে আমরা অনেকে হাজির হচ্ছি আদালতে প্রতিদিন ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ, সৈয়দ রেজাউর রহমান-এর নেতৃত্বে। নেত্রীর জন্মদিনও ঘটা করে হয়নি সেবার। জরুরি অবস্থায় সব কর্মকাণ্ড ছিল নিষিদ্ধ। আমরা তিনজন কবি-আমি, রবীন্দ্র গোপ ও আসলাম সানী কারাবন্দী নেত্রীর জন্মদিনে কবিতা লিখেছি, জনকণ্ঠ পত্রিকায় তা ছাপা হয়েছে।

আদালতে এক ফাঁকে বললাম-

আপা, আপনার জন্মদিনে আমরা কবিতা লিখেছি। জনকণ্ঠ ছেপেছে। এক ঝলক হেসে তিনি খুব খুশি হলেন।

বললেন- কই?

আমি বললাম-কাল নিয়ে আসবো। আজ তো আনা হয়নি। পরদিন পরনের কোর্টের সামনের বড় পকেটে করে পত্রিকাটি নিয়ে গেলাম। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দাদের চোখ কান খাড়া। ধরা পড়লে বিপদ।

আদালতের কার্যক্রম শেষে ভিড়ের মাঝে আমি এবং আপা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছি এবং এরমধ্যে আপা তার ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে ধরলেন পকেটের কাছাকাছি, আমি চট করে পত্রিকাটি বের করে ওটা ব্যাগে পুরে দিলাম। গোয়েন্দা কেউ বুঝতে কিংবা টের করতে পারলোনা। বুঝতে পারলোনা। দেখতে পেলোনা কোন সাংবাদিকও।

তারপরের ঘটনা ১৫ আগস্ট। দেশে জরুরি অবস্থা। শোকদিবস। জরুরি অবস্থায় কারো কোন কর্মসূচি নেই- অনেকে গা ঢাকা অবস্থায় । কবিরা কি জরুরি অবস্থা মানতে পারে? কেউ সাহস করছে না কিছু করার । আমি, আসলাম সানী, রবীন্দ্র গোপ তিনজনে স্থির করলাম ১৫ই আগস্ট জনকের প্রতিকৃতিতে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করবোই। কেউ বত্রিশে না যাক, আমরা যাবোই।

বত্রিশ নম্বর ১৫ই আগস্টে ফাঁকা যাবে না। প্রথম মানব বন্ধন হবে, শেখ হাসিনার, মুক্তি দাবিও হবে। প্রথম আমার উপর দায়িত্ব পড়লো যদি গুণ দাকে (কবি নির্মলেন্দু গুণ) রাজি করানো যায়, পরে অনেককেই পাওয়া যাবে। আমি গুণদাকে তাৎক্ষণিক ফোন করি।

গুণদা শুনে বললেন-তুমি বলছো? আমি বললাম- হ্যাঁ, তিনি বললেন, জরুরি অবস্থা ভাঙবেই? বললাম-প্রয়োজনে তাই। গুণদা বললেন: আমি রাজি। আমি আসলাম সানী, রবীন্দ্র গোপ তখন খুশি। এরপর আমরা যোগাযোগ করি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের গোলাম কুদ্দুছ এর সঙ্গে। কুদ্দুছ ভাই একটু চিন্তা করে সিদ্ধান্ত জানালেন, ইয়েস। এরপর রাজি হলেন আরেফিন সিদ্দিক স্যার। ড. মুহাম্মদ সামাদ, রাজি হলেন শামসুজ্জামান খান। আবৃত্তিজন কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী রাজি হলে আমাদের নিত্যসঙ্গী আবৃত্তিজন শাহাদাত হোসেন নিপু, কবি আবদুল হক চাষী, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এডভোকেট কামাল হোসেন পাটওয়ারীসহ আরো না জানা ৩/৪ জন পথচারী।

সিদ্ধান্ত হলো আমার গাড়িতে করে আমি ফুল নিয়ে আসবো। যথাসময়ে সবাই একত্রিত হলাম। সব মিলিয়ে ১৩/১৪ জন। আমরা প্রথমেই জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করলাম। দোয়া পাঠ করলাম। তারপর সবাই মানববন্ধনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলাম বেশ ক'জন সাংবাদিক, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার লোক! আমাদের ছবি- তুলতে শুরু করলো। ক্যামেরাবন্দি সবাই। মনে হলো ওরা লুকিয়ে ছিলো কোথাও। তবু নির্ভীক আমরা। বক্তৃতাও হলো। নেত্রীর মুক্তি দাবি হলো। তারপর দূরে দেখা গেলো জরুরি অবস্থার জরুরি বাহিনী ধেয়ে আসছে। আমরা ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে একেকজন একেক পথে কেটে পড়লাম। কেউ ব্রিজ দিয়ে, কেউ বায়ের রাস্তা কেউবা ডানের রাস্তা দিয়ে কেটে পড়লাম।

পরে শুনলাম বত্রিশে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের পুলিশ, প্রহরীদের অনেক মারধর করেছে জরুরি বাহিনীর লোক। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দুপুরের মধ্যেই প্রচার হয়ে গেল। পরদিন সংবাদপত্রেও মানববন্ধনের ছবি ছাপা হলো। পরে জেনেছি আমরা কবি, লেখক বলেই আমাদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সেটা নাকি উপরের নির্দেশ ছিল।

নির্দেশ ছিল কবিদের বিরুদ্ধে না যাওয়ার । হয়তো-তাদের জানা ছিল ১৯৮৭ এর আন্দোলন ১৯৮৮ এর ঘটনা তথা কবিতা পরিষদের জন্ম ইতিহাস। তথা কবি চরিত্রও তাদের জানা ছিল।

সব কবি মরে যায়, কবিতা মরে না।

কবি মরেও বেঁচে থাকে তাঁর অমর কাব্য কলায়। গণজাগরণের কবি বেঁচে থাকে জনতার বুকের গভীরে, নন্দিত হয় কবিতা প্রেমীদের হৃদয়ে হৃদয়ে। কবিরা জাতির বিনে মাইনের রাষ্ট্রদূত, শান্তিরবার্তা বহতা নদীর মতো বয়ে চলে নিরবধি। ন্যায়াধীন কবি চলে সকল অচলায়তন ভেঙ্গে, হোকনা তা যতই দুর্ভেদ্য, যত না বন্ধুর।

যখন বিক্ষুব্ধ হয় কবি- তাঁর কলম তখন দুঃশাসকের কপালে কালি ক্রস দিয়ে ভেটো দিতে জানে।

কবি হতে পারে বিদ্রোহী নির্ভীক যোদ্ধা, মুক্তি সচেহতন কবি, হয়না অন্ধ কিংবা বধির।

কবি কে চেনে না? কে চেনে না কবিকে? সৌহার্দ্যে কবিসত্তা কোন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে, মানে না কখনোই সান্ধ্য আইন, মানে না রক্ষী, কাঁটাতারের ব্যারিকেড। মানে না কোন মার্শাল বিধি-কোনো

রেড সিগন্যাল। কবি করে না তোয়াক্কা কোন রক্ত চক্ষুধারী স্বৈর প্রেতাত্মাকে। কবি মহাত্মা, প্রদীপ্ত সর্বদা তুচ্ছ করে মৃত্যুভয়। অমরত্বের সুধা নাকি কবিকেও করিয়েছে পান। ঐ জীবনমরণদানকারী স্বর্গ নরকের রূপকার! আর তাইতো কবির ললাটেও বুঝি রাজটিকার মতোই লেখা সব কবি মরে যাবে, কবির কবিতা অমর কবি মরেও বেঁচে থাকে তাঁর অমর কাব্যকলায়।

ইমদাদুল হক মিলন

তিনবিঘা করিডর : খুলে গেল স্বপ্নের দরজা

এক

দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতা থেকে পাটগ্রামে বাজার করতে গেছেন একজন ছাপোষা মানুষ। সকাল সকাল হেঁটে রওনা দিয়েছেন তিনি, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। ৬টা বেজে গেছে। তিনবিঘা করিডর ততক্ষণে বন্ধ। মানুষটি নিরূপায় হয়ে গেছেন। তাঁর ফেরার পথ নেই। সারা রাত পাটগ্রামের কোনো গাছতলায় বসে থেকেছেন কিংবা আশ্রয় নিয়েছেন কোনো পরিচিতজনের দরিদ্র কুটিরে। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে পাটগ্রাম থেকে দহগ্রাম আঙ্গুরপোতায় আসা কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে।

তখন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খুলে দেওয়া হতো করিডর। দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতা ছিটমহলের মানুষজন ওই সময়ের মধ্যে পাটগ্রামে যাতায়াত করতেন, পাটগ্রামের মানুষজন যাতায়ত করতেন দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায়। আরও আগে করিডর এক ঘন্টা খোলা, এক ঘন্টা বন্ধ। তাও শুধু দিনের বেলা। অদ্ভুত পরিস্থিতি।

স্থানীয় এক যুবক আমাকে বললেন, এমন অবস্থাও দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতার মানুষের জীবনে ঘটেছে, সন্ধ্যার পর প্রসব বেদনা উঠেছে কারো, হাসপাতালে নেওয়া জরুরি। নেওয়া যায়নি। অসুস্থ হয়েছেন কেউ, করিডর অতিক্রম করে হাসপাতলে নেওয়া যায়নি। মানুষ মারা গেছেন, তাঁর কাফনের কাপড় আনতে যাওয়া যায়নি, করিডর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। কলাপাতায় জড়িয়ে মানুষ দাফন করা হয়েছে।

এ রকম কত দুঃখ-বেদনার কথা ওই অঞ্চলের মানুষের মুখে। ৬৪ বছর ধরে চলে আসছিল এ অবস্থা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে ২৪ ঘন্টার জন্য কখনো করিডর খুলে দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ১৭৮ মিটার দৈঘ্য ৮৫ মিটারপ্রস্থ তিনবিঘা করিডরের বিনিময়ে ৭.৩৯ কিলোমিটারের দক্ষিণ বেরুবাড়ি ছিটমহল ভারতকে ছেড়ে দেওয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সেই

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। ভারত বেরুবাড়ি পেল ঠিকই তিনবিঘা করিডর পেল না বাংলাদেশ।

আগের মতোই চলতে লাগল দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাবাসীর জীবন। '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত না হলে নিশ্চয় সেই সময়েই মিটে যেত এ সমস্যা। তারপর ৩৬ বছর কেটে গেছে। রাজনীতির কতরকম উত্থান-পতন দেখেছি আমরা। কত সরকার এল গেল। তিনবিঘা করিডরের সমস্যা কেউ সমাধান করল না। '৯৫ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলে। তখন তিনি একবার দহগ্রাম আঙ্গরপোতায় গিয়েছিলেন। ওই অঞ্চলের মানুষকে কথা দিয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় এলে তিনবিঘা করিডর ২৪ ঘন্টার জন্য খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন তিনি।

এবার তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করলেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ অক্টোবর দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় এলেন। ২৪ ঘন্টার জন্য খুলে দিলেন তিনবিঘা করিডর। কিছুদিন আগে ভারতীয় প্রধামন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বাংলাদেশে এসেছিলেন। অতি গুরুত্বপূর্ণ তিস্তার পানিবন্টন চুক্তির কথা থাকলেও সেই চুক্তি হয়নি। তবে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় সমস্যা তিনবিঘা করিডর ২৪ ঘন্টার জন্য খুলে দেওয়ার কাজটি হয়েছে। মিটে গেছে ৬৪ বছর ধরে ঝুলে থাকা একটি সমস্যা। এই উদ্যোগ ও অর্জনের কৃতিত্ব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর। দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় মানুষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অন্যভাবে। তাঁরা বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই আমাদের। আমরা তাঁকে শুধু আমাদের ভালোবাসাটুকু দিতে চাই, আমাদের কৃতজ্ঞতাটা জানাতে চাই। কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার ১৪ হাজার ৬৬০ জন মানুষের একজনও আমরা ঘরে থাকব না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আমরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসব। তাঁর সামনে এসে দাঁড়াব। এই আমাদের কৃতজ্ঞতা, এই আমাদের ভালোবাসার প্রকাশ। হলোও তাই।

১৯ অক্টোবর বুধবার, সকাল ১১টা বাজতে ৫মিনিট বাকি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার থেকে নামলেন দহগ্রাম ইউনিয়ন কাউন্সিল চত্বরে। চারদিক উজ্জ্বল করা রোদ। সেই রোদের ঔজ্জ্বল্য আরো বেড়ে গেছে ওই অঞ্চলের মানুষের মুখের আলোয়। যেদিকে চোখ যায় শুধু মানুষ। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর। তাদের পোশাক-আশাকের রঙে ঝলমল করছে

দহগ্রাম ইউনিয়ন। পোস্টার আর ব্যানারে ছেয়ে গেছে পুরো অঞ্চল। তিনি উদ্বোধন করলেন দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন কার্যক্রম, ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ও নবনির্মিত দহগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন। দহগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তারপর ছিটমহলবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় হওয়ার কথা। সেই মতবিনিময় সভা হয়ে উঠল বিশাল এক জনসভা।

তারপর তিনবিঘা করিডরের দিকে রওনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেদিন মন্ত্রিপরিষদের অনেকেই ছিলেন, ছিলেন উপদেষ্টাদের কেউ কেউ। সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার এবং কালের কণ্ঠের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে আমি।

আমার জন্য এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। দগগ্রাম-আঙ্গরপোতা এবং তিনবিঘা করিডরের কথা কাগজে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে জায়গাটি দেখা হলো। এ এক বিরল অভিজ্ঞতা। করিডরের তিনবিঘা জায়গা শক্ত তারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সড়ক। ওপারের পাটগ্রাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে ভারতের দুজন মন্ত্রী, বিএসএফের প্রধান, ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তিনবিঘার মাঝামাঝি একটি টিলা কেটে তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। দক্ষিণ দিকের টিলার ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হলো। উত্তর দিকের টিলায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় মিডিয়াকর্মীরা অবিরাম ছবি তুলছিলেন। বাংলাদেশ ও ভারতের পতাকায় চমৎকার করে সাজানো হয়েছে তিনবিঘা করিডর। ভারতীয় কিছু স্কুল ছাত্রছাত্রী সাদা পোশাকে পরে দুই দেশের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার ধারে, হাসিমুখে সংবর্ধনা জানাচ্ছিল আমাদের। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এত কাছ থেকে দেখা তাদের জন্য এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

বিকেলের মুখে মুখে পাটগ্রাম কলেজ মাঠে জনসভা। মাঠটি মাঝারি মাপের । কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে। যত না মানুষ মাঠে, তার কয়েক গুণ বেশি বাইরে, চারদিকে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ওই অঞ্চলের মানুষের প্রতিটি দাবি-দাওয়া পূরণের আশ্বাস দিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানুষ শুনল তাঁর কথা।

শেষ বিকেলে পাটগ্রাম থেকেই হেলিকপ্টারে চড়েছি আমরা। এ ধরনের ভ্রমণ আমার জন্য প্রথম। সারওয়ার ভাই আগেও বহুবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন। তিনি অনেকটাই অভ্যস্থ। অভ্যস্থ না হলে নানা ধরনের অসুবিধা হওয়ার কথা। আমার ক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটেনি। কারণ আমাকে সারাক্ষণই ছায়ার মতো আগলে রাখছিলেন মাহবুবুল হক শাকিল। তিনি আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) প্রধান নির্বাহী। প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদও আমাদের ভালোই খোঁজখবর রেখেছেন। লেখক-সাংবাদিকদের ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ দূর্বলতা আছে। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রীয় কাজে নিউ ইয়র্কে গিয়ে তিনি হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে গিয়েছিলেন তাঁর বাসায়। লেখককে তিনি ১০ হাজার ডলারও দিয়েছেন আর জানিয়েছেন সহানুভূতির কথা। বেশ কয়েক বছর আগে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মারা গেলেন। শেখ হাসিনা তখনো প্রধানমন্ত্রী। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মুত্যুর কথা শুনে তিনি সব কাজ ফেলে ছুটে গেলেন তাঁর বাড়িতে। গত বছর একুশে বইমেলার উদ্বোধনী দিনে ভারতের বিখ্যাত লেখক মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মঞ্চে ডেকে নিজের পাশে বসালেন। দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা থেকে ফেরার সময় সৈয়দপুর এয়ারপোর্টে সেনাবাহিনীর বিমানে আমরা সবাই চড়েছি। সবার শেষে প্লেনে চড়লেন তিনি। চড়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'সারওয়ার ভাই উঠেছেন? মিলন, উঠেছে।'

তিনবিঘা করিডর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর অনুভূতি জানতে চেয়েছিলাম। হাসিমুখে বললেন, 'আমি একটা কাজ শেষ করতে পেরেছি, এই আমার আনন্দ। আর আমি যেখানেই যাই, গিয়ে প্রথমে সেখানকার চালের দামটা জানার চেষ্টা করি। এ এলাকার এখন ২০ থেকে ২৪ টাকা কেজি চাল। মঙ্গা এলাকায় মঙ্গা নেই, এও আমার এক প্রশান্তি।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশের মানুষের জন্য আপনার ভালোবাসা আর মমত্ববোধ বারবারই আমাদের মনে করিয়ে দেয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। আমরা আপনার কাছে সেই নেতৃত্বই চাই, যে নেতৃত্ব বাংলাদেশকে স্বপ্নের বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবে। পরম করুণাময় আপনাকে সেই শক্তি দান করুন।

দুই

বঙ্গবন্ধুকন্যার প্রতি ভালোবাসা

বঙ্গবন্ধু কাদের জন্য রাজনীতি করতেন! কাদের কথা ভাবতেন, কাদের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা ভাগ করে নিতেন! কাদের জন্য এক স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন! কাদের জন্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সোনার বাংলা। কাদের জন্য পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে তিনি রবীন্দ্রনাথের উক্তি ধরে বলেছিলেন, 'আমার বাঙালি মানুষ হয়েছে'।

বঙ্গবন্ধুর বাঙালিরা এই মহান নেতাকে কীরকম ভালোবাসতেন, ভালোবাসেন, তা নিয়ে অনেক ঘটনা আছে, অনেক গল্পকথা আছে মানুষের মুখে মুখে। আমি এক ভাগচাষির কথা লিখেছিলাম, 'নেতা যে রাতে নিহত হলেন' গল্পে। সেই চাষির নাম রতন মাঝি। অন্যের জমি ভাগে চাষ করে অতিদরিদ্র মানুষটি তার সংসার চালাত। বঙ্গবন্ধুকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসত সে। বাড়ির সামনে একটুখানি নিজস্ব জমিতে কালিজিরা ধান বুনেছিল রতন। সেই ধানে অসাধারণ চিড়া হয়। রতন মাঝির স্বপ্ন এই চিড়া সে তার প্রিয় নেতার জন্য নিয়ে যাবে। নেতার পায়ের সামনে চিড়ার পোঁটলা রেখে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করবে। নিজের ভালোবাসাটুকু জানাবে। যেদিন সে পদ্মার ওপারকার এক গ্রাম থেকে চিড়ার পোঁটলা বুকে নিয়ে ঢাকায় আসে, নেতার বাড়ির সামনে যায়, পুলিশ তাকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। সারারাত থানাহাজতে আটকে রাখে। সেই রাতে নেতা সপরিবারে নিহত হন। সকালবেলা দুঃখী পুলিশ অফিসারটি যখন তাকে ছেড়ে দিচ্ছে, রতন মাঝি বলল, 'আমাকে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না সাহেব। আমাকে হাজতেই রাখুন। ছেড়ে দিলে নেতা হত্যার প্রতিশোধ নেবো আমি'। প্রতীকী অর্থে লেখা গল্প। কিন্তু এরকম চরিত্র আমি দেখেছি, এরকম অনেক সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে যাঁরা বঙ্গবন্ধুর জন্য এখনো চোখের জল ফেলেন।

আমি এক মায়ের কথা জানি, বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা শুনে তিনি বুক চাপড়ে বিলাপ করে কেঁদেছিলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারের কথা বলতেন তিনি আর হাহাকার করতেন । কবে বিচার হবে খুনিদের?

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের আগেই সেই মা মারা যান।

এক বৃদ্ধ পিতার কথা জানি, তিনি বলতেন, যাঁর জন্য বাংলাদেশ তাঁকেই তোরা মারলি?

আমাদের তথাকথিত বড় মানুষরা, নানা স্তরের নেতারা বঙ্গবন্ধুকে কতটা ভালোবাসতেন কিংবা ভালোবাসেন বলতে পারব না, তবে সাধারণ মানুষ, দেশগ্রামের খেটে খাওয়া কৃষক শ্রমিক মাঝি কামার কুমার, রিকশাঅলা দিনমজুর, বঙ্গবন্ধু ছিলেন এইসব মানুষের নয়নের মণি। জান দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে তাঁরা ভালোবেসেছেন। এইসব সাধারণ মানুষের ভালোবাসার কথা সেভাবে লেখা হয় না, জানতে পারি না আমরা। তাই হঠাৎ ওরকম কোনো ঘটনা জানলে আবেগ ধরে রাখতে পারি না।

এরকম এক ঘটনার নায়ক হাসমত আলী। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার প্রতি তাঁর ভালোবাসা জাতিকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছে। আমি আজ সেই মানুষটির কথা বলতে চাই।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে হতদরিদ্র মা-ছেলে ঝগড়া করছে। মায়ের মুখ হাত ভর্তি শ্বেতী, ছেলে রোগা অসহায় ধরনের। মায়ের ওপর খুবই রেগেছে সে। চিৎকার করে বলছে, নিজের পোলার নামে জমি না রাইখা তোমার স্বামী শেখ হাসিনার নামে জমি কিন্না দিছে! আমি তোমারে ভাত দিমু ক্যান?

শ্যামলী ২ নাম্বার রোডের মাথায় কাজী অফিসের সামনে চলছে সেই ঝগড়া। দিনটি ২০১০ সালের ৪ এপ্রিল। ছেলের কথা শুনে মা বললেন, তোর বাপ বঙ্গবন্ধুরে জান দিয়া ভালোবাসত। বঙ্গবন্ধুরে মাইরা ফালানোর পর শেখ হাসিনা এতিম হইয়া গেছে। এজন্যই শেখ হাসিনার নামে জমি কিন্না দিছে। মানুষ যারে ভালোবাসে তার জন্য এইটা করতেই পারে।

এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন কালের কণ্ঠের প্রতিবেদক হায়দার আলী। শেখ হাসিনার নামে জমি ইত্যাদি শুনে তিনি দাঁড়িয়েছেন। মা ছেলের সঙ্গে কথা বলেছে। মায়ের নাম রমিজা খাতুন। আগারগাঁওয়ের বস্তি তে থাকেন, বেঁচে আছেন ভিক্ষে করে। ছেলের নাম আবদুল কাদের। কথায় কথায় ঘটনা উদঘাটন করেন হায়দার আলী। বৃদ্ধ রজিমা খাতুন গফরগাঁওয়ের মৃত হাসমত আলীর স্ত্রী। হাসমত আলী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অন্ধভক্ত। জান দিয়ে ভালোবাসতেন তাঁকে। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন হাসমত আলী। রিকশাভ্যান

চালিয়ে সংসার চালাতেন আর তিলে তিলে পয়সা জমাতেন। নামাজ পড়ে বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফিরাত কামনা করতেন আর শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করতেন। স্ত্রীকে বলতেন, 'শেখ হাসিনা আমার মেয়ে। মেয়েটা এখন এতিম। মেয়ের জন্য আমার কিছু করা উচিত।

সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে সেই মহান পিতা তারপর ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার রাওনা ইউনিয়নের খারুয়া বড়াইল গ্রামে ২৪ হাজার টাকায় শেখ হাসিনার নামে পৌনে সাত শতাংশ জমি কেনেন। ২০০৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঘটনা। পরের বছর যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন হাসমত আলী। সংসারের অনটন, চিকিৎসার পয়সা নেই। তবু সেই জমি তিনি বিক্রি করেন না। ধুঁকে ধুঁকে মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁর সেই জমি বেদখল হয়ে যায়। কালের কণ্ঠের প্রতিবেদক হায়দার আলী খুঁজে খুঁজে সব তথ্য বের করেন। তারপর এক প্রতিবেদন লেখেন কালের কণ্ঠ। বিরল ভালোবাসা নামের সেই প্রতিবেদন ছাপা হয় কালের কণ্ঠের প্রথম পাতায়। ২ জুন ২০১০ সালে প্রকাশিত সেই প্রতিবেদন ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু এবং শেখ হাসিনার প্রতি এরকম মমত্ববোধের ঘটনা দেশের মানুষকে আপ্লুত করে। সেদিনই পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী-২ সেলিমা খাতুন কালের কণ্ঠের প্রতিবেদক হায়দার আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করে রমিজার খোঁজখবর নেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আগারগাঁওয়ের বস্তিতে রমিজাকে খুঁজতে যায় পুলিশ। রজিমা খাতুন তখন ধানমণ্ডি লেকের ধারে ভিক্ষা করছেন। বিকেলে বস্তিতে ফিরে ঘটনা জানতে পারেন রমিজা। সেদিনই তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। চর্মরোগ বিভাগে ভর্তি করা হয়। পরিদন সকাল ১১টায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশমতো কালের কণ্ঠের প্রতিবেদক হায়দার আলী রমিজা খাতুনকে নিয়ে প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ে যান। সেখানে পরম মমতায় রমিজাকে জাড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলেন শেখ হাসিনা। রমিজা খাতুন শেখ হাসিনার হাতে তাঁর নামে কেনে জমির দলিল তুলে দেন।

তারপর প্রকৃত কন্যার যা যা দায়িত্ব তার সবই পালন করেন শেখ হাসিনা। তাঁর নামের সেই বেদখল হওয়া জমি উদ্ধার করে হাসমত আলীর কবর পাকা করার নির্দেশ দেন, রজিমা খাতুনের জন্য বাড়ি তৈরির নির্দেশ

দেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন থেকে রমিজা খাতুনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানান। আর এরকম একটি প্রতিবেদনের জন্য কালের কাণ্ঠের প্রতিবেদন হায়দার আলীকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, সেই জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয় রমিজা খাতুনকে। বাড়ি তৈরি হলো, আনুষ্ঠানিকভাবে সেই বাড়ি শেখ হাসিনা নিজে গিয়ে দেখলেন।

শোবার ঘর, রান্নাঘর, কলতলা এবং বাড়ির গাছপালা, সবই দেখলেন। রজিমা খাতুনের ছেলেকে চাকুরির ব্যবস্থা করে দেবেন, রমিজা খাতুনকে গরু কিনে দেবেন, মুরগির খামার করে দেবেন, অন্যান্য সহায়তা যা যা লাগে সবই দেবেন।

এই ধরনের ঘটনা জাতিকে আপ্লুত করে, সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের ভালোবাসা ভালোবাসেই তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। ভালোবাসার বিনিময়ে ভালোবাসা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, হাসমত আলী যেমন ভালোবাসার এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, আপনিও সেই রকমই উদাহরণ সৃষ্টি করলেন। এই ধরনের উদাহরণ মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

আপনার মঙ্গল হোক।

এম. নজরুল ইসলাম

শারদদিনের প্রণতি

তাঁকে চেনে বাংলার শ্যামল প্রকৃতি। বাংলার মানুষ চেনে তাঁকে। বাঙালির আবেগের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ। বাঙালির অতি আপনজন তিনি। প্রথম দেখাতেই তিনি জয় করে নিয়েছিলেন এদেশের মানুষের মন। সেই থেকে দেশের মানুষের আস্থা ও অস্তিত্বে তাঁর স্থায়ী আসন পাতা। সব সংকটে মানুষ তাঁকে কাছে পায়। পরম মমতায় তিনি ছুটে যান মানুষের কাছে। মানুষের আস্থার জায়গা যেমন তিনি, তেমনি তাঁর আস্থায় আছে কেবলই মানুষ। বাংলার খেটে খাওয়া মানুষকে তিনি বড়ো ভালোবাসেন। মানুষের দুঃখ, মানুষের কষ্ট তাঁকে ছুঁয়ে যায়। তাঁর চিন্তা ও চেতনার জগৎ জুড়ে কেবলই এই বাংলা ও এই মাটির মানুষ। এই দুখিনী বাংলার দুখ ঘোচাতে চেয়েছিলেন তাঁর পিতা। দেশের স্বাধীনতার স্থপতি তিনি। স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ডাকে দেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মুক্তিযুদ্ধে, তাঁরই নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। পাকিস্তানের কারাগারে কেটেছে তাঁর যুদ্ধের নয়টি মাস। পাকিস্তানী শাসকরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। পারেনি। কিন্তু এই স্বাধীন দেশে জীবন দিতে হয়েছে তাঁর পিতাকে। না, পিতা তো কেবল তাঁরই পিতা ছিলেন না। জাতির পিতা তিনি। হিমালয়সম ব্যক্তিত্ব ছিলো তাঁর। মহাসাগরের চেয়েও বড় ছিলো তাঁর হৃদয়। সেই বিশাল-হৃদয় পিতার কন্যা তিনি। নিজেকে উজাড় করে দিতে জানেন। মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে জানেন। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকেই জীবনের জয়গান গেয়ে মানুষকে প্রাণিত করতে পারেন। মানুষকে নিয়ে যেতে পারেন কল্যাণ ও অগ্রগতির পথে। তিনি তো এই মাটিরই সন্তান। এই যে দিগন্ত বিস্তারী আকাশ, এই আকাশকে তিনি ধরে রাখেন তাঁর চোখের তারায়। এই দেশের মাটি, পথের ধুলো মেখে তাঁর বেড়ে ওঠা। খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে তো তাঁর রক্তের বন্ধন। তবু এই বাংলা থেকে একপ্রকারের নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। দেশে বাবা-মা, ভাই সেনা অভ্যুত্থানে নিহত। তিনি তখন বিদেশ বিভূঁইয়ে, স্বামী ও সন্তান নিয়ে। একমাত্র ছোট বোনটিও তখন তাঁর সঙ্গে। বিদেশে ছিলেন বলেই সেদিন

ঘাতকের বুলেট তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু ঘাতক কি পিছু ছেড়েছে তাঁর?

ছিল, শঙ্কা সবসময়ই ছিলো। শঙ্কা থেকে তিনি যে মুক্ত, সে নিশ্চয়তা এখনও কি দেওয়া যায়? কিন্তু তারপরও তো নিরাপদ প্রবাসের জীবন বেছে নিতে পারেননি তিনি। ইচ্ছে করলে যে পারতেন না, তা নয়। পারতেন। কিন্তু প্রবাসের নিশ্চয়তা বেছে নিতে চাননি তিনি। দেশে তখন 'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া'। কাজেই তাঁর পক্ষে দেশ ও জাতির আহ্বান উপেক্ষা করা যে সম্ভব হয়নি। দেশ ও জাতির মুক্তির দূত হয়ে তিনি আবার ফিরে আসেন দেশে। স্বজনহারা, সর্বস্বহারা এক নারী ফিরে আসেন সেই মাটিতে, যে মাটিতে তাঁর ঠিকানা। সেই মাটির টানে তিনি ফিরে আসেন সামরিকতন্ত্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। জৈষ্ঠ্যের এক তাপদাহ দিনে জনমনে স্বস্তির বীজ বুনে দিয়ে তিনি পা রাখেন এই বাংলার মাটিতে। সেদিন ঢাকার রাজপথে মুক্তিকামী জনতার ঢল নেমেছিলো। সারা দেশের মানুষ ব্যকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলো সেই সময়টির, সে সময়ে তিনি পা রাখেন দেশের মাটিতে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিলো। ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টিতে প্রকৃতি বৈরি হয়ে উঠেছিলো। বৈরি রাজনৈতিক পরিবেশকে উপেক্ষা করে তিনি এলেন। মানুষের মনে ফিরে এলো স্বস্তি। মানুষের বুকের গহীনে উপ্ত হয়ে গেল একরাশ আশা। নতুন আশায় বুক বেঁধে মানুষ সেদিন বাড়িতে ফিরেছিলো হাসিমুখে। পরবাস থেকে ফিরে আসা এক অপরিচিতা নারী অল্প সময়ের ব্যবধানে হয়ে যান সবারই বোন, জন্ম সহদোরা।

পঁচাত্তরের মধ্য-আগস্ট থেকে একাশির মধ্য-মে। অর্ধযুগে মানুষের মুখে এমন প্রশান্তির স্মিত হাসি দেখা যায়নি। এভাবে মানুষ আশায় বুক বাঁধতে পারেনি আগের ছয়টি বছরে। সংকুচিত হতে হতে মানুষ নিজেদের প্রায় গুটিয়েই তো নিয়েছিলে। ধরেই নিয়েছিলো মুক্তি দিয়ে নেই এ জঙ্গলতন্ত্র থেকে। কিন্তু এক সর্বস্বহারা নারী তাঁর আগমনের ভেতর দিয়ে জনগণের মন থেকে সেই আশঙ্কা একবারে দূর করে দিলেন। বর্ষণসিক্ত বিকেলে মানুষের মনে থেকে স্বপ্ন ছড়িয়ে দিলেন তিনি। নিজের ব্যক্তিগত বেদনার ক্ষত আড়াল করে জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, দেশ ও জাতির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত তাঁর বাকি জীবনের বাকি দিনগুলো। পিতার যোগ্য কন্যা এটাও জানিয়ে দিলেন যে, ব্যক্তিগত কোনো চাওয়া-পাওয়া

আশায় নয়, দেশের মানুষের দৈন্য ঘোচাতেই এ মাটিতে আগমন তাঁর। পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করতে চান তিনি। বাবা-মা, ভাই-স্বজন হারিয়েছেন। কিন্তু সেই বর্ষণসিক্ত বিকেলে জানিয়ে দিলেন, স্বজনহারা নন তিনি। বাংলার মানুষই তাঁর প্রিয়জন, পরম স্বজন। সেইদিনই অঝোর বৃষ্টি আর অশ্রুতে নিজে ভিজে ও জনসমুদ্রে উপস্থিত জনতাকে ভিজিয়ে দিয়ে সবাইকে আপন করে নিলেন। নিজেও সবার আপন হয়ে গেলেন। এভাবে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার ক্ষমতা কজনের থাকে। তাঁর পিতার ছিলো। উত্তরাধিকার সূত্রে সেটাই তো পেয়েছেন তিনি। নিজেকে উজাড় করে দিতে পারেন। বিনিময়ে কিছুই চাননি কোনোদিন। কেবল চেয়েছেন বাংলার মানুষের মুক্তি। স্বৈরাচারের শাসন থেকে মুক্তি শুধু নয়, দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির ভিডিও নতুন করে রচনা করতে চেয়েছেন তিনি। সেই চাওয়া পূরণে এখনও কাজ করে যাচ্ছেন।

বলছি শেখ হাসিনার কথা। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী তিনি। সমরিকতন্ত্রের জাল থেকে গণতন্ত্রকে উদ্ধার করতে নিরলস কাজ করেছেন। তাঁকে নিয়েও ষড়যন্ত্র তো কম হয়নি। অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনা এগিয়ে গেছেন। 'সকল কাঁটা ধন্য করে' গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে গেছেন। তিনি তাই গণতন্ত্রের মানসকন্যা। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক নেত্রী। দুঃখিনি বাংলার প্রতীক যেন তিনি। তাঁকে দেখে দুঃখ ভুলে যায় বাংলার দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ।

আজ তাঁর জন্মদিন। এই শারদ দিনে তাঁকে প্রণতি জনাই। শুভ জন্মদিন।

কাজী রোজী

মনে কী পড়ে অভিন্ন বন্ধু আমার!

১৯৬৫ সাল।

গভঃ ইনটারমিডিয়েট গার্লস কলেজ এখন যার নাম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়। সেখানে সেদিন আমাদের প্রবল আধিপত্য ছিল। যে সকল নতুন ছাত্রী ভর্তি হতেন-মফস্বল থেকে তাদের জন্যে হোস্টেলের একটি সিটের ব্যবস্থা করার অভিপ্রায়ে আমরা সবসময় তৎপর থাকতাম। তুমি এই কলেজের ভিপি নির্বাচিত হওয়ার পর তোমার উচ্চারণ ছিল "ছাত্রী বন্ধুদের সার্বিক কল্যাণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।"

মনে কী পড়ে বন্ধু-কি জানি, হয়তো এখন মনেই পড়ে না, (২০১২ সালের এই দিনে) রাষ্ট্র, দেশ এবং জনগণের সেবায় নিয়োজিত, নিবেদিত আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসংখ্য ব্যস্ততার এবং দায়িত্ব কর্তব্যের মাঝে- সেদিনের কথা। অভিন্ন বন্ধু আমার, কলেজে পড়ার সময় ইস্কাটনে যাবার পরিকল্পনা করেছিলো কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের সহযোগে। কথা ছিল কক্সবাজার যাবার। কিন্তু তুমি বলেছিলে, 'তোমার পছন্দ কুষ্টিয়া শিলাইদহের কুঠিবাড়ি।' আমি কিন্তু সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম রবীন্দ্র বলয়ে তোমার পদচারণা ও বিশ্বস্ততা কতটা গভীর।

মনে পড়ে, কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার নির্মাণের ব্যাপারে অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে আমাদের নানাবিধ আলাপ আলোচনা করতে হয়েছিল। অবশেষে তোমার নেতৃত্বে আমরাই জয়ী হয়েছিলাম। আমরা প্রায় সবাই-ই অপ্রতিরোধ্য ও অদম্য শক্তি সাহসের সাথে সকল প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতাম।

মনে পড়ে, সভা-আন্দোলন আমরা ক্যাম্পাসের বাইরে করতাম। অনেক অনেক পোস্টার বাইরের ছাত্ররা দেয়ালের ওপাশের রাস্তা থেকে ছুঁড়ে দিতেন আমাদের। আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম-সেগুলো পাবার জন্যে।

'ক্যন্টনের মোহাম্মদ আলী বলতো-'আপারা আপনারা উঠেন। না হইলে ক্যান্টিন ধোয়াও যাইবো না-আমিও বাড়িতে যাইতে পারুম না।' মনে পড়ে বন্ধু, কথা না শেষ করেই আমরা উঠে যেতাম। ঘন্টা পড়ে গেলেও কলেজ চত্বরে বসে থাকতাম অনেক প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্যে।

এবারে একটু ব্যক্তিগত কথা মনে করিয়ে দিতে চাই ১৯৬৫ সালে কলেজে পড়ার সময় আমার কঠিন অসুখ পোলিও হয়েছিল। আমি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। মাসাধিককাল। আমাদের সতীর্থ বন্ধুরা কমবেশি সবাই আমাকে দেখতে যেতো-খোঁজ-খবর নিতে যেতো। তুমি যেতে প্রায় দিনই, হাতে নিয়ে একটি হরলিক্সের বোয়েম। বলতে 'তাড়াতাড়ি সুস্থ হও- শক্তি অর্জন করো রোজী-অনেক কাজ করতে হবে। আজো আমার কানে কথাগুলো বাজতে থাকে বন্ধু।

১৯৬৬ সালে কলেজের স্পোর্টস প্রোগ্রামের দু'দিন আগে আমার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। তুমি দু'দিন পরে আমাদের আরামবাগের বাসায়-আমার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমাকে কলেজে নিয়ে গিয়েছিলে। এসব ছোট ছোট স্মৃতি কী ভোলা যায়? ১৯৬৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরাই উত্তাল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতাম। অনেক অনেক বছর পরে আমি ১৯৯৪ সালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হই। তখন সরকারের তথ্য অধিদপ্তরে চাকরীরত ছিলাম। তুমি আমার খোঁজ-খবর নিয়ে বলেছিলে-'এতটুকুও অবহেলা করবে না। বাইরে যেতে হয়, আমায় জানাবে-আমি ব্যবস্থা করে দেব। তোমার সহযোগিতার হাত আমি সব সময়ই পেয়েছি। সব ক্ষেত্রে।

তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী আজ গণতন্ত্রের মানস কন্যা, দেশবরেণ্য জননেত্রী। আমি তোমার জন্যে সারাক্ষণ মঙ্গল বর্তিকা জ্বালিয়ে রাখি। সুখ-দুঃখের পালাক্রমে হাজার ঘটনাবহুল স্মৃতির সাথে তোমাকে আমি জ্বাড়িয়ে রাখি গ্রেনেড বিস্ফোরণ তোমার শ্রবণশক্তি কমিয়ে দিলেও জীবনশক্তি এতটুকু কমাতে পারেনি। 'তুমি দীর্ঘজীবী হও নেত্রী-বন্ধু' এবং সামান্য একটু অবসরে মনে কী পড়ে-এই প্রশ্নই রেখে গেলাম তোমার জন্যে।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

আদরের কন্যা থেকে জননেত্রী

পারিবারিক জীবনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। বাঙালি কৃষ্টিতে গড়ে ওঠা পরিবারটিতে বন্ধন ছিল সংহত । বাবা-মার প্রথম সন্তান শেখ হাসিনা গড়ে উঠেছিলেন একাধারে আদুরে কন্যা এবং দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে। বাবা একযুগের বেশি জেলেই কাটিয়েছেন। সংগঠনের কাজে সারাদেশ চষে বেড়িয়েছেন। সংসার দেখাশোনায় মায়ের সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন শেখ হাসিনা। দলের কর্মীবাহিনীও সম্প্রসারিত পরিবারে ঠাঁই করে নিয়েছিল। আজ পনেরো কোটি মানুষের বাগ্যোন্নয়নের যে বিরাট দায়িত্ব তিনি বহন করছেন, তার প্রথম পাঠ বুঝি কৈশোরের পরিবেশ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

সাংসারিক জীবনে স্বামী পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ রাজনীতিসচেতন ছিলেন, কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ফজলুল হক হলের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন ষাটের দশকের প্রথম দিকে। ছাত্রলীগ থেকে তার মনোনয়ন ছিল মেধাবী ছাত্র হিসেবে। রাজনৈতিক অ্যাকটিভিজম তার মধ্যে কম থাকলেও তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী, উদার , বিজ্ঞানমনস্ক এবং অধিকার-সচেতন।

একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন। শেখ হাসিনা মায়ের সঙ্গে বন্দি জীবনযাপন করতে থাকলেন।

দেশ স্বাধীন হলো। বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে। শেখ হাসিনা সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ঘর-সংসার করেছেন। এতে মনে হয় রাজনীতিতে প্রবেশের ইচ্ছাও সম্ভবত তার ছিল না।

১৯৭৫ সালের মধ্য আগস্টে মোশতাক-জিয়ার ছত্রছায়ায় কয়েকজন বর্বর নরপশু নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। শুধু বঙ্গবন্ধুকেই নয়, তাঁর পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি শিশুপুত্র রাসেলকেও রেহাই দেয়নি। এমনি কঠিন দুঃসময়ে শেখ হাসিনা বেঁচে গেলেন বিদেশে থাকার কারণে। আওয়ামী লীগের প্রথম কাতারের নেতাদের হত্যার পর সামরিক জান্তা'পোষ

মানা' আওয়ামী লীগ বানাতে চেয়েছিল। কে পারবে সে সংকট থেকে আওয়ামী লীগকে রক্ষা করতে? এমন এক সময়ে যিনি সুদিনে রাজীতিতে আসেননি, যিনি পিতার হাত ধরে দলে অভিষিক্ত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগগ্রহণ করেননি, তিনিই রাজনীতির কারবালা প্রান্তরে এগিয়ে এলেন। দলের প্রবীণদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন, রাজনীতিতে নবাগত, বয়সে তরুণ এবং অনভিজ্ঞ শেখ হাসিনা তাদের কথামতো চলবেন। তারা হিসাবে ভুল করেছিলেন। শেখ হাসিনা ধীরে ধীরে কর্মীবাহিনীর আস্তা অর্জন করলেন। জনতার হৃদয় জয় করলেন। বঙ্গবন্ধুর আদরের কন্যা হয়ে উঠলেন জননেত্রী।

বঙ্গবন্ধু যেমন সারাজীবন কঠিন উজান ঠেলেছেন, শেখ হাসিনাকেও তেমনি উজান ঠেলে একটু একটু করে অগ্রসর হতে হয়েছে এবং হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আরও কঠিন সময় অপেক্ষা করছিল শেখ হাসিনার জন্য। কোটালীপাড়ায় তার জনসভায় পুঁতে রাখা হলো বিশাল আকৃতির বোমা। কুষ্টিয়ায় বোমা হামলা হলো। সারা দেশে যেন বোমার খই ফুটতে লাগল। টার্গেট প্রগতিশীল শক্তি। টার্গেট হাসিনা।

নতুন শতকের প্রথমদিকে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তি জামায়াতকে নিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় এলো। দেশে যেন কেয়ামত নেমে এলো। একদিনে ৬৩ জেলায় সিরিজ বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। সজ্জন অর্থমন্ত্রী শাহ কিবরিয়া বোমার আঘাতে প্রাণ হারালেন। ব্রিটিশ হাইকমিশনার অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন। জেলায় জেলায় জজ সাহেবরা বোমাতঙ্কে ভুগতে লাগলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর রক্তবীজ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগ এ যেন অসহ্য! দলটির ওপর দ্বিতীয়বারের মতো মরণ আঘাত হানল সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রকারীরা। এবার আর বোমা নয়। রণাঙ্গনে ব্যবহৃত গ্রেনেড! আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে গ্রেনেডের বৃষ্টি ঝরল। গ্রেনেডের বিকট শব্দে শেখ হাসিনার শ্রবনেন্দ্রিয় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রাণে বেঁচে গেলেন তিনি। আবারও প্রামাণ হলো, রাখে আল্লাহ মারে কে? শেখ হাসিনা বিপদের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন। বিপদ মাথায় করেই পথ চলছে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে তিনি হয়তো কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠবেন, 'কঠিনেরে ভালবাসিলাম'।

পিতার সঙ্গে কন্যার অমিল হয়তো রয়েছে। শেখ হাসিনা বজ্রকণ্ঠের অধিকারী নন। বঙ্গবন্ধুর অতুলনীয় সাংগঠনিক সক্ষমতাও তার নেই। জাদুর পরশে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার বিরল ক্ষমতাও তার নেই। তবু বঙ্গবন্ধুর কিছু দুর্লভ বৈশিষ্ট্য শেখ হাসিনার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। শেখ হাসিনা পিতার মতো অসীম দুর্বিনীত সাহসী। বোমা, গ্রেনেড আর মৃত্যুর অট্টহাসির মুখে শেখ হাসিনার ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং শান্ত সৌম্য চাহনি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁর অনাবিল দেশপ্রেম এবং মানুষের প্রতি অবিচল আস্তার মাঝে ফুটে ওঠে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি। তাই শেখ হাসিনা হয়ে উঠেছেন জননেত্রী, গণমানুষের নেতা। যিনি সহজ সময়ে রাজনীতিতে এলেন না, এলেন কঠিনতম মুহূর্তে। তাঁর সবচেয়ে অর্জন কোনটি? নির্মোহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হবে, তিনি নির্মম আঘাতের সমুচিত জবাব দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যাঘাত করেননি। রাজনীতিতে প্রবেশের পর ক্ষমতারোহণ করতে সময় লেগেছে অনেক। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় পিতৃহত্যার বিষয়টি জটিল ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি সহজ পন্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। সভ্যজগতের হাতিয়ার বিচার প্রক্রিয়াতেই তিনি বিশ্বাস রেখেছেন। অসভ্য ঘাতকপক্ষ কতখানি হিংসাপ্রবণ এবং আঘাতকামী ছিল, তা বোঝা যায় বিচার প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব পালনকারীদের ওপর আঘাত হানার ঘটনা অবলোকন করে। মামলার সাক্ষীদের হেনস্তা করা হয়েছে। এমনকি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার প্রথম রায় প্রদানকারী জেলা জজ গোলাম রসুলের জীবনকে বিষাক্ত করে তোলা হয়েছিল। ক্রমাগত এবং ভয়াবহ মাত্রায় ভীতি প্রদর্শনের ফলে তার দুই কন্যা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। শেখ হাসিনা পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো না। বিএনপি আমলে বিচার প্রক্রিয়া ঝুলে রইল। তার আবার ক্ষমতায় আসার পর রায়ের আংশিক বাস্ত বায়ন সম্ভব হলো। লক্ষ্যে অবিচল, অর্জনে অসীম ধৈর্য। ২১ আগস্ট এত মানুষ হত্যা, কিবরিয়া হত্যা এবং হিংসার লেলিহান শিখায় শান্তিকামী মানুষের আত্মাহুতি। আওয়ামী লীগ তথা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ কি পারত না বিপক্ষ শক্তির কিছু লোককে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে? শেখ হাসিনা হত্যা দিয়ে হত্যার প্রতিশোধ নেননি। কারণ সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস দমন করা যায়

না। শেখ হাসিনা সভ্য জগতের কঠিন প্রক্রিয়াতেই এগোলেন। 'জজ মিয়া' নাটকের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বিচারের পথেই অগ্রসর হলেন।

শেখ হাসিনার সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য সম্ভবত বেয়নেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সংবিধানে পুনঃযোজন। মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু, তাঁর স্বজন-সহকর্মীসহ শত শত মানুষকে হত্যা করে এবং দেশে সন্ত্রাসের বিভীষকা ছড়িয়ে দিয়ে। অথচ মূলনীতি পুনরুদ্ধার করা হলো সম্পূর্ণ করা হলো সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়ায়। ভীতির বিভীষিকা সৃষ্টি করে নয়। সভ্য আইনি প্রক্রিয়ায় চার মূলনীতি সংবিধানে সংযোজন কর্মে কর্তব্যরত অনেক দেশপ্রেমিক সুধীজনের বিরাট অবদান রয়েছে। এ অবদান হিংসার বিরুদ্ধে যুক্তির অবদান । সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তির অবদান। পশুত্বের বিরুদ্ধে মানবতার অবদান। পশ্চাদগামিতার বিরুদ্ধে প্রগতির অবদান। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সভ্যতা বিনির্মাণে অবদান রাখা অনেক মানুষের বিরাট মিছিলে সাহসী রাজনৈতিক নেতৃত্বে রয়েছেন শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনার সাহসিকতা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। এটি একটি অসাধ্য সাধন। তিনি হত্যার প্রতিশোধ নেননি। বরং জঘন্য অপরাধের বিচার করেছেন। এটি আইনের দাবি।

শেখ হাসিনার আরেকটি সাহসিকাতার সিদ্ধান্ত ছিল পদ্মা সেতু নির্মাণ। বিশ্বব্যাংকের প্রতারণার পর, তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে হাত দিলেন সেতু নির্মাণে। সেতু এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জাতি আত্মনির্ভরতার অহংকারে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতির উপযুক্ত নেত্রী শেখ হাসিনা।

সবশেষে জীবন সায়াহ্নে শেরেবাংলার একটি উপলব্ধি স্মরণ করছি। তিনি বলেছিলেন, 'জীবন সংগ্রামে বিপর্যয় এবং সাফল্যসমূহের বিশ্লেষণ যখন করি, তখন উপলব্ধি করি নিয়তিই আমাকে পরিচালিত করেছে।'

গোলাম কুদ্দুছ

অন্তবর্তী সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাব

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কোন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে-এ নিয়ে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ দ্বিধাবিভক্ত। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা এবং সাধারণ মানুষও এ আলোচনায় নিত্য অংশগ্রহণ করছে এবং চায়ের টেবিলে, বৈকালিক আড্ডায়ও এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট বলছে, মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা এবং জাতীয় সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অন্তবর্তী সরকারের অধীনে হবে। অপরদিকে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোটে বলছে, তারা কোন অবস্থাতেই 'অন্তবর্তী সরকার' মেনে নেবে না এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের-অধীনেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। এ দাবিতে বিরোধীদল ইতোমধ্যেই দেশব্যাপী হরতালসহ নানা কর্মসূচী পালন করেছে।

৩০ জুলাই লন্ডনে বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তবর্ত্তী সরকারে বিরোধীদলকে অন্তর্ভুক্ত করা বা অংশগ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামসহ সর্বস্তরের মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, সরকার রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানে আন্তরিক বলেই এ প্রস্তাব দেয়া হয়েছে-এখন বিরোধীদলের উচিত হবে সমভাবে এগিয়ে আসা। সঙ্কটের যৌক্তিক সমাধান এবং দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে সকল পক্ষকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সংলাপ, আলাপ-আলোচনার পথ পরিবহার করে কখনও সঙ্কটের যৌক্তিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান হয় না। আর সব কিছুতেই 'না' বলা প্রত্যাখ্যান করা এবং পূর্বশর্ত জুড়ে দেয়া-শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ রুদ্ধ করে হানাহানি ও নৈরাজ্যকেই উস্কে দেয়-এ সত্য কি আমরা জেনে-শুনেও না বোঝার ভান করছি? রাজনৈতিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে অগণতান্ত্রিক শক্তি আবার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুক তা কি আমরা চাই? অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে যে গণতন্ত্রই নিরাপদ নয়-মাত্র সাড়ে তিন বছর পার হতেই আমরা কি সব ভুলে গেছি?

বিগত দিনে রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সংস্কৃতিকর্মীর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বহু নেতাকর্মী, এ সংগ্রামে নির্যাতিত-নিগৃহীত এবং কারারুদ্ধ হয়েছিল। সেই সংগ্রামের একজন সংগঠক হওয়া সত্ত্বেও নিজেও এখন আর অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই না। আমি জানি ভিন্নমতের মানুষরা এই নিয়ে আমাকে কটু বাক্য নিক্ষেপ করতে ছাড়বে না এবং বর্তমান সরকারের আমলে অনেক সুযোগ-সুবিধা, বিত্ত-বৈভব অর্জন করেছি অপবাদ দিতেও দ্বিধা করবে না অপপ্রচারের ভয়ে সত্য প্রকাশে কখনও কুণ্ঠিত হইনি-নিজের বিশ্বাসের প্রকাশকে জীবনের ব্রত বলে জ্ঞান করি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেন চাই না মোটা দাগে তার কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করছি :

১. আগে জনেছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেবে। বিগত দিনে সেনা প্রভাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দেশের নামকরা কতিপয় আইনজীবীর মুখে শুনলাম, 'যতদিন পর্যন্ত নির্বাচিত সরকার গঠিত না হবে ততদিন পর্যন্ত অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ শাসন করতে পারবে। দেশের বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা, রাষ্ট্রনীতি সবই তারা করতে পারবে তাদের ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা ও মত অনুযায়ী। বাস্তবেও তাই ঘটেছিল, ৯০ দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রায় দু'বছর দেশ শাসন করেছে কোন ধরনের জবাবদিহিতা ছাড়াই।

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে রাজনৈতিক তৎপরতা এবং সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার বলে কিছুই ছিল না।

৩. দেশের দু'টি প্রধান দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হয়েছিল। দুই নেত্রীকে রাজনীতি থেকে অপসারণের লক্ষ্যে দল ভাঙার নানা প্রক্রিয়াও চালানো হয়েছিল। রাজনীতিবিদদের চরিত্র হননের লক্ষ্যে নানা অপপ্রচার প্রত্যক্ষ করা গেছে। সমাজের অন্যান্য অংশের মতো রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু সব রাজনীতিবিদই দুর্নীতিবাজ নন-এ সত্যও মেনে নিতে হবে। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হলেও বিশেষ মহলের পৃষ্ঠাপোষকতায় নতুন নতুন রাজনৈতিক দল

(কিংস পার্টি) গঠন এবং জরুরি অবস্থার মধ্যেও বিশাল হোন্ডা মহড়া করবার দৃশ্যও ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার কল্যাণে জাতি প্রত্যক্ষ করেছে।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা শিক্ষকদের জরুরি আইনে করা কারাদণ্ড দেয়া হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতি এবং আগে কখনও তা প্রত্যক্ষ করেনি।

৫. সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা ছাড়াই হকার উচ্ছেদ, সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার ও বেআইনী দখলদার উচ্ছেদের নামে সড়ক, মহাসড়ক, পতিত জমি, খাসজমিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন স্থাপনা ও দোকানপাট উচ্ছেদ ও ধ্বংস করা হয়। এতে শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয় ও লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যায়। অথচ সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারি জায়গায় অস্থায়ী লিজ দেয়া হলে একদিকে সরকারের আয় বাড়ত, অপরদিকে সম্পত্তি ধ্বংস ও অসহায় পরিবারগুলো মানবেত জীবনযাপন করতে হতো না।

৬. বড় বড় ব্যবসায়ীদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া গ্রেফতার করার সর্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দ্রব্যমূল্য সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে। মিনিকেট চাল যেটা আমরা বর্তমানে কিনছি প্রতি কেজি আটত্রিশ টাকায়, তা পাঁচ বছর আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কিনতে হয়েছে পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন টাকা দরে।

৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংস্কৃতিচর্চার ওপর নেমে এসেছিল নানা ধরনের কালাকানুন। যে কোন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা করতে পুলিশের অনুমতি নেয়া ছিল বাধ্যতামূলক। লিখিত আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট থানা, ডিডি কমিশনার অফিস ঘুরে হ্যাঁ না না সিদ্ধান্ত পেতে হতো এবং অনেকগুলো শর্ত জুড়ে দেয়া হতো, যাতে লেখা থাকত অনুষ্ঠান কি কি করা যাবে করা যাবে না।

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি ১ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের আয়োজনে পথনাট্যোউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সকল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় মিনারে নাটক এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি, পুলিশ

অনুমতি না পাওয়ার কারণে। আমি গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ম. হামিদ সেক্রেটারি ঝুনা চৌধুরী ছুটে গেলাম মিন্টো রোডে, মহানগর পুলিশের প্রতিবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে। সেখানে উপস্থিত পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ সাহেবের বিশেষ সহযোগিতায় ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শহীদ মিনারে নাটক অনুমতি মিলল। আবার বিশ্বব্যাপী মে দিবস পালিত হলেও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মে দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেয়া হয়নি। আমার মনে আছে, প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল-শ্রদ্ধেয় কামাল লোহানী, মামুনুর রশীদ এবং আমিনসহ অন্যরা বক্তব্য রেখেছিলেন।

১৬ ডিসেম্বর ২০০৭ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত বিজয় ২০০৭ সালে পৌষ মেলা উদযাপন পরিষদ কর্তৃক সকাল বেলার অনুষ্ঠান আয়োজিত হলেও জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে বিকেল থেকে রমনার বটমূলে অনুষ্ঠিত পৌষমেলার নানা কর্মসূচি বন্ধ দেয়া হয়। পুলি, পিঠা, পায়েসকেও অগণতান্ত্রিক শক্তির এত ভয় আগে জানা ছিল না।

৮.জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং শাহাদাতবার্ষিকী পালনে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক খান সারওয়ার মরশিদ এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে আহ্বায়ক এবং আমাকে সদস্য সচিব করে তিনটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভা ও নিবেদিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যথেষ্ট সময় দিয়ে আবেদন করবার পরও তিনটি অনুষ্ঠানেরই অনুমতি দেয়া হয় অনুষ্ঠান শুরুর ২-৩ ঘন্টা আগে, তাও ১৩টি শর্ত জুড়ে দিয়ে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার হরণ শিল্প-সাংস্কৃতি চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি দুইনেত্রীকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কারাগারে প্রেরণ, রাজনীতিবিদদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, সরকারের অদৃশ্য পৃষ্ঠাপোষকতার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন এবং অনির্দিষ্টকাল ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার ষড়যন্ত্র যদি এ দেশের মানুষ রুখে না দিত তাহলে হয়তো কাঙ্খিত গণতন্ত্রের জন্য আরও বহু রক্ত ঝরাতে হতো। এতসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে

আর সমর্থন করা যায় না। যে সরকারের হাতে গণতন্ত্র এমনকি সংস্কৃতিও নিরাপদ নয়, তারা কোন অবস্থাতেই নিরপেক্ষ নির্বাচনের গ্যারান্টি দিতে পারে না। সম্ভবত এসব কিছু বিবেচনা করেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি থেকে সরে এসেছে। ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং সংবিধান সংশোধন করে 'অন্তর্বর্তী সরকার' এবং সেই সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া জাতীয় নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে তারা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। তাদের এ সমস্ত বক্তব্যের জাবাবেই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বিরোধী দলকে অন্তর্বতী সরকারের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী এ বক্তব্য যুক্তিযুক্ত সমযোপযোগী এবং সঙ্কট সমাধানে সহায়ক। বিএনপি যদি সিত্যকার অর্থেই সঙ্কটের সমাধান চায়, তবে তাদের উচিত হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে অনতিবিলম্বে সরকারকে আলোচনায় বসার দাবি জানানো। অন্তর্বর্তী সরকারের রূপরেখা কি হবে, সরকারে কার কি ভূমিকা থাকবে, নির্বাচন কমিশন কতটুকু নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে-এসব বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে হলে দু'পক্ষকে এক টেবিলে বসতেই হবে। আলোচনা বা সংলাপ ছাড়া সমস্যা সমাধানের কোন শান্তিপূর্ণ বিকল্প নেই। আর যারা আলোচনায় না বসার জন্য বিরোধীদলকে প্রভাবিত করছে তাদের মূল উদ্দেশ্য অগণতান্ত্রিক শক্তিকে প্রশ্রয় দেয়া। জনবিচ্ছিন্ন এইসব ব্যক্তি ও সংগঠন ব্যক্তি আকাঙ্খা চরিতার্থ করার সম্ভাবনা থেকেই রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত করতে তৎপর থাকে। আমরা আশা করব শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের চাইতেও দেশ এবং জনগণের কল্যাণে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একগুঁয়েমি পরিহার করে আলোচনা ও সমঝোতার পথে অগ্রসর হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকারে বিরোধীদলের অংশগ্রহণের প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি করে সঙ্কট সমাধানে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

টিপু খন্দকার
তাঁর জন্মদিনে

গাঙ্গেয় এ বদ্বীপে সব কাল; সব লগ্নই যেন অলুক্ষণে। এখানে কাল বৈরী, প্রাণ বৈরী; এ জগতসংসারে যতো বৈরিতা তার সবাই যেন স্রষ্টা অকাতরে ঢেলে দিতে সবচেয়ে উর্বর অনুকূল ভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন এ ভূখণ্ডকেই। কারণ হিংস্রতা, ক্রুরতা, শোষণ, পীড়ণ এ ভূমিতেই সবচেয়ে পয়মন্ত্র ফলন দেয়। আনুভূমিক হারেই বাড়ে- সম্প্রসারিত হয় সব কুটিলতার বীজ। ছেষট্টি হাজার সৈন্য নিয়ে মাত্র ৩২০০ সৈন্যের কাছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদৌল্লাকে হেরে যেতে হয়েছিলো। কোলকাতার ভিক্টোরিয়া হলে যারা পলাশীল রণপ্রান্তরের রেপ্লিকা দেখেছেন তাদের মর্ম যতনা কতটা কষ্টের হতে পারে যখন তারা দেখতে পান হাজার হাজার সশস্ত্র সৈন্য ঘেরাও আছে রবার্ট ক্লাইভের বাহিনীকে, কিন্তু শেষাবধি হার মানতে হয়েছিলো বাংলাকেই, ব্রিটিশকে নয়। এর নেপথ্যে কতটা সূক্ষ্ম চক্রান্তের জাল বিছানা হয়েছিলো তা সহজেই অনুমেয়। চক্রান্তকারী বণিকগোষ্ঠী জগতশেঠ, মীরজাফরদের কিনে নিয়েছিলো; তারা বিকিয়ে দিয়েছিলো নিজেদের; বিকিয়ে দিয়েছিলো দেশের স্বাধীনতাও। জগতশেঠ, মীরজাফর, রায়দুর্লভরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হলেও; এমনকি বাঙলার স্বাধীনতা পুনরুজ্জীবিত হলেও সে চক্রান্তের ধারা এখনও নিঃশেষ হয়নি। ঔপনিবেশিকতা আর পরাধীনতার গ্লানি ধুয়েমুছে গেলেও নতুন রূপে নতুন বেশে ফিরে এসেছে জগতশেঠ আর মীরজাফররা। স্বাধীনতার মাত্র চার দশকে জাতি প্রত্যক্ষ করেছে অনেক রক্তস্নাত আখ্যান, প্রত্যক্ষ করেছে অনেক ট্র্যাজেডি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের জগতকাঁপানো ওমন বিজয়ের পর জাতি কী করে প্রত্যক্ষ করলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের এক মহানায়কের নৃশংস হত্যাকাণ্ড? পঁচাত্তরের ঘটনা শুধু একজন ব্যক্তি মুজিবের হত্যাকাণ্ড ছিলোনা; বরং এটি ছলো আরো অনেক বড় মাপের 'ক্র্যাকডাউন- যার লক্ষ্য ছিলো একটি জাতিকে নেতৃত্বহীন করে তার মনোবল, বিকাশ, প্রগতি, উন্নয়ন রুদ্ধ করে দেয়া। এ চক্রান্তে সর্বোত সফল হয়েছে এমন বলি না। কিন্তু জাতিকে সর্বোতভাবে হতোদ্যোম করার জন্য

পঁচাত্তরের কৃষ্ণঅধ্যায়টি সবসময় একটি বড় হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করেছে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী। অধ্যাবধি এর ব্যবহার আমরা রাজনীতির মাঠে দেখতে পাই। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে খুনীচক্র জাতিকে যেভাবে নেতৃত্বহীনতার দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলো তা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন একজন। বলা যায়, নিয়তিই তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো বিস্মৃতির অতল থেকে জাতিকে জাগিয়ে তোলতে। আজ তার জন্মদিন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, শোষণ আর অনাচারপীড়িত এ দেশে অনেক জন্মই ব্যর্থ হয়ে যায়; নূনপেঁয়াজের হিসেব মিলে না লক্ষ সংসারে, সেখানে একজনের জন্মদিন কী এমন ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে- সে প্রশ্ন উঠতেই পারে খুব স্বাভাবিক কারণেই। সময় অনেকদূরে গড়িয়েছে, এখন কেউ আর বলেন না তার জন্মদিনটিও ব্যর্থ হয়ে গেছে আরো অনেক ব্যর্থতার মতোই, না, তিনি শুধু, বঙ্গবন্ধুর কন্যা বলেই যে তার জীবন এতো তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে তা এখন আর কেউ বলেন না। এটা সরল বাস্তবতা যে রক্তের উত্তরাধিকার তাকে বিশিষ্ট অবস্থানটি এনে দিতে সহায়ক হয়েছিলো অর্থাৎ তিনি দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলটির শীর্ষপদ আসীন হতে পেরেছিলেন। এ সত্য দর্পণে বিম্বিত অজস্র রেখার একটি দিককে মাত্র উদ্ভাসিত করে। কারণ পরিবারের সব স্বজনহারানো হাসিনা যখন দেশে ফিরলেন তখন তিনি সত্যিকার অর্থেই এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব। শুধু তিনি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে এ পরিচয়টিকেই তখন সামনে তুলে ধরার মতো ছিলো। কিন্তু ইতিহাস বড় বিচারক হয়ে থাকে সব কালেই। সত্য উদ্ভাসনের লড়াই যে কখনো পরাজিত হয় না তা আর একবার প্রমাণ করলেন শেখ হাসিনা। তিনি শুধু তাঁর দলের পুনরুজ্জীবনই ঘটাননি, একইসঙ্গে একটি নৈতিকতারও পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন আর তা হচ্ছে দেশের প্রচলিত বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাযজ্ঞের পর দশকের পর দশক ধরে এ দেশের মানুষ শুনে এসেছে, এদেশে যা খুশি তাই করা যায়, এমনকি খুনখারাপিতেও কিছু হয় না। মুজিবের হত্যাকারীরা দেশবিদেশে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, তারা মন্ত্রী হতে পারে, বিদেশে দূতাবাসে পেতে পারে চাকরি, এমনকি রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে নানা ছলচাতুরি করে ভোট বাগিয়ে কিংবা কারচুপি করে বনে যেতে পারে সংসদ সদস্য। এটা খুব দুঃখজনক বাস্তবতা যে রাষ্ট্রের স্মৃপতিকে হত্যা করে দেশের

পার্লামেন্টের মেম্বার বনে যেতে পেরেছিলো হত্যাকারীরা। এটি হত্যাকারীদের কোনো কৃতিত্ব ছিলো না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় ভোগ বাগিয়ে কিংবা কারচুপি করে বনে যেতে পারে সংসদ সদস্য। এটা খুব দুঃখজনক বাস্তবতা যে রাষ্ট্রের স্থপতিকে হত্যা করে দেশের পার্লামেন্টের মেম্বার বনে যেতে পেরেছিলো হত্যাকারীরা। এটি হত্যাকারীদের কোনো কৃতিত্ব ছিলো না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছিলো তারা সর্বোত রসদ যুগিয়েছে হত্যাকারীদের। রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করার জন্য এমনভবে খুনীদের ঘৃন্য পক্ষাবলম্বন নজিরবিহীন। বিশ্বমানচিত্রে এমন ঘৃন্য উদাহরণ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে রাষ্ট্রের স্থপতিকে হত্যার বিচার আইন করে রদ করে দেয়া হয়। বাংলাদেশ তাই হয়েছে। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার উত্থান সত্য উদ্ভাসনের একটি ক্ষীণদরোজা খুলে দিয়েছিলো আর তা হচ্ছে দেশকে মূলধারার প্রত্যাবর্তন করানো। এই মূলধারা কথাটি রাজাকার-আলবদর আর তাদের পৃষ্ঠপোষক দোসরদের কাছে আপেক্ষিক। এক্ষেত্রে তারা একটি বর্ম টেনে আনে। বলার অপেক্ষা রাখে না এ বর্ম হচ্ছে ধর্মের বর্ম। সেই পরাধীন আমল থেকেই এ দেশের মানুষ এ বর্মের ব্যবহার দেখে আসছে। যতো হীন অপকর্ম তা ঢাকার জন্য পবিত্র ধর্মকে টেনে আনার ঘৃণ্য এ রেওয়াজ এ দেশের মানুষ বারবার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানও করেছে। প্রশ্ন ওঠে তাহলে এ ব্যর্থ অস্ত্র কেন বারবার ব্যবহার করা হয়? এর কারণ একটিই এদেশের সরল সুবোধ সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া। কিন্তু সব কালে সবদেশে সব মানুষকে সবসময় কি ধোঁকা দেওয়া সম্ভব হয়? হয় না বলেই একসময় ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। আর এ কথাটিও সর্বজন বিদিত যে, কোনো রাজনৈতিক দলের শীর্ষাসনে কাউকে বসিয়ে দিলেই তিনি নেতা হয়ে যান না, এটা যে হয় না তার অনেক প্রমাণ এদেশেই আছে। এ কথা প্রমাণের জন্য বেশি দূর যাওয়ার দরকার পড়ে না, বাংলাদেশের সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারই এর প্রমাণ। এ সরকারের আমলে প্রথমে চেষ্টা করা হয় নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের প্রধানকে সামনে রেখে নতুন রাজনৈতিক প্লাটফর্ম দাঁড় করানোর। এ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর চেষ্টা করা হয় ক্ষমতান্বেষী কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে সামনে রেখে

আর একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের। শোনা যায়, এর জন্য রাষ্ট্রের 'তেল-কড়ি'ও কম ঢালা হয় নি। কিন্তু সত্য হচ্ছে এই যে তো চেষ্টাই করা হোক না কেন, কোনো নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় নি। এভাবে আর যাই হোক না কেন কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় না। ঠিক একইভাবে শীর্ষপদে কাউকে বসিয়ে দিলেই তিনি নেতা হয়ে যান না। নেতা হওয়া যার জন্য নিজেকে নেতৃত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। গণমানুষকে দিকনির্দেশনা দিতে হয়। গণমানসে নিজেকে উদ্ভাসিত করতে হয় তাদের স্বপ্ন প্রতিভূ হিসেবে। একই সঙ্গে ভয়ভীতি উপেক্ষা করে নেতাকর্মীদের পরিচালনা করার ক্যারিশমা থাকতে হয়। শেখ হাসিনাকেও এসব পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তাকে হত্যা করার জন্য একবার-দু'বার নয়; অসংখ্যবার তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা চেষ্টা করেছে। চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দানে জনসভায় তাঁকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। আর তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ দিতে হয় নেতাকর্মীদের; প্রায় অর্ধশত তরতাজা প্রাণ সেদিন ঝরে যায় লালদীঘির ময়দানে। নেতাকর্মীরা নিজেদের জীবন দিয়েই সেদিন রক্ষা করেন হাসিনাকে। এ ধরনের হামলায় একবার-দু'বার নয়, বারবার তাঁর জীবন কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বশেষ ভয়াবহ হামলা করা হয় খালেদা-নিজামির আমলে। শেখ হাসিনার ওপর এসব হামলা কোন চোরাগোপ্তা পথে করা হয় নিঃ অবশ্য তা করারও দরকার ছিলো না। কারণ সরকার-প্রশাসন ছিলো হামলাকারীদের সঙ্গে, সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এসব হামলায় ব্যবহৃত হয়েছে এমন সব অস্ত্র যা কোনো সাধারণ সন্ত্রাসীর কাছে থাকা সম্ভব নয়। ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে যে সব গ্রেনেড ব্যবহার করেছিলো সন্ত্রাসীরা তা কোনোভাবেই সরকারের শীর্ষমহলের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তাদের হাতে যাওয়া সম্ভব নয়। সেদিনের এ হামলা কেড়ে নিয়েছিলো আইভি রহমানসহ অসংখ্য তরতাজা প্রাণ। এ হামলার সঙ্গে তৎকালীন সরকার প্রত্যক্ষভাবে যে জড়িত ছিলো তার আর এক প্রমাণ হলো এ ধরনের ন্যাক্কারজনক হামলার পরেও তা নিয়ে সেদিন জাতীয় সংসদে কোনো শোকপ্রস্তাব আনা তো দূরের কথা, এ নিয়ে তৎকালীন সরকার পার্লামেন্টে কোনো আলোচনাই করতে দেয় নি। বরং ঘৃণ্য এ হামলা নিয়ে খালেদা-নিজামির সরকার নানা নাটক রচনা করেছে। বারংবারের হামলা-আঘাত থেকে হাসিনার রক্ষা পেয়ে

যাওয়ার ঘটনা অনেকটা দৈব চক্রই বলতে হবে। শুধু হাসিনার ওপর হামলাই নয়, দেশের মানুষকে সবসময় তটস্থ করে রাখতে খালেদা জিয়া সরকারের আমলে তৈরি করা হয় এক নতুন আপদ-তার নাম জঙ্গি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে এমনিতেই এ দেশকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী আদর্শের ধারায় পরিচালিত করেছেন জিয়া-এরশাদচক্র। আর জিয়ার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যেন ষোলোকলা পূর্ণ করলেন। এ সর্বনাশা পথে হাঁটতে গিয়ে খালেদা জিয়া শুধু নিজেরই বারোটা বাজাননি একই সঙ্গে দেশকে ঠেলে দিয়েছেন এক অজানা আশংকার পথে। এখন এ অপশক্তিকে রুখতে সদাসর্বদা রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। এ দরিদ্র দেশে এটি অর্থ আর শক্তির নিষ্ফলা ক্ষয় ব্যতীত আর কিছু নয়। স্বাধীনতার চারদশকে এ দেশ নিজের পায়ে যে দাঁড়াতে পারলো না তার কারণগুলো কোনো সচেতন মানুষের অজানা থাকার কথা নয়। বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করে যে ধারায় এ দেশকে পরিচালনা করা হয় তা থেকে পরিত্রাণ পেতেই মুজিব তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ যে কারণে দেশ স্বাধীন করা হলো অনেক রক্তঅশ্রুর বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে সেসব কারণকেই সদ্য স্বাধীন দেশে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হলো। দেশটির নাম বাংলাদেশ থাকলোা বটে; শুধু এ নামটুকুই যেন টিকে থাকলো কিন্তু বাকিসব হয়ে উঠলো পাকিস্তানী। দেশ আবার ফিরে পেলো পাকিস্তানী ভাবধারা। রাষ্ট্রের চরিত্র হয়ে উঠলো সাম্প্রদায়িক। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ছিলো কসাইয়ের ভূমিকায়-অবলীলায় পাকিস্তানী বাহিনীর কোলাবোরেটর হিসেবে হত্যা করেছে; অংশ নিয়েছে ধুন-ধর্ষণ-লুটতরাজে-তারাই হয়ে উঠলো রাষ্ট্রের পরিচালক, তারা উজির-নাজির হলো- তাদের গাড়িতে উড়ানো হলো রক্তঅশ্রুসিক্ত লালসবুজ পতাকা। ধর্মান্ধ-প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর উন্মাদনা শুরু হলো। দমন-পীড়ন-উৎপাটন শুরু হলো প্রগতিশীলদের ওপর। এরকম একটা অবস্থায় নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে দেশে ফিরলেন শেখ হাসিনা। শুরু হলো এক বৈরী পরিবেশে পথচলা। শুধু বৈরী বললে সবটুকু বলা হয় না। বলা যায় প্রতি মুহূর্তে ঘাতকের বন্দুকের নল তাড়া করে ফিরছে তাঁকে। একদিকে ঘাতকের ছায়া আর অন্যদিকে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল এর মধ্যেই তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে বা হচ্ছে দেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দলটিকে। তাকে অসহায় অবস্থায়

ঠেলে দিতে তার অনেক সহযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে, মাঠে নামিয়ে দেয়া হয়েছে সশস্ত্র জঙ্গী, নিরন্তর চালানো হয়েছে মিথ্যা প্রচারণা। তার চলার পথ কখনো মসৃণ ছিলো না। এতো করেও তাকে দমানো যায় নি। তিনি প্রমাণ করেছেন– সত্যের লড়াই কখনো পরাভূত হয় না, পরাজিত হয় না। আর যায় না বলেই যে রাজনৈতিক দলটিকে দু'দুজন অবৈধ সামরিক শাসক ঠেলে দিতে চেয়েছিলো বিস্মৃতির পথে তিনি তাকেই দু'দুবার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন করেন। বিলীন হতে বসা মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হন। তিনি দরিদ্রমানুষের জন্য হয়ে ওঠেন অমেষ করুণাধারা। রাজদণ্ড হাতে থাকার পরেও ভুলে যান না রাজপথকে । মাতৃমূর্তির প্রতিচ্ছায়া তার বিচরণে। তাঁর সমালোচনা করার মতো আচরণও নিশ্চয়ই কম নয়। কিন্তু যা তার অর্জন তাতেই তিনি অধিক সমুজ্জ্বল, তিনি রুক্ষ-রাঢ় বঙ্গে সফেদ শান্তির শুভ্র পতাকা ওড়াবেন। এটা তার সুহৃদরা চাইবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও অধিক সত্য এই যে– একটা নির্বান্ধব, সদা সমালোচনায় রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত ভঙ্গুর বর্ণচোরা সর্পিল পথেই তাঁকে হাঁটতে হবে সদাসর্বদা। তাঁর জন্মদিনে এ কঠিন সত্যের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়াই তাঁর জন্য হয়ে উঠবে শ্রেষ্ঠ উপহার।

ড. আবদুল ওয়াহাব

বাংলাদেশর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা : প্রতিভা, নেতৃত্বের বহুমাত্রিক দ্যুতি

যে কোনো দেশের জন্যই প্রয়োজন পড়ে নেতৃত্বের, প্রয়োজন পড়ে এমন একজন প্রতিভাধর মানুষের, যার বহুমাত্রিক দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয় দেশের সর্বস্তরের মানুষ, রাষ্ট্রকাঠামো, প্রজাতন্ত্রের প্রশাসন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে রকমই প্রতিভাময়ী ও নেতৃত্বের দ্যুতিতে উজ্জ্বল মুখ। তিনি ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মা শহীদ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ । ১৯৬৮ সালে তাঁর বিয়ে হয় বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জননী। তাঁরা হলেন, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পতুল।

শেখ হাসিনার শিক্ষাজীবন নগর পরিমণ্ডলে তথা ঢাকাকেন্দ্রীক হলেও পিতার রাজনৈতিক বন্দিজীবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে থাকার কারণে গ্রামজীবনের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পিতার মতো সবসময় তাঁর নাড়ির নীরব টান গ্রামজীবন, কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ। চিরায়ত বাংলার গ্রাম ও গ্রামীণজীবন যে কি সুন্দর ও প্রাণ প্রাচুর্যময়, মানবীয় জীবনবোধের প্রনোদনাকারী তার খবর আমরা পাই লালন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জসীমউদ্দিন বঙ্গবন্ধুসহ অন্য আরো বহু কবি-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-রাজনৈতিকের কাছে।

আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মিক-মানবীয় উৎকর্ষের কারণও ঐ বাংলার চিরসুন্দরময় গ্রামীণ কৃষকের গার্হস্থ্যজীবন। তাঁর মহানুভবতার আর এক কারণ তাঁর মহান পিতা ও মহিয়সী মাতার জীবনাদর্শ। প্রকৃতি ও মানুষ, মানুষ ও প্রকৃতির সংশ্লেষে বাংলার কৃষকের জীবন সংগ্রাম মানবিকতার আকর উপাদান। এরই মধ্যে অবগাহন শেখ হাসিনার শৈশব-কৈশোরকাল। এ সবই তাঁর অন্তরে বপন করে মানুষকে ও দেশকে ভালোবাসার বীজমন্ত্র। বনজঙ্গল, বিল-হাওড়, পাখপাখালি, গাছগাছালির

ছায়ায় ঘেরা সুন্দর-মনোরম, প্রাকৃতিক ও সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনের এক প্রাণজ্জ্বোল বর্ণনা পাই। শেখ হাসিনার ভাষায় :

নদীর পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান-পাট-আখ ক্ষেত সারি সারি খেজুর, তাল-নারিকেল-আমলকি গাছ, বাঁশ- কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতাপাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসের চিকন লম্বা লম্বা সতেজ ডগা শালিক-চড়ুই পাখিদের কল-কাকলি, ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘুর ডাক। সব মিলিয়ে ভীষণরকম ভালোলাগার একটুকরো ছবি যেন। আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে এ টুঙ্গিপাড়া গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল-সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়ে উঠি।

স্বভাবসুলভ হাসি, লোকদর্শনজাত উদার নৈতিকতা, মানবতা, সরলতা ও সহজিয়া জীবনদর্শন তাঁর জীবনের অনন্য বেশিষ্ট্য। যেমন মিষ্টি তাঁর চেহারা তেমনি দেশের সকল মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার প্রমাণ তাঁর মিষ্টি মধুর হাসি। স্বজন হারানোর দুঃসহ বেদনা এবং ক্লান্তিহীন জীবন সংগ্রাম তাঁকে এতটুকু মলিন করতে পারে নি। পিতার মতোই জীবনের সমূহ ঝুঁকি সত্ত্বেও দুঃখী-বঞ্চিতজনের তথা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানো তাঁর জীবনের গুরু দায়িত্ব। সৃষ্টিকর্তা পিতার মতো তাঁকেও যেন এই মহান দায়িত্ব দিয়ে মাটির পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। লালন বলেছেন, জীবনের ব্রত হতে হবে সত্য ও সুন্দরের সাধনা, তাহলেই পাওয়া যাবে মানুষের দর্শন- বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। তাঁর সুযোগ্যকন্যাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁর বিদুষী মাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবও ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, দয়াময়, মমতাময় ও দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা দিয়েছেন মহীয়ষী এই নারী আজন্ম বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য সাধনা করেছেন।

আমরা নিম্নোক্ত চারটি পর্বে যেমন : শিক্ষা, রাজনীতি, লেখক শেখ হাসিনাও পুরস্কার-সম্মাননা এভাবে বিভাজন করে তাঁর জীবনসংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে বিশ্লেষণের প্রয়াস নিয়েছি।

শেখ হাসিনার স্কুল জীবনের শুরু ঢাকার টিকাটুলি নারীশিক্ষা মন্দিরে (বর্তমানে শের-ই বাংলা মহিলা স্কুল এন্ড কলেজ নামে পরিচিত)।

মাধ্যমিক-আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় (১৯৬৫), উচ্চ মাধ্যমিক-সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, (ইডেন কলেজ) ঢাকা (১৯৬৭), স্নাতক (কলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৩)। তিনি স্কুল জীবন থেকেই ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। তিনি ১৯৬৬-৬৭ সালে ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের সহসভানেত্রী নির্বাচিত হন এবং একই সঙ্গে ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের সভানেত্রী, নির্বাচিত হন। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে রোকেয়া হলের ছাত্রলীগের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তির সনদ ৬ দফা দাবি পেশ করেন। পূর্ববাংলার সাধারণ জনগণের মাঝে ৬ দফাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা করে। জনগণ মুক্তির দাবি ৬ দফাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য যে, সবার আগে শেখ হাসিনা ৬ দফাকে তাঁর ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের নির্বাচনের প্রচারণায় নিয়ে আসেন এবং ৬ দফার পক্ষে প্রথম ম্যান্ডেট লাভ করেন।

শেখ হাসিনা ১৯৬৯ সালে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তৎকালীন ছাত্রীনেত্রী শেখ হাসিনা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁদের ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের গৃহান্তরীণ করে রাখে। সেই বাড়িতে অন্তরীণ হন শেখ হাসিনাও।

বাংলাদেশ নামক ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রে স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জীবনের সিংহভাগ সময় পাকিস্তান কারাগারে কাটান। সে কারণে অন্যান্য ভাই-বোনসহ শেখ হাসিনা পিতার সাহচর্য থেকে একরকম বঞ্চিত হন। দেশ স্বাধীন হবার পরও এর তেমন একটা ব্যত্যয় ঘটে নি। বঙ্গবন্ধু দিনরাত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকায় সন্তানেরা অল্প সময়ই তাঁকে কাছে পেত।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙালি জাতির জীবনে এক দুঃখজনক, হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে। সামরিক বেসামরিক কয়েকজন ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা, দরিদ্র-দুঃখী মানুষের মুক্তির ত্রাতা বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। বাঙালি জাতির ললাটে অলক্ষ্যে খচিত হয় পিতৃহত্যার মহাকলঙ্কের কালিমা। ভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও ছোট বোন শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানিতে থাকায় তাঁর মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালের ১৬ই মে পর্যন্ত তিনি ভারতে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন।

রাজনীতি

রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হিসেবে শেখ হাসিনার রাজনীতি চর্চার সূচনা স্কুল জীবন থেকেই। তবে জাতীয় রাজনীতিতে সক্রীয় অংশ গ্রহণ ১৯৭৯ সালে। সামরিক জান্তা ১৯৭৯ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করে। তখন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে সৃষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ড. কামাল হোসেনসহ শীর্ষস্থানীয় নেতারা শেখ হাসিনাকে দলের সভানেত্রী করার প্রস্তাব দেন। শেখ হাসিনার অবর্তমানেই ১৯৮১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি দলের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। দীর্ঘ প্রায় সাত বছর নির্বাসন জীবন যাপনের পর শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ মে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পর থেকেই তাঁর উপর শুরু হয় পাকিস্তানপন্থি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী ধর্মান্ধ, মৌলবাদী ও উগ্রবাদী চক্রের ষড়যন্ত্র। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক সরকার তাঁকে চোখ বেঁধে ঢাকা সেনানিবাসে আটকে রাখে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দলীয় জোট যুগপৎ সামরিক শাসক বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি ও নভেম্বর মাসে পুনরায় তাঁকে সামরিক সরকার গৃহবন্দি করে। ১৯৮৬ সালে শেখ হাসিনার বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ষড়যন্ত্রের কারণে হয়নি। এ বছর ৭ই মে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। অদূরভবিষ্যতে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এ বিশ্বাস তাঁর রক্ত-মজ্জায় ছিল; তাই সুন্দর আগামীর স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের স্বার্থে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতার আসনে বসেন।

১৯৮৬ সালের ১০ ই নভেম্বর তিনি এক মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এ সময় শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। তৎকালীন সামরিক সরকার গাড়িসহ বিরোধীদলীয় নেত্রীকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে তাঁকেসহ তাঁর গাড়ি ক্রেন দিয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। অতঃপর ১৯৮৬ সালের ১১ই নভেম্বর তাঁকে ১ মাসের আটকাদেশ দেওয়া হয়।

১৯৮৮ সালের ২৪ শে জানুয়ারি চট্টগ্রামে জনসভায় ভাষণ দানকালে পুলিশের গুলিবর্ষণে অল্পের জন্য রক্ষা পান শেখ হাসিনা। তদস্থলে আওয়ামী লীগের ৫০ জন কর্মী নিহত হয়।

শেখ হাসিনা ১৯৯০ সালের ৬ই নভেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঐতিহাসিক ফরমুলা উত্থাপন করেন। বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্ব একটি নতুন ধারণা। সে সময় এ নিয়ে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর বঙ্গভবনে শেখ হাসিনাকে অভ্যন্তরীণ করা হয়। পরে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলনের চাপে তাঁকে মুক্তি দেয় সরকার।

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নিবাচনে সারাদেশে আওয়ামী লীগ শতকরা ৩৮ ভাগ ভোট পেয়েও সরকার গঠন করতে অসমর্থ হয়। ৩১ ভাগ ভোট পেয়ে বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী চক্র জামাত শিবিরকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করে জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি সরকার চালু রাখতে চায় তৎকালীন বিএনপি সরকার। কিন্তু গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতা হয়েও সংবিধান সংশোধনপূর্বক সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তনে জাতীয় সংসদে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারি-বেসরকারি সকল দলের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সংবিধানের ঐতিহাসিক দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মাধ্যমে ১৭ বছর পরে দেশে আবার সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে।

১৯৯১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন চলাকালে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। পরে ঢাকায় তাঁর বাসভবনেও একাধিকবার হত্যা প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৯৪ সালে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ট্রেন-মার্চ চলাকালে ঈশ্বরদী স্টেশনে তাঁর কামরা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। একই বছর তিনি দেশব্যাপী সারের দাবিতে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এ সময় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দিনাজপুরের

ইয়াসমিন হত্যাকাণ্ডের আন্দোলন দেশব্যাপী ব্যাপকতা লাভ করে। স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কথা ছিল বঙ্গবন্ধুর। ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়ায় তিনি সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজসমাপ্ত করতে গ্রহণ করেন অনেক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। তিনি ১৯৯৪ সালের ১৪ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু এককালীন বাসভবনে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করেন।

একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ট্রাস্টি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর মতোই ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ও আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া পড়ে। ১৯৯৬ সালের ৩০ শে মার্চ আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ঘটে। দেশে প্রথমবারের মতো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। অবশেষে ১৯৯৬ সালে ১২ই জুন অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। দীর্ঘ ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় যায় আওয়ামী লীগ। ২ শে জুন শেখ হাসিনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১২তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী থাকলে দরিদ্র মানুষের জন্য তিনি অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেন। এর মধ্যে-বয়স্ক ভাতা, আশ্রয় প্রকল্প ইত্যাদি দেশ-বিদেশে ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩০ বছরের বিদ্রোহের অবসান ঘটে। তাঁকে অনুসরণ করে আয়ারল্যান্ডেও বিদ্রোহীদের সঙ্গে অস্ত্র বিরতি চুক্তি করা হয়।

শেখ হাসিনা বেশি গুরুত্ব দেন কৃষিখাতকে। পাঁচ বছরে বিতরণ করা হয় ২৫০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ। ফলে পাঁচ বছরই কৃষিতে বাম্পার ফলন ফলে। এই সময়কালে দেশে ২ কোটি ৫০ লাখ টন খাদ্য উৎপাদন হয়; যা চাহিদার তুলনার ২৯ লাখ মেট্রিক টন বেশি। শেখ হাসিনার কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষ নেতৃত্বে দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়।

২০০১ সালে শেখ হাসিনা ষড়যন্ত্রমূলক নির্বাচনের সম্মুখীন হন। দেশে তিনি প্রহসনমূলক নির্বাচণের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। ২০০৪

সালের ২১শে আগস্ট আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ভাষণদান কালে তাঁর প্রাণনাসের প্রচেষ্টায় গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। ঐ হামলায় ২৪ জন নেতাকর্মী নিহত হন এবং শতাধিক আহত হন। শেখ হাসিনা ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ২০০৭ সালে 'ওয়ান ইলেভেন' নামক এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি জন্ম দেওয়া হয়। এই ওয়ান ইলেভেনের পর সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক তিনি পুনরায় বিশেষ কারাগারে অন্তরীণ হন। ২০০৭-এর ১৬ই জুলাই সকাল ৭টায় যৌথবাহিনীর সদস্যরা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে। মোট ৩৩১ দিন বিশেষ কারাগারে শেখ হাসিনা বন্দি জীবন কাটান। ২০০৮/ এর ১২ই জুন সরকারের নির্বাহী আদেশে সংসদ এলাকায় গঠিত বিশেষ কারাগার থেকে শেখ হাসিনাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি প্রথমে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি জাদুঘরে যান; তারপরে যান সুধাসদনে। প্যারোল অবস্থায়ই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ২রা ডিসেম্বর ২০০৮-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে তিনি এবং তাঁর রাজনৈতিক জোট এক অভূতপূর্ব সফলতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৬তম প্রধানমন্ত্রী।

লেখক শেখ হাসিনা

১৯৮১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো একটি সুবৃহৎ রাজনৈতিক দলের সভাপতির পদ অলংকরণের সময় থেকেই তাঁর জীবনের গতিধারা আমূল পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পিতার মতোই তাঁর দলের লক্ষ নির্ধারণ করা হয় গ্রামবাংলার দুঃখী ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তি এবং অনেক রক্তের দানে অর্জিত বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা, গণতন্ত্র সমুন্নত রাখা। এ এক পর্বত প্রমাণ কাজ। এরই মধ্যে শেখ হাসিনার লেখক সত্তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। কেননা তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণদানকারী শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। এ ভাষণ তৎকালে স্বাধীনতাকামী বাঙালির উদ্দীপনায় সঞ্চার করেছিল আলোর গতি। কাজেই তাঁর রক্ত-মজ্জায় লেখক ও নেতৃত্ব দুই সত্তাই যুগপৎ উদয়িত। তাঁর রচনাবলীর ভূমিকার কিয়দংশ এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

বই পড়ার অভ্যাস আমার শৈশব-কৈশোর থেকে এবং সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়া করায় আমি এ-ভুবনে একজন মুগ্ধ অনুরাগী শুধু। কোনো দিন নিজে লেখক হব একথা ভাবিনি। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম আমার । পিতা জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে বড় হয়েছি। একদিন যে আমাকেও তাঁর মতো রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে ভাবিনি। সময়ের দাবি আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। পিতার স্বপ্ন ছিল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো। আমি এই আদর্শ নিয়ে ২৮ বছর যাবৎ জনগণের সেবক হিসেবে রাজনীতি করে যাচ্ছি। আমার এই দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি, অভিজ্ঞতাও ভিশনকে সামনে রেখেই এই লেখাগুলো তৈরি করেছি।'

রাজনীতিকদের মধ্যে লেখালেখি করেছেন এমন ব্যক্তিত্বের সংখ্যা পৃথিবীতে বিরল। বাংলার রাজনীতিকদের বেলায় ও একই কথা বলা চলে। আমরা জানি মুঘল সম্রাট বাবর একজন কবি ছিলেন। রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিন এবং আধুনিক চিনের জনক মাওসেতুংও প্রচুর লিখেছেন। সে তুলনায় বাংলার রাজনীতিকদের লেখা সামন্যই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাস বসু, কমরেড মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখের নাম আমরা স্মরণ করতে পারি। তবে আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে এগারো বছর কাটিয়েছেন জেলে। এর মধ্যে তিনি ক্লান্তি হীনভাবে লিখে গেছেন-তাঁর লেখার মূল বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙালির বঞ্চনা-দুর্দশার কথা ও দুঃখী মানুষের দুর্দশার করুণ ইতিহাসের কথা। এগুলো তিনি লিখেছেন জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। তাঁর অধিকাংশ লেখাই এখনো অপ্রকাশিত।

পিতার যোগ্য উত্তরসুরি শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি লেখালেখির মাধ্যমেও তাঁর জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছেন। তাঁর লেখার গদ্যভঙ্গি সহজ ও প্রাঞ্জল। কাব্যিক ব্যঞ্জনাময় সরল-সহজ-সুন্দর-প্রাঞ্জল ভাষা তিনি কীভাবে আয়ত্ব করলেন? মূলত এটা তাঁর অন্তরের সাবলীল প্রকাশ। তাঁর হৃদয়ের ন্যায় লেখার ভাষাও নির্মল ও গতিশীল।

বাবা, কৈশোরকাল ও গ্রাম জীবনের স্মৃতির টুকরো অংশ উদ্ধৃতির মাধ্যমে শেখ হাসিনার ব্যক্তি ও রাজনৈতিক মানসের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকের সমীপে বিধৃত হলো :

বাবার স্মৃতি: বাবাকে একবার গোপালগঞ্জ থানায় আনা হলে দাদার সঙ্গে আমি ও কামাল দেখতে যাই। কামালের তো জন্মই হয়েছে বাবা যখন ঢাকায় জেলে। ও বাবাকে খুব কাছ থেকে তখনও দেখেনি। আমার কাছেই বাবার গল্প শুনত মুগ্ধ হয়ে। গোপালগঞ্জ জেলখানার কাছে পুকুর পাড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বাবাকে নিয়ে যাবে কোর্টে তখনই আমরা দেখব। কামাল কাছ ঘেঁষে বলল- হাচুপা, তোমার আব্বাকে আব্বা বলতে দেবে। আমার শৈশবের হৃদয়ের গভীরে কামালের এই অনুভূতিটুকু আজও অম্লান হয়ে আছে। বাবাকে আমাদের শৈশবে-কৈশোরে খুব কমই কাছে পেয়েছি। শৈশবে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত ছিলাম বলে দাদা-দাদি, আত্মীয়স্বজন, গ্রামের মানুষের অশেষ স্নেহ-মমতা পেয়েছি।

কিশোর বেলার স্মৃতি : আমাদের পরিবারের জন্য মৌলভী, পণ্ডিত ও মাস্টার বাড়িতেই থাকতেন। আমরা বাড়ির সব ছেলেমেয়ে সকাল সন্ধ্যা তাঁদের কাছে লেখাপড়া শিখতাম। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলেও কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলাম। আমার কৈশোরকাল থেকে শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিলো।

গ্রাম জীবনের স্মৃতি : খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে পা ভেজানো আমার কাছে ভীষণরকম লোভনীয় ছিলো। নদীর পানিতে জোড়া নারকেল ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে টেংরা পুঁটি খল্লা মাছ ধরা। বর্ষাকালে খালে অনেক কচুরিপানা ভেসে আসতো। সেই কচুরিপানা টেনে তুললে তার শিকড় থেকে বেরিয়ে আসতো কই ও বাইন মাছ। একবার একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।

প্রকাশিত বই

১.ওরা টোকাই কেন (১৯৮৭), ২. বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম (১৯৯৩), ৩. দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা (১৯৯৩), ৪. আমার স্বপ্ন, আমার সংগ্রাম (সম্পা) (১৯৯৩), ৫. পিপল অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (১৯৯৭, ৬. আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি (১৯৯৮), ৭. বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন (১৯৯৯), ৮. ডেভেলপমেন্ট অব দ্য মাসেস (১৯৯৯), ৯. সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র (১৯৯৯), ১০. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন (২০০১), ১১. বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা (২০০২), ১২. ডেমোক্রেসি

ইন ডিসট্রেস, ডিম্যান্ড হিউম্যানিটি (২০০৩) ১৩. সহেনা মানবতার অবমাননা (২০০৩), ১৪. লিভিং উইথ টিয়ার (২০০৮), ১৫. বাংলা আমার আমি বাংলার (সম্পা:) (১৯৯৮), ১৬, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে শেখ মুজিবুর রহমান (সম্পা:) (১৯৯৮), ১৭. MILES TO GO, hat of the people's republic of Bangladesh (1998), 18. Democracy in Sistress: Demeaned Humanity, Agamee Proleashari, Dhaka (2003) এবং ১৯. সবুজ মাঠ পেরিয়ে, মাওলা ব্রাদার্স, (২০১১)।

রচনাবলী : শেখ হাসিনার রচনাসমগ্র (১ম খণ্ড), মাওলা ব্রাদার্স (জানুয়ারি ২০১০), শেখ হাসিনার রচনাসমগ্র (২য় খন্ড), মাওলা ব্রাদার্স (জানুয়ারি ২০১০।

আমাদের পরমপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার লেখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামবাংলার হতদরিদ্র দুঃখী-অসহায় মানুষের করুণ জীবনগাঁথা, পারিবারিক বিপর্যয় এবং বাল্য-কৈশোরকালের স্মৃতির কথা। তাঁর চিন্তা-চেতনায় সর্বদা মানুষের মঙ্গল, সত্য ও সুন্দরের কথা মূর্ত। তিনি যেমন শক্ত হাতে রাষ্ট্রের হাল ধরেছেন তেমনি তাঁর লেখনীও নিরন্তর বহমান। তাঁর গদ্যের সরল ও প্রাঞ্জল ভাষাশৈলীতে সরল জীবনযাপনের ও মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার প্রমাণ মেলে তাঁর লেখার বিষয় নির্বাচনেও মানব প্রীতির লক্ষণ বিদ্যমান।

পুরস্কার ও সম্মাননা

এ যাবৎ শেখ হাসিনার প্রাপ্ত পুরস্কার, সম্মাননা ও ডিগ্রিসমূহ :

আইন বিষয়ে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৭); ঐ, ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান (১৯৯৭); সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অহিংস, ধর্মীয় সম্প্রতি ও গণতন্ত্র বিকাশে অবদানের জন্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (মহাত্মা গান্ধি) পুরস্কার, মাহাত্মা গান্ধি ফাউন্ডেশন, নরওয়ে (১৯৯৮); পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইউনেস্কো হুফে-বোইনি শান্তি পুরস্কার (১৯৯৮); মাদার তেরেসাঁ পুরস্কার, নিখিল ভারত শান্তি পরিষদ (১৯৯৮); হেড অব স্টেট মেডেল (১৯৯৬-৯৭), আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব থেকে মেডেল অব ডিস্টিঙ্কশন (১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৮-৯৯), দেশীকোত্তম (ধরিত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক ডক্টরেট

ডিগ্রি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৯); সমাজসেবায় অবদানের জন্য আইন বিষয়ে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া (১৯৯৯); শান্তি ও গণতন্ত্রে অবদানের জন্য আইন বিষয়ে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৯); উন্নয়নে নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতার জন্য মর্যাদাসম্পন্ন পার্ল এস বার্ক পুরস্কার, ব্যান্ড লফ ম্যাকন ওসেন্স কলেজ, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৯); ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিরোধী সংগ্রামে অবদানের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সেরেস পদক (১৯৯৯); গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাসেলস (২০০০); মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ডক্টর অব হিউম্যান রেটারস, বিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র (২০০০); এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, আফ্রো-এশিয়ান ল'ইয়ার্স ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (২০০০); বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট ডিগ্রি (২০০১); মেডেল অব ডিস্টিংশন, আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব (১৯৯৬-১৯৯৭); ডক্টর অব হিউম্যান লেটারস, ব্যারি ইউনিভারসিটি, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র (২০০৪); কংগ্রেশনাল মেডেল, ম্যানিলা, ফিলিপিনস (২০০৫); ডক্টর অব সাইন্স, পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভারসিটি, মস্কো, রুশ ফেডারেশন (২০০৫); রোটারি ইন্টারন্যাশনার থেকে পল হ্যারিস ফেলো; ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক শান্তি পদক (২০০৯); মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সমজোতার জন্য ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণপদক এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ভারত ২০০৯; সেন্ট পিটার্সবার্গ সেইট বিশ্ববিদ্যালয়, রুশ ফেডারেশন (২০১০) থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি, (২০১০); বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে অবদান রাখার জন্য এশিয়ান ও সোনিয়া কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন থেকে আইটি পুরস্কার (২০১০); জাতিসংঘ কর্তৃক মিলিনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল্ড (২০১০), আন্তর্জাতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য ; সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি (২৩ শে নভেম্বর ২০১০); বিশ্ব মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদানের জন্য 'সাউথ সাউথ' পুরস্কার (১৯ শে সেপ্টেম্বর ২০১১); গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দূরদর্শী নেতৃত্ব, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা, আঞ্চলিক শান্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্চ মোকাবিলায় সচেতনতা

বৃদ্ধিতে অনবদ্য অবদানের জন্য ইংল্যান্ডের হাইস অফ কমনস "গ্লোবাল ডাইভার্সিটি এওয়ার্ড (২৬ শে জানুয়ারি ২০১০); বাংলাদেশে গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য প্যারিসের দফিয়োঁ বিশ্বদ্যিালয় কর্তৃক স্বর্ণপদক (২৬ শে মে ২০১১) এবং বাংলা একাডেমির জীবনসদস্য, বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবে বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ (৩০ শে ডিসেম্বর ২০১১, সম্মানসূচক ডিলিট, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত (১২ই জানুয়ারি, ২০১২)- এ ভূষিত হন।

উপসংহার

শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব সন্ত্রাস দমনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ২০০৯ সালে তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সন্ত্রাস দমনে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। তাই বিগত ২০০২-০৮ সালে বহির্বিশ্বে প্রচারিত নেতিবাচক পরিচয় ছাপিয়ে বাংলাদেশ আজ একটি অগ্রসরমান, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার রক্ষাকারী দেশ হিসেবে বিশ্বপরিমণ্ডলে খ্যাতি অর্জন করেছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন ১৩ ও ১৪ই নভেম্বর ২০১১, বাংলাদেশ সফরকালে জোর দিয়ে বলেছেন উন্নয়নশীল বিশ্বে বাংলাদেশ একটি 'মডেল দেশ'। জার্মান প্রেসিডেন্ট ক্রিশ্চিয়ান ভুলফ ২৮ থেকে ৩০ শে নভেম্বর ২০১১ বাংলাদেশ সফরে এসে বলেছেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি 'স্থিতিশীল নির্ধারক শক্তি'।

বর্তমানে বাংলাদেশে অভাবনীয়ভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। সমাজ-সংস্কৃতি ও গবেষণাও বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণে সফল ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে গঠিত শেখ হাসিনার সরকার কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় প্রভূত পরিমাণ অগ্রগতি সাধন করেছিল। ২০০৯-২০১৩ মেয়াদের কৃষি, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, শিল্প ও সামাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা অর্জনের পথে। শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য ২০১০ সালে জাতিসংঘ পুরস্কার এবং নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি সফল ব্যবহারের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১১ সালে জাতিসংঘ 'সাউথ সাউথ' পুরস্কার অর্জন করে। কৃষিঋণ, কৃষি উপকরণ, সার, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সহায়তার কারণে ২০১১ সালে খাদ্য উৎপাদনে রেকর্ড পরিমাণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে; এমনকি বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ

হবার পথে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নত করতে পারলে এদেশ থেকে দারিদ্র ও ক্ষুধা একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতিসংঘের বাংলাভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। এতে করে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক বন্ধন ঘটে এবং এ দাবি আরো জোরদার হয়। এ ছাড়া ২২ শে ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জাতিসংঘের ৬৬তম অধিবেশনের ভাষণে শেখ হাসিনা 'জনগণের ক্ষমতা ও উন্নয়ন শিরোনামের মডেল উপস্থাপন করেন। মডেলটি উক্ত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক মহলের এইসব স্বীকৃতি শেখ হাসিনার দেশপ্রেম ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের ফল।

-আগামী দিনের সুখী-সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন শেখ হাসিনা তাঁর লেখায় কর্ম ও চিন্তায় জাতির কাছে তুলে ধরছেন। তিনি কাজ করছেন নিরলসভাবে তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে শিশু-কিশোর-তরুণ, শিক্ষক-অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবী, সচিব, ব্যবসায়ী, কৃষক-শ্রমিক থেকে শুরু করে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে দেশ গড়ার কাজে। আমরা সবাই মিলেমিশে এক সঙ্গে পুর্ণোদ্যমে যদি কাজ করি তাহলেই কেবল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া সম্ভব হবে। তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখবে সুখী-সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

ড. আতিউর রহমান

মানবকল্যাণে সদা সোচ্চার

এ বছর এক অস্থির সময়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালিত হতে যাচ্ছে। যদিও তিনি তাঁর বাবার মতোই ঘটা করে জন্মদিন পালন করেন না তবুও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছা ঠিকই বইতে থাকে। চলমান রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের প্রেক্ষাপটে এ বছর তাঁর জন্মদিনের সাথে ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের পরিবেশের সাথে পুরোপুরি না হলেও বেশ খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একাত্তরের ঐদিনে বিক্ষুব্ধ বাঙালি পাকিস্তানের নির্মমতা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছিলেন। সেদিন দেশি-বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমার আবার জন্মদিন কি, মৃত্যুদিবসই বা কি? আমার জীবনই বা কি? মৃত্যুদিন আর জন্মদিন অতি গৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন।" সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তাহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এবারে হয়তো রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুঃখ-কষ্টের কথাই তাঁর জন্মদিনে বেশি করে মনে করবেন। ছেলের সাথে নিভৃতে তিনি এ বছর তাঁর জন্মদিন পালন করছেন। দলের নেতা ও কর্মীদের ঘটা করে তাঁর জন্মদিন পালন করতে মানা করে দিয়েছেন। এবারের সময়টাও বিক্ষুব্ধ। বিপন্ন মানবতার প্রেক্ষাপটে অস্থির এই সময়ে তিনি উদ্বিগ্ন। অবিশ্যি, এরই মধ্যে জগৎসভায় তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ঘিরে যে মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে তা উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরেছেন।

জাতিসংঘের মহাসচিবসহ বিশ্বের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ তাঁর কথা শুনেছেন এবং এই মানবিক বিপর্যয় বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এরই মধ্যে খবর এসেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ নিরাপত্তা পরিষদের সাতটি সদস্য দেশ রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে বিশেষ একটি অধিবেশনের ডাক দিয়েছে। কয়েকদিন আগেও নিরাপত্তা পরিষদ এ বিষয়ে সর্বসম্মত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে (যেমনঃ অ্যামেনেস্টি

ইন্টারন্যাশনার) তারা নিয়মিতভাবে রাখাইন অঞ্চলে যে অগ্নিসংযোগ ঘটছে, মানবাধিকার লজ্ঘিত হচ্ছে সেসবের প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। আন্তর্জাতিক অপরাধবিষয়ক কৌশলগত ফোরাম আইসিএসএফ সেপ্টেম্বর (২০১৭) এক বিবৃতিতে মায়ানমারে চলমান 'গণহত্যা'র নিন্দা জানিয়েছে এবং বিশ্বসম্প্রদায়কে রুখে দাঁড়াতে বলেছে। বাংলাদেশে যেভাবে শরণার্থীদের সামলাচ্ছে তারা তারও প্রশংসা করেছেন। গণমাধ্যমগুলোও ইতিবাচক খবর ছাপছে।

সর্বশেষ বিশ্বখ্যাত 'দি ইকোনমিস্ট' লিখেছে: রুয়ান্ডার চেয়েও বেশি হারে রোহিঙ্গা শরণার্থীর বিগত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশে ঢুকেছে। আলজাজিরা, বিবিসি, সিএনএন, এনডিটিভি নিয়মিত খবর প্রকাশ করছে। ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেল এনডিটিভি শরণার্থীদের কাদামাখা পায়ের ছবি দেখিয়ে প্রতিবেদন প্রচার করেছে যে, কি নিদারুণ কষ্ট করেই না শরণার্থীরা বাংলাদেশে এসেছে। নিজেদের সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও বাংলাদেশ এসেছে। নিজেদের সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও বাংলাদেশ এসব দুঃখী মানুষকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিচ্ছে। শুরুতে খানিকটা বিশৃঙ্খলা থাকলেও এখন শরণার্থী শিবিরে শৃঙ্খলা ও স্বস্তি ফিরে এসেছে। সেনাবাহিনী দায়িত্ব নিয়েছে। নানা দেশ থেকে ত্রাণ আসছে। কিন্তু বিদেশি ত্রাণের জন্যে বাংলাদেশ বসে থাকেনি। মানবকল্যাণে উচ্চকণ্ঠ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছুটে গেছেন রোহিঙ্গা ত্রাণ শিবিরে। নিপীড়িত মায়েদের শিশুদের তিনি বুকে আগলে নিয়েছেন। ঐদিন বিদেশি এক সাংবাদিক বঙ্গবন্ধু কন্যাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এই রোহিঙ্গাদের আপনি কতদিন রাখবেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "কতদিন? এরা সবাই মানুষ।" অন্য আরেক জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের যা আছে তাই আমরা শরণার্থীদের সাথে ভাগ করে খাবো। আর একারণেই বন্ধুবর শিশুসাহিত্যিক ও শিক্ষক মুহম্মদ জাফর ইকবাল হালে এক কলামে লিখেছেন, "পৃথিবীর সবাই লাভক্ষতির হিসাব করছে! আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই লাভক্ষতির হিসাব করেননি। একেবারে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, তিনি মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। " (দেখুন বাংলাদেশ প্রতিদিন, 'মানুষ মানুষের জন্য', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

শুধু জাফর ইকবাল কেন, যাদের জন্যে তিনি দুঃসাহসী ও মানবিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছেন তাদের মুখেও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে। ২৩ সেপ্টেম্বরে (২০১৭) 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' এক নজরকাড়া প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী কেন্দ্র খাদিজা (২০) নামের এক তরুণী এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। ঐ সন্তানের নাম রাখেন 'শেখ হাসিনা'। খাদিজার মা আলুম বাহার বলেন, " বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আছে। এমনকি খাদিজার মেয়ে পৃথিবীর আলো বাতাস পাচ্ছে শেখ হাসিনার কারণেই।" খাদিজা আরো খানিকটা বিস্তারিতভাবে বলেন, "রাখাইন রাজ্য গিয়ে ছারখার করে দেয়া হয়েছে। মিয়ানমার থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে এসেছি। বাঁচার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে গেছি শুধু গর্ভের সন্তানকে বাঁচানোর জন্য। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার মেয়ের নাম ' শেখ হাসিনা রেখেছি।

স্বামী নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন । মায়ের হাত ধরে এদেশে এসেছেন খাদিজা। তাঁর বাবাকেও হত্যা করা হয়েছে। নবজাতক "শেখ হাসিনা "খাদিজা ও তার মায়ের 'বেঁচে থাকার আশা"। তাকে পেয়ে তাদের সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে। এখন শেখ হাসিনার জন্যই তাদের বেঁচে থাকার লড়াই। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় খাদিজা ও তার মায়ের এই কৃতজ্ঞতাবোধকেই তার অনানুষ্ঠানিক জন্মদিনের সবচেয়ে বড় উপহার হিসেবে গ্রহণ করবেন।

'দুঃসহ স্মৃতি তাড়া করছে ওদের'শিরোনামে ২৩ সেপ্টেম্বরের (২০১৭ 'দৈনিক সমকালের এক প্রতিবেদনেও মোহাম্মদ উল্লাহ ও তার স্ত্রী দিলারা বেগম, সব হারিয়ে দুঃখী জুলেখার (৪৮) বারে বারে আত্মহত্যা করার চেষ্টাসহ মায়ানমার সরকারের নানা নিষ্ঠুরতার বর্ণনা ফুটে উঠেছে। শরণার্থীদের এমন লাখো দুঃখগাথা শুনে আমরা অবাক হইনি। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রধানমন্ত্রীও অবাক হয়নি। তিনিও সব হারিয়ে পঁচাত্তরে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে ছয় বছর ধরে পরদেশে এক অনিশ্চিত জীবন অতিবাহিত করেছেন। একাত্তরে এক কোটিরও বেশি মানুষ পাকিস্তানি সেনাদের ভয়ে শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কয়েক লক্ষ শরণার্থী রোগ-শোকে প্রাণ দিয়েছেন ঐ শিবিরেই। তাই হঠাৎ করে বাস্তুচ্যুত মানুষের দুঃখ আমরা বুঝি। সেখানেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে পাঁচ

দফা দাবি তুলে ধরেছেন এদের দুঃখ মোচনের জন্য। এদের তাদের মাতৃভমিতে ফেরৎ নেবার জন্য তিনি বিশ্বসভায় আহ্বান জানিয়েছেন।

জাতিসংঘে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের গুরুত্ব মনে হয় অনেকেই অনুধাবন করতে পারছেন। কফি আনন কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নসহ তিনি সুনির্দিষ্ট পাঁচ দফা প্রস্তাব রাখেন। নিরাপত্তা পরিষদের সাত সদস্য যাদের মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রও রয়েছে, এরই মধ্যে জাতিসংঘের মহাসচিবকে এক বিশেষ অধিবেশনের পুরো রোহিঙ্গা সংকটটি ব্যাখ্যা করতে আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক কমিশনার (ইউ এইচ সি আর) শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে বলেছেন, রাখাইনে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে এবং শরণার্থীদের ফেরৎ নিতে হবে। যুক্তরাজ্য মিয়ানমার সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটেও মিয়ানমারের মানবাধিকার লজ্ঘনের বিষয়ে কথা চালাচালি শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে মিয়ানমার সেনাপ্রধানকে টেলিফোনে সন্ত্রাস বন্ধের আহ্বান করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক'দিন আগে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে আলাপ করেছেন। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এ প্রশ্নে যথেষ্ট সোচ্চার। এই বাস্তবতায় মিয়ানমারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে নিউইয়র্কে দেখা করেছেন এবং দ্বিপক্ষীয় আলাপ শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলার অং সান সুচি সুর নরম করে শরণার্থী ফেরৎ নেবার কথা বলেছেন। তবে তাতে যাচাই বাছাইয়ের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। একদিকে মিয়ানমারের ওপর বিশ্ব নেতৃবৃন্দের চাপ বাড়ছে, অন্যদিকে রাখাইনে এখনও আগুন জ্বলছে। তাই বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার কোনো বিকল্প নেই। তবে আশার কথা, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে বিশ্ববাসী সাড়া দিতে শুরু করেছে।

একটু গভীরভাবে যদি তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের দিকে তাকান তাহলেই বুঝতে পারবেন তিনি বরাবরই পিছিয়ে পড়া মানুষদের পক্ষে। তাঁর আমলে নেয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এমডিজি এসডিপি বাস্তবায়নের নীতি কৌশল, অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষক, ক্ষুদে ও মাজারি উদ্যোক্তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি গ্রহণে তাঁর যে অনুপ্রেরণা আমরা (কেন্দ্রীয়

ব্যাংকাররা) পেয়েছি তাতে প্রধানমন্ত্রীর জনকল্যাণী ভাবনার প্রতিফলন লাভ করেছি। দক্ষিণ বাংলায় জলবায়ু পরিবর্তনের চাপে দারিদ্র্য বেড়েছে। আর সে কারণে নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের সাহসী পদক্ষেপ নিতে তিনি দ্বিধা করেননি। সামান্য পিছপা হননি। কেননা তিনি জানেন, এই সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণ বাংলায় শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। আর তার ইতিবাচক প্রভাব সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার ওপর পড়বে।

এবারে জাতিসংঘের একটি অনুষ্ঠানে তিনি সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার কথাও বলেছেন। হোলি আর্টিজানের মর্মান্তিক সন্ত্রাসী হামলার পর যখন পুরো জাতির মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশ ছেড়ে যাবার কথা ভাবছিলেন, তখন তিনি দশ হাতে এই মানবতার শত্রুদের দমনে নেমে পড়েন। আর কে না জানেন ধর্মীয় উগ্রবাদী এই সন্ত্রাস দমনে কতটা সফল। সবমিলে তিনি আজ আমাদের শুধু জাতীয় নেতাই নন, বিশ্ব নেতাও বটে। " আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে ক্রমেই তিনি নিয়ে যাচ্ছেন অনন্য উচ্চতায় এবং বিশ্বে তিনি নন্দিতও হচ্ছে সেইভাবে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছেন তাঁর নানামুখী দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের কারণে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্ত বায়নের মাধ্যমে। (মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, গণতন্ত্রের বহ্নিশিখা শেখ হাসিনা, ২০১৬, পৃ.২১)। একই সুরে প্রবীণ সাংবাদিক সাহিত্যিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ঐ একই প্রকাশনায় লিখেছেন, "আমার বিশ্বাস, হাসিনার শাসনামল একদিন অতীতের হোসেনশাহী শাসনামলের মতো বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে সংযুক্ত হবে।" (ঐ পৃ.৩৩)। সমাজবিজ্ঞানী অনুপম সেনের মতে, "শেখ হাসিনা একইসঙ্গে বজ্রের মতো কঠিন-কঠোর ও ফুলের মতো কোমল নেত্রী।

তিনি পিতৃ-মাতৃহীন শিশু, বঞ্চিত শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে যেমন কেঁদে আকুল হন, তেমনি মানবতা-বিরোধী গণহত্যাকারীরা, তাঁর চেনামানুষ হলেও, তারা যখন তাদের কৃত-অপরাধের জন্য যোগ্য শাস্তি পায়, তখন তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে তা অনুমোদন করেন। " (ঐ, পৃ.১৮১)। গণতন্ত্রের বহ্নিশিখা শেখ হাসিনা' বইটিতে এদশের প্রধান প্রধান চিন্তকরা লিখেছেন, আমি লিখেছি তাঁর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতি কৌশল বিষয়ে।

এই অল্প পরিসরে তাঁদের মূল্যায়ন তুলে ধরতে আমি অক্ষম। শেষ করছি একজন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত সফল এক কথাসাতিহ্যিক হরিশংকর জলদাসের অনুভূতির কথা তুলে ধরে। ২০১৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় সার্ক লিটারারি ফেস্টিভ্যাল। উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চট্টগ্রামে যারা সমুদ্রে মাছ ধরে তাদের জীবন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন হরিশংকর জলদাস তাঁর 'দহনকার' উপন্যাসে। এই উপন্যাসকে জীবনমুখী সাহিত্য উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন, "এই উপন্যাসটি পড়ে আমি অনেক কিছু বুঝেছি, অনেক কিছু জেনেছি।" এ কথা শুনে হরিশংকর মুখরিত হয়ে ওঠেন। তাই তিনি লিখেছেন, "বর্ণহীন আমি। প্রান্ত সমাজে আমার জন্ম। চারপাশের মর্যাদাবান সমাজের মানুষরা সর্বদা আমাদের কানের কাছে বলে গেছে-ব্রাত্য তোরা, মন্ত্রহীন। তোদের লেখাপড়ার অধিকার নেই। তোরা মাছ ধরবি আর মাছ বেচবি। কিল-গুঁতা-ঘুষিই তোদের জন্য উপহার। ... সেই অন্ধকারের মানুষটির সম্পর্কে শেখ হাসিনার একি উচ্চারণ। এ রকম মূল্যায়ন আমার! সেই সময় নতুন করে আমার বাঁবার ইচ্ছা জাগল।... আমরা ব্রাত্য নই, ঘৃণারও নই। ... বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের ভালোবাসেন। আমার মতো অতি সাধারণ একজন মানুষের উপন্যাস পড়ে তিনি আপ্লুত হন; আবৃত হন। (৩১৪-১৫, হরিসংকর জলদাস)।

আর এভাবেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হয়ে যান মমতাময়ী এবং মানবকল্যাণে ব্রতী এবং অনন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক। তিনি তাঁর মানবকল্যাণী নীতি ও কর্মকাণ্ডের জন্যে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার, জাতিসংঘের আইসিটি পুরস্কার, ইউনেস্কোর 'ট্রি অব পিস' পুরস্কার, প্ল্যানেট ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি পুরস্কারসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রবক্তা শেখ হাসিনার বিশ্বমঞ্চে সরব উপস্থিতি সকলেরই চোখ পড়ছে। আমরা প্রত্যাশা করি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আরো অনেকটাই পথ পাড়ি দেবেন। শান্তি অন্বেষায় তাঁর এই অভিযাত্রা সফল হোক।

ড.আবুল হাসনাৎ মিল্টন

শেখ হাসিনা : উত্তাল সমুদ্রে প্রতিকূল স্রোতের মাঝি

বাংলাদেশটা অনেক বদলে গেছে। একাত্তরের আগের পূর্ব পাকিস্তানের মানুষগুলোর সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষগুলোর অনেক তফাৎ। সেদিনের মুক্তিকামী সেই মানুষগুলোর সাথে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত জনগণের অনেক অমিল। সেদিন জীবনের শীর্ষে ছিল নৈতিকতা, সততা, ত্যাগের মত মহিমান্বিত মানব গুণাবলী। আর আজ অর্থ হয়েছে সবকিছুর নির্ধারক। কালো টাকা আছে তো সে এই সমাজের মধ্যমনি। কজনই বা টাকার রং জানতে চায়? বৈধ না অবৈধ পথের উপার্জিত এই অর্থ তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা শুধু টাকা দেখি, টাকার জৌলুষ দেখি এবং টাকার তরে নত হই। অর্থ আজ আর সকল অনর্থের মূল নয়, বরং অবারিত ক্ষমতার ভিত্তি। আজ আমরাও স্বাধীনতা পেয়েছি সত্যি, কিন্তু তার চেয়েও সত্যি হল আমরা ক্রমশ উল্টোপথে হেঁটেছি বহুকাল। কবে থেকে এমন বদলে যাওয়া শুরু বাংলাদেশের?

পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে জেঁকে বসা জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনই সর্বপ্রথম অধপতনের বীজ বুনেছে স্বদেশের বুকে। রাজনীতিকে রাজনীতিবিদদের কাছে কঠিন করার লক্ষে কোরবানির হাটের মত রাজনীতির হাটেরও শুরু হয়েছে নেতার কেনাবেচা। ত্যাগই যে রাজনীতিবিদদের কাছে ছিল একমাত্র প্রার্থনা, তাদের প্রলুদ্ধ করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে ক্ষমতাসীন দলে এনে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে ভোগের সাগরে। সামরিক শাসন খুব ভাল করেই জানত যে একটি দেশের ভবিষ্যত ধ্বংস করতে হলে তার রাজনীতিকে ধ্বংস করে দিতে হয়। একটি দেশের ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে হলে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে তছনছ করে দিতে হয়। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান নিপুণ হাতে এই ধ্বংসাত্মক কাজগুলো করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গেছেন প্রমোদ ভ্রমণে। আহ! উচ্ছন্নে যাবার পথে কী চমৎকার হাতছানি! ক্ষমতা সুসংহত করবার জন্য সেনা

ছাউনিতে বইয়েছেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে রাজাকারদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছেন, অন্যতম শীর্ষ রাজাকার শাহ আজিজকে বানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। উত্তরসূরীর পথ বেয়ে দেশের আরো বারোটা বাজিয়েছেন তার পরবর্তী সামরিক শাসক হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। দীর্ঘ সামরিক শাসনের বিষে শীল হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ আজো তার মাশুল দিয়ে যাচ্ছে এই যে চারিদিকে এত অনাচার-অনৈতিকতা, দুর্নীতি-সন্ত্রাস, তার একটা বড় অংশই সামরিক শাসনের ঔরসজাত। গত বিশ বছরের গণতান্ত্রিক শাসনের অর্ধেক সময় আবার এই সামরিক। শাসনেরই ছায়াকাল। ফলে বাংলাদেশে রাজনীতি গণমুখী হয়ে তেমন দাঁড়াতেই পারছে না।

এরকম প্রতিকূল সময়েই, ১৯৮১ সালের ১৭ মে, মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব নিয়ে ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে বাংলাদেশে ফিরেছিলেন পিতা-মাতাসহ প্রিয় স্বজন হারানো বঙ্গবন্ধুকন্যা, আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি এমন একটা সময়ে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন যখন জিয়াউর রহমানের কল্যাণে রাজনীতি ইতিমধ্যে 'ডিফিকাল্ট' হয়ে গেছে। পাকিস্তানের সামরিক শাসন যেখানে আমাদের রাজনীতিবিদদের করেছে আরো শাণিত, সেখানে স্বদেশী জিয়া মডেলের সামরিক শাসন আমাদের রাজনীতিবিদদের করেছে হাটের পণ্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মেয়ে হলেও তার সাথে শেখ হাসিনার কোন তুলনা চলে না। বঙ্গবন্ধু এতটাই বিশাল, নিজেই একটা সমগ্র ইতিহাস। কিন্তু তারপরও শেখ হাসিনার নেতৃত্বের স্বাতন্ত্র হল, রাজনৈতিক পরিবেশেই বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছেন, যেখানে রাজনীতি তার নিজস্ব সূত্র মেনে চলত। কিন্তু শেখ হাসিনা রাজনীতি করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রাজনৈতিক পরিবেশে, যেখানে স্বদেশ চলেছে উদ্ভট উঠের পিঠে চড়ে। কোথাও কোন প্রচলিত সমীকরণ নেই। এমন একটা পরিবেশে সবকিছুর সাতে মানিয়ে নিয়েই তাকে দলের নেতৃত্ব দিতে হয়েছে, হচ্ছে। কখনো কখনো রাজনৈতিক রণকৌশল হিসেবে দু'পা এগনোর জন্য একপা পেছাতেও হচ্ছে। একরণেই আমাদের অনেকে মাঝে মধ্যে ঢালাওভাবে বলে ফেলেন

বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ আর শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ এক নয়। কিন্তু মন্তব্যটা করার সময় আমরা খুব একটা প্রেক্ষিত বিবেচনায় নেই বলে মনে হয় না। মাঝেমধ্যেই আমরা ভুলে যাই অনেক বেশি প্রতিকূল স্রোতে নৌকার হাল ধরে আছেন শেখ হাসিনা তাকে বিশ্বরাজনীতির বাস্তবতা মাথায় রাখতে হয়, জাতীয় রাজনীতির নষ্ট অতীত মনে রাখতে হয়, এবং এসব বিবেচনায় রেখেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হয়। দিনের শেষে তাই আমরা দেখি, এখনো বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, প্রগতির পক্ষের ধারায় শেখ হাসিনাই প্রধান নেত্রী, আমাদের আশা-ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল। সব সময়েই শেখ হাসিনার রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে এদেশের দরিদ্র মানুষের মুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও আশ্রয় নিশ্চিত করা তার রাজনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নমুখী শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন করতে, কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মধ্যদিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সবার কাছে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে তার সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের সামগ্রিক সংগ্রামে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি গড়ে তুলতে চান ডিজিটাল বাংলাদেশ, যেখানে দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের দিনগুলো বদলে যাবে দ্রুত। একারণেই তার সরকারকে বলা হয় দিন বদলের সরকার। সময়ই বলে দেবে দিন বদলের সংগ্রামে তিনি বদলের সংগ্রামে তিনি কতটা সফল, তবে তিনি যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন তা প্রকাশ্য দিনের আলোর মতই দৃশ্যমান।

তার বর্তমান নেতৃত্বের কালেই পৃথিবীব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেকখানি উজ্জ্বল হয়েছে। বিশেষ করে বিগত জামায়াত-বিএনপির আমলে জঙ্গীবাদও সন্ত্রাসের যে কালিমা লেগেছিল দেশের ললাটে, তা পুরোপুরিই দূর হয়েছে। বরং জনগণের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা, শিশু-মাতৃ মৃত্যু হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়নে তার সরকারের সাফল্য বিশ্ব নেতত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার প্রস্তাবিত শান্তির দর্শন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে। এসবই জননেত্রী, রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার সাফল্যের মুকুটে এক একটি পালক যোগ করছে, আর বাঙালি হিসেবে আমাদের করছে গর্বিত।

বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে একটা বিধ্বংসী ট্রেন্ড-চালু হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের সন্তানেরা তাদের বাবা-মার নাম ভাঙিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পুত্রদ্বয়ের দুর্নীতির অভিযোগতো বিদেশের আদালতেই প্রমাণিত। এরকম নষ্ট ধারার বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সন্তানেরা আপন কৃতিত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল। প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের অটিজম সম্পর্কিত সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী প্রচুর মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তরুণ কম্পিউটার বিজ্ঞানী, পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় সুদূর আমেরিকা থেকে মায়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে সহায়তা প্রদান করে চলেছেন। কেবল রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবেই নয়, মা হিসেবেও তাই তিনি ঈর্ষনীয়ভাবে সফল। কেবল নিজের সন্তানই নয়, যখনই কোন সন্তান বিপন্ন হয়েছে, মা হিসেবে তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন স্নেহের কোমল দুটি হাত। নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডে সব হারানো মেয়েদের তিনি আপন স্নেহে বুকে টেনে নিয়েছেন, দিয়েছেন মাতৃত্বের উত্তাপ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিশাল কর্মীবাহিনী শেখ হাসিনার এই মাতৃরূপটি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন রোজ।

সময় বাড়ে, সেই সাথে বাড়ে মানুষের বয়স। আশির দশকে কাছ থেকে দেখা প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী থেকে রাষ্ট্রনায়ক। চুলগুলো সাদা হয়েছে, চশমার পাওয়ার বেড়েছে, একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে শ্রবণশক্তি, কিন্তু কমেনি তাঁর মানুষের জন্য হার্দ্য ভালবাসা। এখনো তিনি আমাদের সেই প্রিয় প্রাণবন্ত আপা। প্রতি বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রাকৃতিক নিয়মে তিনি বয়সের একটি সিঁড়ি ভাঙেন ঠিকই, কিন্তু তাতে ম্লান হয়ে যায় না তার ভেতরের কিশোরীসুলভ উচ্ছ্বাস। তিনি আরো পরিণত হন, অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হন।

ড. মুহাম্মদ সামাদ

তুমি জনগণমনন্দিত নেত্রী তুমি ভূমিকন্যা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম এবং ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত ফসল আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা, প্রিয় বাংলাদেশ। তিরিশ লক্ষ শহীদের অমুল্য জীবন আর দুইলক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ যখন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছিল, তখনই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। বিদেশে অবস্থান করায় ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর প্রিয় দুইকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বাঙালি জাতি নিক্ষিপ্ত হয় ঘোর কালো অন্ধকারে। শুরু হয় স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির ক্রমবর্ধমান উত্থান। একে একে ধ্বংস হতে থাকে রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সকল সাফল্য। সামরিক অপশাসনে নিষ্পেষিত প্রিয় মাতৃভূমির সেই ঘোরতর সংকটকালে, ১৯৮০ সালে, মুক্তির বারতা নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান বাবা- মা ভাই-বোন সকল স্বজন হারানোর ব্যাথা- বিষে নীলকণ্ঠ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সকল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে, দীর্ঘ সময় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি সামরিক স্বৈরাচারের নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে মুক্ত করেন বাঙালি জাতিকে। ১৯৯৬ সালে জাতির পিতার ঘৃণ্য খুনিচক্র ও তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা ষড়যন্ত্রকারীদের নির্বাচনে পরাজিত করে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সরকারের নেতৃত্ব দেন একজন সফল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়ায় তার আপন মহিমা, মর্যাদা আর গৌরব নিয়ে। অতঃপর, ২০০১ সালের নির্বাচনে ষড়যন্ত্র ও কারচুপির মধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বিএনপি-জামাত সাম্প্রদায়িক অপশক্তি; এরা প্রতিদিন সন্ত্রাস-ধর্ষণ-লুণ্ঠন-অপহরণ। সংখ্যালঘু নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পরিণত করে এক বিভীষিকাময় মৃত্যু উপত্যকায়; মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পরিপন্থী এক অকার্যকর রাষ্ট্রে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল শক্তিকে চিরতরে নেতৃত্বশূন্য করা লক্ষে, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের ধাবাহিকতায়, ২০০৪

সালের ২১ আগস্ট এই চিহ্নিত অপশক্তি শেখ হাসিনাকে হত্যার হীন উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালায়। মুহূর্তে অসংখ্য তাজা প্রাণ ঝরে যায়। অলৌকিকভাবে রক্ষা পান শেখ হাসিনা। ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রতিক্রিয়ায় ২১ থেকে ২৩ আগস্ট শেখ হাসিনাকে নিয়ে আমি একটি কবিতা/গান রচনা করেছিলাম :

তুমি জনগণমননন্দিত নেত্রী

প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা- জননেত্রী হাসিনা
তুমি জনগণমননন্দিত নেত্রী এই সোনার বাংলার
ভয় নাই বোন, ভয় নাই মা- তোমার ভয় নাই
তোমার জীবন বাঁচাতে আমরা তৈরি রেখেছি প্রাণ
আমরা আছি লক্ষ কোটি মুজিবের সন্তান।

জেগেছে ছাত্র জেগেছে জনতা
জেগেছে কৃষক-শ্রমিক
বিক্ষোভে আর বিদ্রোহে আজ উত্তাল চারিদিক
তোমার নামেই গর্জে ওঠে
ভাইয়ের খুনে
বোনের সম্ভ্রমে
মায়ের কান্নায় পিতার রক্তে
রাঙানো লাল বাংলাদেশ... বাংলাদেশ
তুমি আজ তাই আলো হাতে আঁধারের যাত্রী।

জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে
রুখেছি গুলি বন্দুক বোমা
এইবার হবে খুনিদের দিন শেষ... খুনিদের দিন শেষ
তোমার ডাকে তোমার সাথে বাঙালির পথ চলা
তোমার ডাকেই মুক্ত হবে মৃত্যুপুরী এই ক্ষুব্ধ বন্দিশালা
আকাশে বাতাসে দিকে দিকে শুনি
তোমার জয়ধ্বনি ... তোমার জয়ধ্বনি

তুমি জনগণমননন্দিত নেত্রী এই সোনার বাংলার।
প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা-জননেত্রী হাসিনা
তুমি জনগণমননন্দিত নেত্রী এই সোনার বাংলার
ভয় নাই বোন, ভয় নাই মা-তোমার কোনো ভয় নাই
তোমার জীবন বাঁচাতে আমরা তৈরি রেখেছি প্রাণ
আমরা আছি লক্ষ কোটি মুজিবের সন্তান ।।

পরের ঘটনা আমাদের অজানা নয়। তথাকথিত ১/১১-এর ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশের জনগণের নেত্রী শেখ হাসিনাকে প্রথমে তার প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরতে বাধা দেয়; পরে অসংখ্য মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলায় কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা, বাঙালির নেত্রী শেখ হাসিনা, বাঙালির পিতা মুজিবের মতোই কোনো ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের কাছেই মাথা নোয়ান নি। জোর করে বিদেশে রাখার অপচেষ্টা, বন্দি জীবনের একাকিত্ব ও অসুস্থতা তাঁকে এতটুকু দমাতে পারে নি। দলের বাঘা নেতাদের ভীরুতা, আত্মস্বার্থপরতা ও দায়িত্বহীনতার মধ্যেও অগণিত সাধারণ নেতা-কর্মী আর দেশের মানুষের প্রতি তার অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস ছিল দৃঢ়।

যাই হোক, বন্দি শেখ হাসিনার সেই কষ্টের দিনে, আজকের আইন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট কামরুল ইসলাম নেত্রীর মুক্তির লক্ষ্যে দূতাবাসগুলোতে প্রেরিত স্মারকলিপির ইংরেজি অনুবাদের জন্যে নগর আওয়ামীলীগ-কর্মী নাঈম নোমানের মাধ্যমে আমার কাছে পাঠাতেন। আমি আনন্দের সঙ্গে তা অনুবাদ করে দিতাম। বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দিপুমনি,যিনি দেশে-বিদেশে শেখ হাসিনার মুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, প্রতিনিয়তই এসএমএস-এর মাধ্যমে ও মাঝে-মধ্যে ফোনে খোঁজ-খবর রেখেছেন। অসুস্থ আওয়ামী লীগ নেতা ও বায়দুল কাদের পিজি হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে একদিন ফোনে আমাকে বললেন, ... সামাদ, তোমরা আপার জন্য কিছু করো, আপার ওপর এত অত্যাচার-নির্যাতন আর সহ্য হচ্ছে না। আত্মগোপনে থেকে যুবলীগ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির নানক আমাকে একাধিকবার টেলিফোনে বলেছেন- ....সামাদ ভাই, এই দুঃসময়ে আপনারা যা করছেন, সেই ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না। তিনিও শেখ হাসিনার মুক্তির জন্যে কাজ করতে বলেছেন। সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে এমন ত্রাসের সঞ্চার করেছিল যে, সেই

দুঃসময়ে তাকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়ার প্রতিবাদে সর্বসাকুল্যে ৩১ জন নাগরিকের একটি বিবৃতি এবং গ্রেফতারের পর ৩৪ জনের আরেকটি বিবৃতির পক্ষে মত জোগাড় করতে গিয়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস ও কবি-শিশুসাহিত্যিক আসলাম সানী ছাড়া প্রত্যাশিত অনেককেই আমরা সক্রিয়ভাবে পাইনি। অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই, বিবৃতি দুটি লিখার ও স্বাক্ষর করে প্রত্রিকায় পাঠানোর দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সংস্কৃতিকর্মী গোলাম কুদ্দুস এবং আমাকে।

শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচি পালন এবং সেনা-সদস্যদের সাথে আগস্টের অপ্রীতিকর ঘটনায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নিমর্ম নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় সামরিক বাহিনী ড. হারুন অর-রশিদ ও ড. আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে। তখন আমি নীল দলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী । আমাদের মূল লক্ষ্য ও বিশ্বাস ছিল যে , শিক্ষক সমিতিতে নির্বাচিত হলে শেখ হাসিনার মুক্তির জন্য আন্দোলন জোরদার ও জনমত তৈরি করা সহজ হবে। কিন্তু সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গোয়েন্দা রিপোর্টের মাধ্যমে আমাদের বিজয় নিশ্চিত জেনে সম্পূর্ণ বেআইনি ও অন্যায়ভাবে নির্বাচন বন্ধ করে দেয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন বন্ধের এটি ছিল দ্বিতীয় নজির । তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের নেতৃত্বে তৎকালীন প্রশাসন সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান তল্পিবাহক হয়ে কাজ করে এবং নানা অজুহাতে ছাত্র শিক্ষকদের মুক্তির প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে। সামরিক গোয়েন্দাদের যোগসাজশে শিক্ষক সমিতির বিএনপি- জামাত সমর্থিত তখনকার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক তাজমেরী ইসলাম সরকারের সাথে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ এবং আমাদের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখে, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের কিছু সাহসী তরুণ শিক্ষকের উদ্যোগে তলবি সভা করে, সাধারণ শিক্ষকদের সমর্থনে ছাত্র-শিক্ষক মুক্তি ও সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারবিরোধী আন্দোলন জোরদার করি। জনান্তিকে বলে রাখা ভালো যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সামরিক বাহিনী অন্যায়ভাবে গ্রেফতার

করে রিমান্ডে নিলে রাশেদ খান মেননের ওয়ার্কার্স পার্টি ও হাসানুল হক ইনুর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল তাদের মুক্তি দাবি করে বিবৃতি দিলেও, সে সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নীরব ভূমিকা নিঃসন্দেহে আমাদের বেদনাহত করেছে। অথচ বন্দি অবস্থায়ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ২০০৭ সালের ১৩ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ ভবনের বিশেষ ট্রাইবুন্যালে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এভাবে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়ার বিষয়টি জাতি মানবে না বলে মন্তব্য করে আমাদের মনোবল দৃঢ় রাখতে প্রবল সাহস যুগিয়েছিলেন।

আত্মপ্রচারের মতো শোনালেও, সত্য প্রকাশের তাগিদে কয়েকটি কথা আমি না বলে পারছি না । ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের পর, কেন জানি না, আগস্টের প্রথম সপ্তাহে সামরিক গোয়েন্দাদের একটি দল তাদের একজন এসআই-এর মাধ্যমে বারবার চেষ্টা করে সর্বপ্রথম আমার সাথে বৈঠক করে। প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার দীর্ঘ আলোচনায় সারকথা হিসেবে আমি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেষ হাসিনাকে মুক্তি দিয়ে তাদের ওপর ওয়ালাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাবার পরামর্শ দিতে বললে তারা হতাশ হয়ে ফিরে যান। তাদের দ্বিতীয় বৈঠক হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাওয়ার বিল্ডিঙে এবং সেদিনই অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ ও অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন গ্রেফতার হন। তারপর আরো একাধিকবার এই ডিজিএফআইয়ের কর্নেলরা আমার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা নানা আলোচনা ও আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। আমার নিত্যদিনের চলা-ফেরা অনুসরণ করে প্রায় প্রতিদিনই টেলিফোনে নিদারুণ মানসিক যাতনার মধ্যে রেখেছেন। নানা প্রলোভনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সর্বশেষ, সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের লোক বলে পরিচয় দিয়ে বিদেশ শিক্ষিত এক তরুণ আমার সাথে দেখা করে এবং সে আমাকে জানায় যে, সরকার ও সামরিক বাহিনীর একটি বড়ো অংশ শেখ হাসিনার দ্রুত মুক্তি চায় ; কাজেই, আমি যদি সরকারের কেনো গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দিয়ে, সরকারের ভিতর থেকে শেখ হাসিনার মুক্তির জন্যে কাজ করি তাহলে সেটা অধিক ফলপ্রসু হবে। আমি বারবারই শেখ হাসিনাসহ ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিকদের মুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশকে ফিরিয়ে নেয়া ছাড়া আমার আর কোনো চাওয়া নেই বলে জানিয়ে দিয়েছি (এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, সেই সামরিক গোয়েন্দা দলের মধ্যে দুই বিনয়ী কর্নেল এখনো আমার খোঁজ-খবর নেন)

। অসীম কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি, সে সময় পুরনো ঢাকার গলি-ঘুপচিতে দিনের পর দিন আমাকে রাতযাপনে আশ্রয় আর খাদ্য দিয়ে সচল রেখেছিলেন জাতীয় কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কবি আসলাম সানীর পরিবার।

সেই ভয়ার্ত সময়ে শেখ হাসিনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির আন্দোলনে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী প্রভূত সাহস যুগিয়েছেন; অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক , ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক নুরুর রহমান খান, ড. নাজমা শাহীন, ড. জীনাত হুদা, ড. অহিদুজ্জামান চান, ড. একে এম গোলাম রব্বানী, তরুণ প্রভাষক মোহাম্মদ বাহাউদ্দিনসহ অনেকে সার্বক্ষণিক পাশে থেকেছেন। প্রথম দিকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ গড়ে তুললে ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অপর্ণা পাল, শামসুল কবির রাহাতসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হলে তারা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়। তখন প্রতিদিনই কোনো-না -কোনো কর্মসূচি দিয়ে সোহেল রানা টিপু, সাজ্জাদ সাকিব বাদশা, আশরাফুল আলম ব্যাকুল, জসিম উদ্দিন ভুঁইয়া প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের কর্মীরা শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে সোচ্চার থেকেছে; এবং পরের দিকে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দমন-পীড়ন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহতকরণ ও সামরিকায়নের বিরুদ্ধে অধ্যাপক এমএম আকাশ, অধ্যাপক শফিক উজ জামান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক কেএএম সাদ'উদ্দিন, অধ্যাপক শাহাদত আলী, অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল প্রমুখ ও একঝাঁক তরুণ শিক্ষক আন্দোলন-প্রতিবাদে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে না এলে জাতির বুকের ওপর চেপে বসা ১/১১-এর জগদ্দল পাথর আজ সরানো যেত কিনা সে সন্দেহ থেকেই যায়। সর্বক্ষণ আমার হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে এ সব কিছুর পেছনে মূল প্রেরণা ছিল শেখ হাসিনার অসম সাহস , প্রজ্ঞা ও চিরউন্নত শিরঃ আর গাজী ভাইয়ের সেই আমোঘ বাণী- 'আমাদের এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে শেখ হাসিনাকে রক্ষা করা।' শেখ হাসিনা বাঙালির ভালোবাসায় সিক্ত আমাদের সবুজ-শ্যামল প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিচ্ছবি। শেখ হাসিনা মৃত্যুঞ্জয়ী।

দেশ-বিদেশের প্রায় ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শেখ হাসিনার সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিলাভ, বিশ্বভারতীয় দেশিকোত্তম, বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্কার সেরেস পদক, ইউনেস্কোর ফেলিক্স হোফে শান্তি পুরস্কার , মহান একুশে ফেব্রুয়ারি-কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে মহিমান্বিত করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদন, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তত্ত্বাধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; এবং বারবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, সামরিকায়নের বিপরীতে বাংলাদেশেরসহ দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের উন্নয়নের ও বহুত্ববাদ বিকাশে অবদানের জন্যে ও বছর ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়া- সবই বড়ো বড়ো অর্জন বৈকি। শেখ হাসিনা, বাঙালির জাতির জনক ও তার চিরস্নেহভরপুর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মমতাময়ী মা বেগম ফজিলাতুননেসা মুজিব, স্নেহভেজা আপন তিনভাই-ভাতৃবধূদ্বয়-শেখ কামাল -শেখ জামাল-শেখ রাসেল-সুলতানা কামাল-রোজী জামাল, একমাত্র চাচা শেখ নাসের, মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন-ভাবী আর আপনজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে প্রতিহিংসার বদলে কী অসীম সহনশীলতায় প্রচলিত আইনে দীর্ঘ তেরো বছর সময় নিয়ে ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার করেছেন; প্রাজ্ঞ রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার সে এক মহাত্মা কীর্তি।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর স্বপ্ন নিয়ে শেখ হাসিনা ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা, দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যুহার হ্রাস করা, অসহায় দুঃস্থ-বিধবা-বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্যে খাদ্য-ভাতা-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুতে উৎপাদন ও অবকাঠামো উন্নয়নে প্রভূত অগ্রগতি, জঙ্গিবাদ নির্মূলে সফলতা অর্জন, জাতিসংঘে জনগণের ক্ষমতায়ন ও শান্তির মডেল উপস্থাপন-এসব অমর কীর্তি তাকে এক অসামান্য বিশ্বনেত্রীর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে, শেখ হাসিনার লেখা বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রে জন্ম, সবুজ মাঠ পেরিয়ে, ওরা টোকাই কেন? বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্যে উন্নয়ন প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করলে গণতন্ত্র ও বঞ্চিত জনসমাজের প্রতি তার হৃদয়মথিত ভালোবাসার ছবি আমাদের মানসপটে প্রতিমুহূর্তে ভেসে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে বলেছেন-স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

একমাত্র বঙ্গবন্ধুর মতো নেতার বেলায় রবীন্দ্রনাথের এই বাণী যেমন অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশের মুলধারার রাজনীতির মূল্যবোধগুলো ধারণ করে সকল মতের মানুষকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। তাই, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে রচিত আমার একটি সুন্দর কবিতা দিয়ে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিদেবন করতে চাই :

তুমি ভূমিকন্যা

আমাদের স্বপ্নগর্ভা গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায়
তোমার জন্ম। জন্মগ্রামের প্রতিটি
ধুলিকণা কাদামাটি গায়ে মেখে
বাইগার নদীতে সাঁতার কেটে বৃষ্টিজলে হেঁটে হেঁটে
রাজপথে সংগ্রামে মুক্তির মিছিলে মিশে
আশৈশব তুমি আছো মানুষের পাশে;
এই বাংলা তোমাকে ভালোবাসে।

আবহমান বাংলার শ্যামল রমণী তুমি-
পাখিরা তোমাকে দেখে ঘুম জাগানিয়া গানে
মুখরিত করে আকাশে বাতাস;
মাছেরা তোমার ডাকে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে;
তোমার শাড়িতে লেগে থাকে
শস্যের সুষমা-ধান দূর্বা তিল তিসি....
তোমার সর্বাঙ্গ জুড়ে বাংলার ষড়ঋতু:
গ্রীষ্মে-দাবদাহে ছায়াময় বটবৃক্ষতুমি;

বরষার ভরা জলে নৌকার রঙিন পালে
শরতের নদীতীরে শুভ্র কাশবনে
হেমন্তের সোনাঝরা পাকাধানে
শীতের কুয়াশাভেজা মিঠে রোদে
বসন্তের কচি নতুন পাতায়
বাংলাদেশ তোমাকেই খুঁজে পায়।

ঘাতকের রক্তচক্ষু মৃত্যুবাণ তুচ্ছ করে
স্বজনের রক্তেভেজা এই বাংলায়
বুকে কষ্টের পাথর চেপে
চোখে অশ্রুর সমুদ্র নিয়ে
ক্লান্তিহীন তুমি ছুটে যাও গ্রাম থেকে গ্রামে
শহরের পোড়া বিধ্বস্ত বস্তিতে;
মায়ের মমতা দিয়ে বুকে নাও দুখিনীরে।

মুজিব-অভয়পুষ্ট তোমার প্রশান্ত
আঁচরের ছায়া প্রতিদিন দীর্ঘতর হয়ে
সমতলভূমি আর লাগাম পাহাড় ছুঁয়ে
সস্নেহে ছড়িয়ে পড়ে জাপানের ফুকুশিমা থেকে
সোমালিয়া-সুদানের খরাপীড়িত শিশুর মুখে।
জাতিসংঘে, অগণিত বিশ্বসভায়
তোমার সাহস আর মৌর্যের প্রভায়
সাম্য শান্তি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়
এশিয়া-আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকায়
সংগ্রামরত মানুষেরা জেগে ওঠে।

শেখ হাসিনা, জনগণমননন্দিত নেত্রী
আমাদের শাশ্বত ফিনিক্স পাখি তুমি
অগ্নিস্নানে শুচি হয়ে বারবার আসো
তুমি ভূমিকন্যা- তুমি প্রিয় মাতৃভূমি।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

ক্রান্তিকালের সফল কাণ্ডারি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' লাভ করেছেন। চারটি ক্যাটাগরিতে এ সম্মান প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন নীতিগত ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিনিয়োগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎকৃষ্ট। অন্য ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে বিজ্ঞান, ব্যবসায় ও সিভিল সোসাইটি। এক্ষেত্রে অন্যতম পুরস্কার বিজয়ী হচ্ছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতো খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যখন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়, তার তাৎপর্য হয় বহুমাত্রিক। এর প্রভাব অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন পড়ে, তেমনি বিশ্বসমাজেও নানাভাবে অনুভূত হয়। উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম ২০০৯ সালে ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন-নাপা এবং পরে ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজিক পেপার তৈরি করতে পেরেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১১ সালেই বিশদ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এটাও মনে রাখতে হবে-কেবল অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বৈশ্বিক পর্যায়ে যে আলোচনা ও দরকষাকষি চলছে সেখানেও শেখ হাসিনা সবসময় বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করে চলেছেন। বাংলাদেশের সম্পদ অপ্রতুল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ সমস্যা মোকাবিলায় যে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে,এখন পর্যন্ত তা রক্ষায় যথেষ্ট পদক্ষেপ আমরা দেখছি না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এ খাতে নিজস্ব সম্পদ বরাদ্দ করে কাজ চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প। স্থাপন করেছেন ক্লাইমেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ড। এটা হয়তো কাকতালীয়, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি নিউইয়ার্কে ২৭ সেপ্টেম্বর যে সময়ে তাঁকে পরিবেশ বিষয়ে নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ সম্মানে ভূষিত করেছে, তখন বাংলাদেশের দিনপঞ্জিতে ২৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে গেছে। আমরা জানি, এ দিনেই তিনি জীবনের ৬৮ বছর পূর্ণ

করেছিলেন। বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জন্মদিনের যোগ্য পুরস্কার পেলেন তিনি। আর সেটা পেয়েছেন প্রিয় স্বদেশভূমিকে বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের জন্য বসবাসের উপযোগী করতে এবং টিকিয়ে রাখতে। জলবায়ু-যুদ্ধে তিনি এখন বৃহত্তর পরিসরে নেতৃত্ব দেবেন- এটাই প্রত্যাশা। এটা ছাড়া জনবন্ধু শেখ হাসিনা মাদার অব দ্য হিউম্যানিটি সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাকে পৃথিবীর ২০তম ক্ষমতাবান মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশের এক ক্রান্তিকালে আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন। আমরা দেখি, ওই বছর ১৭ মে দেশে ফেরার স্বল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের অবস্থানে চলে আসেন তিনি। এ সংগ্রামের অভিজ্ঞতাপুষ্ট হয়েই তিনি ১৯৯৬ সালে জুন মাসে দলকে ২১ বছর পর রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে আসেন। তার আগে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের সময় রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন আবদুর রহমান বিশ্বাস। তিনি বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদকে কতটা সম্মান দেখিয়েছেন, সেটা আমরা দেখতে পাই আবদুর রহমান বিশ্বাসের প্রতি তার মনোভাবে। কে এই পদে আছেন সেটা নয় বরং তিনি দেখেছেন পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশ-বিদেশের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী অবহিত করে থাকেন। আমরা দেখেছি, শেখ হাসিনা যতবার দেশের বাইরে গেছেন তার আগে-পরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সফর বিষয়ে অবহিত করেছেন ও পরামর্শ নিয়েছেন। সরকারের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অবহিত করতেও তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছেন। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি তার এ সম্মান প্রদর্শন ছিল পরিপূর্ণ আন্তরিক এবং পরের দুই টার্ম এ দায়িত্ব পালনের সময়েও তার এ মনোভাব বজায় রয়েছে। অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রীকে আমরা রাষ্ট্রপতির পদের প্রতি এভাবে সম্মান জানাতে দেখি না।

শুধু রাষ্ট্রপতির প্রতি নয়, সাংবিধানিক প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর এ মনোভাব আমরা দেখি। তিনি প্রথম যখন ক্ষমতায় আসেন তখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। তিনি পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ অন্যান্য পদেও যারা বিএনপির মনোনয়নে দায়িত্বে

ছিলেন, তাদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। বাংলাদেশে এ ধরনের সংবিধানকে সম্মান করা এবং সাংবিধানিক পদে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার নজির একমাত্র শেখ হাসিনারই।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত এবং নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। নির্বাচিত হয়েছিলেন ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এবং শিক্ষার অগ্রগতিতে ছাত্রসমাজের বলিষ্ঠ ভূমিকার সপক্ষে তিনি সর্বদা অবস্থান নিয়েছেন। নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের হাতে যাতে সংগঠনের নেতৃত্ব থাকে সেজন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন ও আছেন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নয়-এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়সংকল্প এবং এজন্য তার প্রত্যাশা-ছাত্র সংগঠনগুলোতে যেন মেধাবী, উদ্যমী ও সৃজনশীলরা ভিড় জমায়। যে দলের পেছনে ছাত্রসমাজ, তার হাতেই পেশিশক্তি এবং এ বলে বলীয়ান হলে রাষ্ট্রক্ষমতা সহজেই হাতে আসে-এমন অভিমত তার পছন্দ নয়। ছাত্রদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহারে তার আগ্রহ নেই। ১৯৯২ সালে ছাত্রলীগ অভ্যন্তরীণ কলহে জড়িয়ে পড়লে তিনি কয়েক মাসের জন্য সংগঠনের সব ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেন। তখন তার দল ক্ষমতার বাইরে। এ কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তিনি একবারও চিন্তা করেননি, রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তারে ছাত্র সংগঠনের সক্রিয়তার বিকল্প নেই।

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার অর্থ হচ্ছে কৃষিতে সাফল্য-এমনটি আজ সর্বমহলে স্বীকৃত। তার আমলেই যুগ যুগের খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এজন্য নীতিগত ধারাবাহিকতা ও পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল এবং সম্ভাব্য সবকিছুই তিনি করেছেন। কৃষকদের প্রতি তার রয়েছে অপরিসীম মমত্ববোধ। বাংলাদেশ আজ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে সুপেয় জলের মৎস্য উৎপাদনে। গেল বছর ২০১৬-১৭ সালে ৪১.৫ লক্ষ টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে যার মধ্যে ইলিশের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টন।

উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনে তাদের ভর্তকি দিতে হবে-এ প্রশ্নে তিনি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অভাবনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। কৃষকদের উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা দেব-এ নীতিগত প্রশ্নে তিনি আপসহীন। সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিও রয়েছে তার গভীর মনোযোগ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদর্শিত পথ ধরে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট

রয়েছে। শিক্ষায় প্রসার ও মান বাড়াতেও যত্নবান। বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখন প্রায় পাঁচ কোটি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। উন্নয়নের সিঁড়িতে চলতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ চাই-এটা তিনি যথার্থভাবেই উপলব্দি করেন।

তার গণতান্ত্রিক মনোভারের আরেকটি পরিচয় আমরা পাই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের বিচারের ক্ষেত্রে। অনেকেই এ জন্য সামারিট্রায়াল ধরনের পদেক্ষেপের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি চেয়েছেন বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ অবশ্যই যেন ল অব দি ল্যান্ড নীতিতে যথাযথভাবে অনুসৃত হয়। গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমাজ গড়ে তুলতে হলে এটাই যে একমাত্র পথ,সেটা তিনি অনুধাবন করেন বলেই এভাবে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবর রাজধানী ঢাকাতে নিয়ে আসার প্রস্তাবের ব্যাপারে তার অনাগ্রহের পেছনেও একই মনোভাব কাজ করছে। আমি নিজেও মনে করেছি যে বঙ্গবন্ধুর মরদেহ ঢাকায় স্থানান্তরিত হোক-অনেক অনেক মানুষের এমন ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। কিন্তু শেখ হাসিনা এর জবাব দেওয়ার জন্য জাতীয় সংসদের ফোরামকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কুচক্রী মহল অনেক টানাহেঁচড়া করেছে। তাকে মানুষের মন থেকে চিরতরে মুছে দেওয়ার অপচেষ্টাও কম হয়নি। তিনি তার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় শান্তিতে চিরনিদ্রয় শায়িত আছে। তার আত্মা এভাহে শান্তি পাবে।

আমি ওপরের যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছি,তা থেকে বলতে পারি-এখানেই তিনি অন্য সব রাজনৈতিক নেতার চেয়ে ভিন্ন, বৈশিষ্ট্যে অনন্য। তিনি দেশের কল্যাণে নিবেদিত, জনকল্যাণে দৃঢ়সংকল্প। বিশ্বসমাজের কাছেও তিনি সমাদৃত। বাংলাদেশ যে কথিত 'বাস্কেট কেস'- এর বদনাম ঘুছাতে পেরেছে এবং একটি সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে তার পেছনে শেখ হাসিনার বিপুল অবদান অনস্বীকার্য। এশিয়ার তিন প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি চীন, ভারত ও জাপান এবং বিশ্বের একক পরাশক্তি হিসেবে স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তারা সবাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করছে। রাশিয়া, জার্মানি, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নয়নে

গভীরভাবে আগ্রহী। গত সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশের প্রতি এমন অনুকূল ও ইতিবাচক মনোভাব আর কখনোই দেখা যায়নি।

এটা ঠিক, বাংলাদেশের রাজনীতিতে হয়তোবা খানিকটা অস্বস্তি রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষণীয়। কিন্তু এ অর্জন আরও ভালো হতে পারত, যদি রাজনীতি সুস্থ হতো। আমাদের প্রত্যাশার রাজনৈতিক অঙ্গন না থাকার পেছনে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দায় অবশ্যই রয়েছে এবং সমৃদ্ধ ও উন্নত স্বদেশ চাইলে এ ভ্রান্ত পথ তাদের চিরতরে পরিত্যাগ করতে হবে। তবে দেশে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী সব শক্তির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করতে হলে যারা যখন ক্ষমতায় থাকেন তাদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতেও চাই সরকারের প্রধান ভূমিকা। এজন্য অপরিহার্য একটি শর্ত-আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অব্যাহত উন্নতি ঘটানো এবং এর অবনতির যে কোনো অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিত একটি সংগঠন এবং অন্য কয়েকটি গবেষণা সংস্থা ২০১৫ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী পাঁচটি দেশের তালিকায় রেখেছে বাংলাদেশকে। অন্য চারটি দেশ হচ্ছে চীন, নাইজেরিয়া, ইরাক ও কাতার। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের সমষ্টিক আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.২৮ (২০১৬-১৭) অর্থাৎ পরপর তিন বছর শতকরা ৭ ভাগের উপরে। রপ্তানি আয় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ছ'মাসে শতকরা সাত ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রবাসীগণের পাঠানো রেমিটেন্সও আবার ঊর্ধ্বমুখী। সমষ্টিক আয়ের অনুপাত হিসাবে বিনিয়োগ এখন ৩১ ভাগ বেসরকারি বিনিয়োগ ধীর গতির হলেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ছে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি। প্রসারিত হচ্ছে ঔষধ, চামড়া শিল্প ও পাটজাত

ড. শফিক সিদ্দিক

রাজনীতিতে শেখ হাসিনার অভিষেক

১৯৮০-এর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে হাসিনা আপা তাঁর ছেলে জয় ও মেয়ে পুতুলকে নিয়ে দিল্লি থেকে লন্ডনে এলেন। হাসিনা আপা লন্ডনে এসেছেন শুনে লন্ডনের অনেক আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতে শুরু করলেন। হাসিনা আপা এখানে এসেই খোকা চাচাকে নিয়ে গাফ্ফার চৌধুরীর অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে যান। গাফ্ফার চৌধুরীর সঙ্গে এরপর প্রায়ই হাসিনা আপার আলাপ হতো। '৭৫-এরপর থেকে গাফ্ফার চৌধুরী লন্ডনে 'বাংলার ডাক' প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমুন্নত রেখে যাচ্ছেন, সে জন্য হাসিনা আপা গাফ্ফার চৌধুরীর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। অক্সফোর্ডে অবস্থানরত ড. কামাল হোসেনও এসে হাসিনা আপার সঙ্গে দু-একদিন দেখা করে যান।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আব্দুল মতিন সাহেব আমার বাসায় বেশ কাছেই থাকতেন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠনের সময়। এই সদালাপী ও প্রচার বিমুখ লোকটার সঙ্গে পরিচয় হবার পর যতই তাঁকে দেখেছি ততই আমার মনে হয়েছে, এই লোকটির সঙ্গে আমার পরিচয় না হলে সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পর্কে অনেক কিছুই আমার অজানা থেকে যেত। তাঁর সঙ্গে কথা বললে সাংবাদিক, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা নিয়ে নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেতাম এবং এ বিষয়গুলোতে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নিজের অজান্তেই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে যেত। তিনি মাঝে মাঝে এসে হাসিনা আপার সঙ্গে গল্প করে যেতেন এবং তাঁর সম্পাদিত সানরাইজ' পত্রিকাসহ বাংলাদেশের চলতি ঘটনার ওপর প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকাও দিয়ে যেতেন। মতিন সাহেবের একটি অন্যতম ছবি ছিল ছবি তোলা। এই কাজটিও তাঁর খুব নিষ্ঠা ও পারদর্শিতার সঙ্গে করতেন। এই পারদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে তাঁর নিজের হাতে তোলা হাসিনা আপা, রেহানা, আমার ও বাচ্চাদের পারিবারিক ছবিগুলো।

গাউস খান সাহেব তখন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি সবার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রেহানা ও আমার সম্পর্ক ছিল নিবিড় । আমরাও তাঁকে পিতৃসম শ্রদ্ধা করতাম। হাসিনা আপাও তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন। এই বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা একনিষ্ঠভাবে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তীকালে পঁচাত্তরোত্তর প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। রাজনীতি ও দেশসেবাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। সেজন্য কোনো দিন তিনি তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করেননি। এমনকি লন্ডনে তাঁর একটি নিজস্ব বাড়িও নেই। কেবল লিজ নিয়ে একটি রেস্টুরেন্ট চালিয়ে যা আয় করতেন তা দিয়ে কোনোরকমে পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন। রেস্টুরেন্টের আয়ের বেশির ভাগই খরচ হতো রাজনীতি ও সংগঠনের কাজে। কিছুদিন আগে তিনি হাসিনা আপার সঙ্গে দেখা করতে এসে হাসিনা আপাকে অনুরোধ করেছিলেন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য। হাসিনা আপা তাঁকে জানালেন, তিনি লন্ডনে স্যার টমাস উইলিয়ামের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত কমিশন গঠনের পরিকল্পনা করছেন। হাসিনা আপা আরো বললেন, এ ব্যাপারে তিনি কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করছেন কারণ কথাটি সরকারি মহলে জানাজানি হয়ে গেছে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গাউস খান সাহেব উত্তরে বলেছিলেন, 'মা হাসিনা, এ ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তাই অবলম্বন করা উচিত। কারণ তুমি লন্ডনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার বাংলাদেশ হাইকমিশনের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস তৎপর হয়ে উঠেছে।" স্যার টমাস ইউলিয়ামের নাম প্রস্তাব করার পেছনে কারণ ছিল গত বছরের মাঝামাঝি একটি ঘটনা ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি একদিন খোকা চাচার বাসায় রেহানা ও আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হাচ্ছিল। জিয়া সরকার যে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে সে কথা উঠতেই রেহানা হঠাৎ করে খোকা চাচা ও আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল , 'টমাস উইলিয়ামসকে দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার মামলা করা যায় না? রেহানার মুখে এ কথা শুনে আমি যেমন অবাক হলাম, তেমনি খুশিও হলাম। অবাক হলাম এই ভেবে যে, তথাকথিত আগরতলা মামলার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে নিবিষ্ট এই কৌসুলি নাম

রেহানা কীভাবে এখনও মনে রেখেছে। খুশি হলাম এই ভেবে যে বিদেশের মাটিতে বসেও আমরা যে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিরুদ্ধে একটা কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারি, সে কথা রেহানার মুখ দিয়ে প্রথমে বের হলো। টমাস উইলিয়ামসকে পাওয়া যাবে কোথায়? তাঁকে খুঁজে বের করার কথা ওঠতেই খোকা চাচা বললেন, ড. কামাল হোসেন বোধ হয় এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারেন। খোকা চাচার গাড়িতে ড. সেলিম ভাই (মরহুম মনসুর আলী সাহেবের ছেলে) ও আমি পরের ইউইকএন্ডে অক্সফোর্ডে গেলাম ড. কামাল হোসেনের উইলিয়ামস লেবার পার্টির একজন বিশিষ্ট এমপি এবং গত বছর দুয়েক আগে তিনি 'স্যার' উপাধি পেয়েছেন। অক্সফোর্ড থেকে ফিরে আসার সময় ড. কামাল হোসেন আমাদের স্যার টমাস উইলিয়ামসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। হয়তো নানা ব্যস্ততার কারণে ড. কালাম হোসেন তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেননি। এর মধ্যে আমি তাঁর অপেক্ষায় না থেকে সুলতান ভাইয়ের সঙ্গে স্যার টমাস উইলিয়ামসের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা আলাপ করলাম। সুলতান ভাই জানালেন ইংল্যান্ডে সাধারণত টমাস উইলিয়ামসের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের টেলিফোন নাম্বার 'অফ-ডাইরেক্টরিতে' থাকে, মানে টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে তাদের টেলিফোন নাম্বার থাকে না। সে জন্য এসব বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা কষ্টকর। সুলতান ভাই আরও বললেন, নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। তিনি আমাকে স্যার টমাস ইউলিয়ামসের টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করে দেবেন। আমি সুলতান ভাইকে যতদূর চিনেছি তিনি যে কাজ করবেন বলেন, সে কাজ করেই ছাড়েন। আমি বিশ্বাস করলাম, সুলতান ভাইয়ের মাধ্যমে আমার সঙ্গে টমাস উইলিয়ামসের যোগাযোগ অচিরেই ঘটবে এবং তা সত্যিই ঘটল। এরই ধারাবাহিকতায় আমি, রেহানা এবং ড. সেলিম ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্যার টমাস উইলিয়ামসের সঙ্গে দেখা করি।

জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন স্যার টমাস উইলিয়ামস হাসিনা আপাকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চা পানের আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন, হাসিনা আপাকে পার্লামেন্ট বিল্ডিং ঘুরিয়ে দেখাবেন। হাসিনা আপা ও আমি নির্ধারিত দিনে গেলাম স্যার টমাস উইলিয়ামসের সঙ্গে দেখা করতে । চা খেতে খেতে হাসিনা আপা বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত কমিশন গঠন করার দায়িত্ব

নিতে স্যার টমাস উইলিয়ামসকে অনুরোধ করলেন। যেহেতু দেশে খুনিদের দোসররা ক্ষমতাসীন এবং তারা অধ্যাদেশ জারি করেছে, ১৫ আগস্টে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের হত্যার বিচার করা যাবে না। এই অমানবিক আইনের জন্য দেশে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাচ্ছে না। সেহেতু হাসিনা আপা চাচ্ছেন লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করে ১৫ আগস্ট ও পরবর্তীকালে ৩ নভেম্বর জাতীয় নেতাদের হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। স্যার টমাস উইলিয়ামস এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'আমি মনে করি এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়ার প্রয়োজন আছে। দেশে এই মুহূর্তে না পারলেও আমরা বিদেশে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে এর বিচারের পক্ষে বিশ্ববিবেক জাগ্রত করতে পারি। আমি নিশ্চয়ই এই দায়িত্ব পালন করতে রাজি আছি। এরপর উনি তদন্ত কমিশন কীভাবে গঠন করা যায় সে বিষয়ে আলাপ করলেন। কথায় কথায় হাসিনা আপা বললেন, ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর আলাপ হয়েছে। উনি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে। ঠিক হলো অল্প কিছুদিনের মধ্যে কামাল হোসেন স্যার টমাস উইলিয়ামসের সঙ্গে বসে তদন্ত কমিশনের প্রাথমিক রূপরেখা নির্ধারণ করবেন।

কিছুদিন পরে স্যার টমাস উইলিয়ামসের সঙ্গে হাসিনা আপা এক বৈঠকে বসেন এবং সেখানে স্থির হয়, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় হাসিনা আপা আনুষ্ঠানিকভাবে স্যার টমাস উইলিয়ামসকে তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য অনুরোধ করবেন। সেই মিটিংসে উপস্থিত থেকে হাসিনা আপার অনুরোধ রক্ষা করে স্যার টমাস উইলিয়ামসও বক্তব্য রাখবেন। আরও স্থির করা হলো, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এক উইকএন্ডে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শাহাদাত দিবসকে লক্ষ্য রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। স্থির হয় সে জনসভার স্থান, তারিখ ও সময় স্যার টমাস উইলিয়ামকে পরে টেলিফোনে জানানো হবে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত তদন্ত কমিশন গঠনের ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। কেবল যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের গুটিকয়েক নেতা ছাড়া আর কাউকেই এ বিষয়ে জানানো হয়নি। এই জনসভার জন্য কয়েকদিন সুলতান শরীফ ভাই, হাসেম সাহেব লন্ডনের

বিভিন্ন হল হাসিনা আপাকে ঘুরিয়ে দেখালেন। জুলাই মাসে লন্ডনে চলছিল স্কুলগুলোর গ্রীষ্মকালীন ছুটি। যেহেতু হাসেম সাহেব স্কুলে শিক্ষকতা করতেন সেহেতু হাসিনা আপাকে জনসভার জন্য হলগুলো ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব তাঁর ওপরই পড়েছিল। এ সময়ে একদিন হাসেম সাহেব, হাসিনা আপা ও আমি ইস্ট লন্ডনের মাইল্যান্ডস্থ ইয়র্ক হলে গেলাম। ইয়র্ক হলটির আয়তন বিশাল, আসন সংখ্যা হাজারের ওপর। সাধারণত এই হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যুক্তরাজ্য শাখাগুলো বাংলাদেশ থেকে আগত তাদের নেতাদের জন্য জনসভার আয়োজন করে না দুটি কারণে। এক, এই হলটি যদিও ইস্ট লন্ডনে তাও এই এলাকার আশপাশে বাঙালিদের বসতি তেমন ঘন নয় যেমনটা আছে অলগেট, হোয়াইট চ্যাপেল কিংবা ব্রিকলেনে। দুই, এই হলের ধারণক্ষমতা এত বেশি যে লন্ডনে সাধারণত কোনো সভায় এত লোক হয় না। বিলেতে দেড়শ থেকে দুইশ লোকের উপস্থিতি সেই সভার জন্য সাফল্যজনক সমাগম বলে ধরা হয়। সে ক্ষেত্রে হাজারের ওপর ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এই হলে জনসভা করাটা যুক্তি-সঙ্গত নয়। এসব বড় হলে সাধারণত নামকরা গায়ক, অভিনেতাদের অনুষ্ঠান হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও পরবর্তী কালে বোধ হয় একবার কি দুইবার এখানে বাঙালিরা এই হলে, রাজনৈতিক সভা করেছিল।

হলটি ছিল চমৎকার। সাউন্ড সিস্টেমও ছিল খুব আধুনিক । বসার ব্যবস্থাও ভালো। ডায়াসটা খুব উঁচু ও বড় হওয়াতে প্রত্যেক দর্শকই ডায়াসে উপবিষ্ট বক্তাদের দেখার সুযোগ পেত। হাসিনা আপা এই হলে ঢুকে হঠাৎ করে ডায়াসের ওপর ওঠে বক্তার জন্য রাখা মাইকস্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাসেম সাহেব আমার দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাস করলেন তাঁকে কেমন দেখাচ্ছে । তারপর তিনি পুরো হলটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ করে হাসেম সাহেব ও হাসিনা আপাকে বললেন, 'আপনার বোধ হয় হলটা পছন্দ হয়েছে। ' উত্তরে হাসিনা আপা বললেন, 'পছন্দ হওয়ার মতোই হলটা। আমরা আর কথা বাড়ালাম না। এখান থেকে গেলাম অলগেট ইস্টে অবস্থিত টয়নবী হল দেখতে। সেখানে আগেই আশরাফ ও নুরু মিঞা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। টয়নবী হলেই বেশির ভাগ সময় প্রবাসী বাঙালিদের সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে কোনো রাজনৈতিক নেতা এলে সাধারণত এখানেই সভা ডাকা হয়।

হলটির ধারণ ক্ষমতা দেড়শ জনের মতো। এই টয়নবী হলের আশপাশে বাঙালিদের বসতি, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেশি হওয়াতে এই হলটি বাঙালিরা বেশি ব্যবহার করে থাকে। বলা যেতে পারে, পূর্ব লন্ডনের বাঙালিদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র এই টয়নবী হল। কিন্তু হাসিনা আপার প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের জন্য আমাদের কয়েকজন টয়নবী হলটি পছন্দ করার ব্যাপারে আপত্তি ছিল। হাসিনা আপাকে দেখে মনে হলো মিটিংয়ের জন্য তাঁরও এই হলটি পছন্দ হয়নি। এই হল ছাড়া আশপাশে ব্রেডি সেন্টারের হল, মন্টি ফিওরি সেন্টার এবং ব্রিকলেন অবস্থিত নাজ সিনেমা হলে মাঝে মাঝে বাঙালিদের রাজনৈতিক মিটিং হয়। এই হলগুলোর আসন সংখ্যা টয়নবী হল থেকে কিছুটা বেশি, কিন্তু কোনোক্রমেই এই হলগুলো ইয়র্ক হলের সমতুল্য নয়।

আমরা চিন্তা করতে লাগলাম যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলাচনা করে হল নির্বাচনের সমস্যা নিরসন করব। এটিকে সুলতান শরীফ ভাই হাসেম সাহেব বলে রেখেছিলেন, যদি ইয়র্ক হল হাসিনা আপার পছন্দ হয় তাহলে যেন হাসেম সাহেব হলটি বুক করে রাখেন। হাসেম সাহেব কথামতো বুক করে রেখেছিলেন। কিছুদিন পর যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় সুলতান ভাই ইয়র্ক হলে মিটিং করার পক্ষে মত দিলেন। সভায় কেউ কেউ এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন এবং ভেবে যে, এই হল পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকের সমাগম হবে কিনা । সুলতান শরীফ ভাই জোর দিয়ে বললেন, 'শেখ হাসিনার প্রথম মিটিং, লোকজন ঠিকমতো এটা জানতে পারলে উপস্থিত কম হবে না। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো সবাইকে মিটিংয়ের ব্যাপারে অবহিত করা। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিবুর রহমান তাঁর এই বক্তব্য সমর্থন করলেন। মিটিংয়ের দিন স্থির করা হলো ১৬ আগস্ট সময় বিকেল তিনটা ১৬ আগস্ট রবিবার ছুটির দিন ইস্ট লন্ডনের বেশির ভাগ কর্মজীবী বাঙালি সপ্তাহে ছয়দিন কাজ করেন। সেই জন্য তাদের সুবিধার্থে এই দিনটা সভার জন্য স্থির করা হয়। ঠিক হলো যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগ, লন্ডন আওয়ামী লীগ এই মিটিংয়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করে যাবে। হাসিনা আপার মিটিংয়ে এখানকার বাঙালি তরুণদের সমবেত করার জন্য ডা. হারিস আলী এগিয়ে এলেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের সভাপতি

হিসেবে। মহিলা লীগকে সুসংগঠিত করতে এগিয়ে এলেন। মিসেস খালেদা দবির চৌধুরী। তাদের সাহায্য করা জন্য এলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা এককালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেত্রী লায়লা হাসি। হাসি আপা তখন লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন।

উত্তর লন্ডনে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রমজান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে, পূর্ব লন্ডনে লন্ডন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল গাইস ও সাধারণ সম্পাদক আবুল লেইসের নেতৃত্বে, লুটনে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিবুর রহমান ও লুটন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল আহাদের নেতৃত্বে এবং দক্ষিণ লন্ডনের সুলতান শরীফ ভাইয়ের নেতৃত্বে হাসেম সাহেব, জোয়ার্দার সাহেব ও আমি হাসিনা আপার মিটিংয়ের প্রচার কাজে সক্রিয় হলাম এছাড়া যুবলীগের সভাপতি ড. হারিস আলী, সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন বেলাল, সৈয়দ আশরাফ ও রুহুল আমিনের নেতৃত্বে যুবলীগের সদস্যগণ এই প্রচার কার্যে অংশ নেয়। মহিলা লীগের খালেদা দবির , মেহের নীগার ও রহিমা খাতুন ইস্ট লন্ডনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের এই মিটিংয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করেন। সেলিম ভাই, গাইস সুলতান, শফিক চৌধুরী, রাজ্জাক চৌধুরী, সেতাব মিঞা, আসকীর মিঞা, লালা মিয়া, শামসুদ্দিন খান ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক সাহেব ও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। এমনকি বার্মিংহ্যামসের আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা জমশেদ মিঞা এবং হক সাহেবও এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করলেন। মোট কথা হলো, আওয়ামী লীগের প্রতিটি সদস্যই হাসিনা আপার মিটিংয়ের ব্যাপারে ছিলেন সক্রিয়। যুক্তরাজ্য ন্যাপের খায়রুল হুদা, মোস্তাক কোরাইশী ও হাজী বশীর, ড. সাইদুর রহমান এবং যুক্তরাজ্য কমিউনিস্ট পার্টির নিখিলেশও আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

গাফ্ফার চৌধুরীও তাঁর সম্পাদিত 'বাংলার ডাকে' বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে এই মিটিংয়ের প্রচার কার্য চালান।

আব্দুল মতিন সাহেব ১৫ আগস্ট উপলক্ষে ১৭ মার্চে হাউস অফ কমন্সে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তাদের বক্তৃতাসমূহ সম্পাদন করে ইংরেজিতে একটি সুন্দর বই বের করেন। এই সভার কোনো বক্তব্য

লিখিত আকারে ছিল না কেবল টেপে ধারণকৃত বক্তব্য শুনে কষ্ট করে প্রত্যেকে বক্তাদের কাছে পাঠান। বক্তাদের কাছ থেকে লেখাগুলো ফেরত আসার পর এগুলো সম্পাদনা করে এ ট্রিবিউট টু শেখ মুজিব নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধু পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, তাও এই পুস্তকে মতিন সাহেব সুন্দরভাবে সংকলিত করেন। এই দিবস উপলক্ষে যারা বাণী পাঠান তাদের অন্যতম হলেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, লেবার পার্টির নেতা মাইকেল ফুট, বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান টরি বেন, জেমস লেমন্ড ও জন হান্ট। ঠিক হলো ১৬ আগস্টে মিটিংয়ের কার্যসূচিতে এই পুস্তকটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা হবে।

দেড় মাসব্যাপী প্রচারাভিযানের পর এলো ১৬ আগস্ট। বিকালে মিটিংয়ে যাওয়ার জন্য খোকা চাচার গাড়িতে হাসিনা আপা ওঠেন। পেছনে সুলতান ভাই ও হাসেম সাহেবের গাড়ি। ববিকে কোলে নিয়ে বিদায় জানানোর সময় রেহানা আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলল, 'হাসিনা আপাকে তোমার হাতে দিলাম, দেখো যেন হাসিনা আপার কোনো বিপদ না হয়। " কথা শুনে আমি একটু ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। গাড়িতে যেতে যেতে ভাবলাম, রেহানা কি কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর রাজাকার-আলবদরের কিছু নেতা বাংলাদেশ থেকে এসে পূর্ব লণ্ডনে আত্মগোপন করেছিল।'৭৫-এর পর সরকারি মদদ পেয়ে এরা বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে আওয়ামী লীগের প্রতি স্থানীয় বাঙালিদের সমর্থন দেখে এরা চুপ হয়ে যায়। হাসিনা আপার মিটিংয়ে তৎকালীন জিয়া সরকারের সমর্থক ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র যেন কোনো রকম গোলযোগ সৃষ্টি না করতে পারে সেজন্য আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ থেকে বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে এই মিটিংয়ের শান্তি শৃঙখলা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও গোলযোগের এই আশঙ্কা খুবই কম ছিল, তথাপি এই দেশের নিয়ম অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতারাই এই জনসভা অনুষ্ঠানের কথা আগেই পুলিশকে অবহিত করে রেখেছিল। বেশ ক'জন ব্রিটিশ এমপি এই মিটিংয়ে আসবেন শুনে পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়ে দিলেন, নিয়ম মাফিক দু'একজন পুলিশ সেখানে থাকবে। আমার বাসা থেকে মিটিংয়ের হলে পৌছাতে পৌনে এক ঘণ্টা সময় লাগে। সভাস্থলে

পৌঁছে দেখলাম মিটিংয়ে প্রচুর লোক, তিল ধারণের স্থান নেই। মিটিং শুরু হলো সুশৃঙ্খলভাবে। কিন্তু মিটিংয়ের এই শান্ত অবস্থা সত্ত্বেও আমার মনে কেবলি বিদায়ের সময় রেহানার বলা কথাগুলো মনে হতে লাগল। আমি মিটিংয়ের একদম পেছনে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগলাম। স্থানীয় আওয়ামী লাগের বেশ ক'জন বক্তৃতা করলেন এবং দুজন বাংলাদেশ থেকে আসা আওয়ামী লীগের এমপিও বক্তব্য রাখলেন।

তারপর এলো হাসিনা আপার পালা। এটা পঁচাত্তরের হাসিনা আপার প্রথম কোনো জনসভায় বক্তৃতা করা। হাসিনা আপা বাংলাদেশের সামরিক সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, ইতিহাস বিকৃতি, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সুপরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করা এবং স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলানো সম্বন্ধে বক্তব্য রাখলেন। উনি বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলছিল তার কথাও উল্লেখ করেন। হাসিনা আপা ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বেশ আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন। দেখলাম শ্রোতাদের মধ্যেও এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বিশেষভাবে প্রবাসী বাঙালি মহিলাদের প্রায় সবারই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। বক্তৃতার শেষ অংশে হাসিনা আপা বললেন, " আমি বাংলার আপামর জনসাধারণে কাছে, বিশ্বমানবতার কাছে বিচার চাই- কেন আমরা মা- বাবার স্নেহবঞ্চিত, কেন আজ আমি ভাইহারা? আমি আপনাদের কাছে বিচার চাই, বিচার চাই বিশ্ববাসীর কাছে, এত খুনের বিচার হয়, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার কেন হচ্ছে না? হত্যাকারীরা আজ প্রকাশ্য দিবালোকে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হত্যাকারীরা কেবল বাংলাদেশের জনগণের জন্যই যে হুমকিস্বরূপ তা নয়, সমগ্র বিশ্বের গণতন্ত্রকামী দেশপ্রেমিকদের প্রকৃতিও হুমকিস্বরূপ। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান কৌসুলি স্যার টমাস উইলিয়ামসকে আমি অনুরোধ করব ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য আমি চাই খুনিদের বিচার হোক।"

এরপরই ছিল স্যার টমাস উইলিয়ামসের বক্তৃতা। প্রধান বক্তার ভাষণে স্যার টমাস উইলিয়ামস বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার হত্যাকারীদের আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করার ব্যাপারে উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন বলে শেখ হাসিনাকে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি বলেন, হত্যাকারীদের

বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ও অন্য আইনজীবীদের নিয়ে ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যেসব দলিলপত্র তাঁদের কাছে রয়েছে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন। সমবেত শ্রোতাদের দীর্ঘস্থায়ী করতালির মধ্যে স্যার টমাস বলেন, হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা কী করে শুরু করা যায় সে সম্পর্কে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। স্যার টমাস আরও বলেন, যাদের হাতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের রক্তের দাগ রয়েছে তাদের বিচার করতেই হবে। শুধু বিচার করলেই চলবে না, বিচার করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হওয়া প্রয়োজন, জাতির পিতা হত্যার ফলে বাংলাদেশের বহুলোক লজ্জা বোধ করে বলে তিনি সুনিশ্চিত। হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত এই লজ্জা দূর করা যাবে না। স্যার টমাস জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর সম্মানহানি নাকচ করার জন্য হত্যাকারীদের উপযুক্ত বিচার হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৬৮ সালে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জয়লাভ করে বঙ্গবন্ধুর কালিমালিপ্ত সম্মান পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্যেই বাংলাদেশের অঙ্কুর নিহিত ছিল বলে তিনি মনে করেন।

মিটিং শেষ হতেই আমার মনে হলো, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও মহিলা লীগের এতদিনের কষ্টসাধ্য আয়োজন আজ এই সভার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করল। হাসিনা আপা সভা শেষে টমাস উইলিয়ামস, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও মহিলা লীগের নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানান। মিটিং শেষ হওয়ার পরপরই যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে হাসিনা আপা ও টমাস উইলিয়ামসের বক্তব্য এবং মিটিংয়ের বিবরণ সম্বলিত একটি প্রেস রিলিজ বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমরা সন্তুষ্টচিত্তে হাসিনা আপাসহ বাসায় ফিরে এলাম। রেহানা অধীর আগ্রহে বাসায় বসে ছিল আমাদের কাছ থেকে মিটিংয়ের বিবরণ শোনার জন্য। আমরা রেহানাকে মিটিংয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। সে সময় হাসিনা আপা হঠাৎ করে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'শফিক, আমি ডায়াসে বসে মিটিং চলাকালে দেখেছি, তুমি সারাক্ষণ হলের পেছনের দিকে হাঁটাহাটি করছিলে। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'হাসিনা আপা আপনি

ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন? হাসিনা আপা উত্তরে বললেন, আমার নজর থেকে কোনো কিছুই এড়ায় না। আরও বললেন, 'তোমার হাঁটাহাটি দেখে বুঝেনিলাম তুমি খুব টেনশনে ছিলে।' আমি হেসে বললাম, এমনিতে আপনার প্রথম মিটিং নিয়ে টেনশনে ছিলাম, তার ওপর আপনার ছোট বোন মিটিংয়ে যাওয়ার আগে যে কথা বলেছে তাতে আমার টেনশন আরও বেড়ে গিয়েছিল।

১৫ আগস্টের মিটিংয়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্যার টমাস উইলিয়ামস তদন্ত কমিশন গঠন করার কাজে হাত দেন। তদন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি প্রথমেই মনোনীত করেন নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিখ্যাত আইরিশ কৌসুলি ম্যাকাব্রাইডকে। সন ম্যাকাব্রাইড ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনের প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু এবং চার জাতীয় নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যাপারে আইনগত কোনো বাধা আছে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করাও সন ম্যাকব্রাইডের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল । ১৯৭৭ সালে সন ম্যাকব্রাইড নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডগুলোর তদন্তে এসে আলোচনা করেন তৎকালীন বাংলাদেশের সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের সঙ্গে। সে সময় জিয়াউর রহমান ম্যাকব্রাইডকে এই হত্যাকাণ্ডগুলো বিচারের বিষয়ে এই বলে আশ্বাস দেন, 'আইন তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হবে। এরপর বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডগুলোর সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত ছিল, তাদের সবাইকে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে নিয়োগ দেওয়ার কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। স্যার টমাস উইলিয়ামস ভেবেছিলেন, সন ম্যাকব্রাইড যেহেতু এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত আছেন সেহেতু তাঁকে তদন্ত কমিশনের সদস্য মনোনীত করলে এই তদন্ত কমিশনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

কমিশনের অপর একজন সদস্য হিসেবে স্যার টমাস উইলিয়ামস মনোনীত করলেন জেফ্রি টমাস কিউসি এমপিকে। জেপ্রি টমাস ছিলেন লেবার পার্টির আইন বিষয়ক মুখপাত্র। ব্রিটেনে আইনমন্ত্রীর পদ না থাকায় জেফ্রিই আইন বিষয়ক মুখপাত্রই আইন বিষয়ক মন্ত্রীর এবং লেবার পার্টির এমপি। স্যার টমাস উইলিয়ামস জেফ্রি টমাসকে তদন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এই ভেবে যে, জেফ্রি টমাস তার আইন

বিষয়ক মেধাও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই কমিশনকে শক্তিশালী করে তুলতে পারবেন।

তদন্ত কমিশনের ব্যাপারে পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী স্যার টমাস উইলিয়ামস হাসিনা আপা ও ড. কামাল হোসেনকে ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪ টায় আলোচনা করার জন্য হাউস অব কমন্সে আসতে অনুরোধ করলেন। উনি জানালেন, এই আলোচনায় জেফ্রি টমাস, কনজারভেটিভ পার্টির আইন বিষয়ক মুখপাত্র ও কয়েকজন এমপি উপস্থিত থাকবেন। স্যার টমাস উইলিয়ামস আরো জানান, লন্ডনের এক বিখ্যাত সলিসিটার ফার্মের প্রধান অব্রেরোজও উপস্থিত থাকবেন। ব্রিটেনে সাধারণত ব্যারিস্টার অথবা কিউ, সিগণ কোনো না কোনো সলিসিটার ফার্মের মাধ্যমে মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই সলিসিটার ফার্মগুলো নির্দিষ্ট ব্যারিস্টার অথবা ব্যারিস্টারগণের পক্ষে যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করে থাকে। এমনকি ব্যারিস্টার অথবা কিউসি গণের পক্ষ হয়ে মক্কেলের সঙ্গে ফি-ও ঠিক করে থাকে। এই জন্য ব্রিটেনের একজন ব্যারিস্টার অথবা কিউসি আইন বিষয়ক কার্য সম্পাদনে এই সলিসিটার ফার্মগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

মিটিংয়ের নির্দিষ্ট দিনে ড. কামাল হোসেন ৩টার দিকে আমাদের বাসায় এলেন হাসিনা আপা ও আমাকে মিটিংয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কামাল হোসেন আমার কাছে জানতে চাইলেন বাড়িতে কোনো পোর্টেবল টাইপ রাইটার আছে কি না? আমি সম্মাতিসূচক জবাব দিতেই উনি বললেন, 'টাইপ রাইটার মেশিনটি আমাদের সঙ্গে নিয়ে নিলেই ভালো হয়, কাজে লাগতে পারে। 'ড. কামাল হোসেন সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় আমাদের বিয়ের পরপরই। আমি তাঁকে চাচা বলে সম্বোধন করি এবং তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আন্তরিক । কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, তিনি কথা বলার সময় আমাকে কখনো তুমি বলে সম্বোধন করেননি। মজার ব্যাপার হলো আপনি বলেও সম্বোধন করেননি। সব সময় তিনি আমাকে পরোক্ষভাবে সম্বোধন করে কথা বলতেন। যেমন কাজটা করে ফেললেই ভালো হয়, যাওয়া যেতে পারে ইত্যাদি। সেভাবে তিনি আজকেও পরোক্ষ ইঙ্গিতে সম্বোধন করে টাইপ রাইটারটি নিতে বললেন। আমরা যথাসময়ে হাউস অব কমন্সে উপস্থিত হলাম। স্যার টমাস উইলিয়ামসের সেক্রেটারি আমাদের

হাউস অব কমন্সের একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেখানে উপবিষ্ট লেবার পার্টির আইন বিষয়ক মুখপাত্র জেফ্রি টার্মস, কনজারভেটিভ পার্টির আইন বিষয়ক মুখপাত্র, লিবারেল পার্টির আইন বিষয়ক মুখপাত্র এই ক'জন এমপি ছাড়াও সলিসিটার অব্রে রোজের সঙ্গে স্যার টার্মস উইলিয়ামস একে একে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ

মিটিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই তদন্ত কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স স্থির করা। টার্মস অব রেফারেন্স ঠিক করতে গিয়ে প্রথমেই আলোচনার সূত্রপাত হয় বিদেশে বসে এই তদন্ত কমিশন গঠনের কোনো আইনগত ভিত্তি আছে কি না। ড. কামাল হোসেন বলেন, এর সুস্পষ্ট আইনগত ভিত্তি আছে। অপরদিকে জেফ্রি টমাস বিদেশে এইরূপ তদন্ত কমিশন গঠনের আইনগত ব্যাখ্যা এবং গৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। ড.কামাল হোসেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত মানব অধিকার সনদ উল্লেখ করলেন। ড. কামাল হোসেন ও জেফ্রি টমাসের কমিশন গঠন নিয়ে এ বিতর্কে অন্য উপস্থিত এমপিরাও অংশ নিলেন। এ সময় স্যার টমাস উইলিয়ামসকে আমি নীরব থাকতে দেখলাম। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল, এ বিতর্কের মধ্যদিয়ে কমিশন গঠনের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা বা টার্মস অব রেফারেন্স বেরিয়ে আসুক, সেটিই বোধ হয় টমাস উইলিয়ামস চাচ্ছিলেন। ড. কামাল হোসেন ও জেফ্রি টমাসের এই বিতর্কের শেষ পর্যায়ে জেফ্রি টমাসের এই বিতর্কের শেষ পর্যায়ে জেফ্রি টমাস ড. কামাল হোসেনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'এই কমিশন গঠন করার যৌক্তিকতা এখন আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' ড. কামাল হোসেন সেদিন যে নৈপুণ্যের সঙ্গে এই কমিশন গঠনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন তা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে।

টার্মস অব রেফারেন্স সম্পর্কে আলোচনা শেষ হতেই ড. কামাল হোসেন আমার কাছ থেকে পোর্টেবল টাইপ রাইটারটি চেয়ে নিয়ে এক আঙ্গুলের সাহায্যে অতিদ্রুত টার্মস অব রেফারেন্স টাইপ করে প্রথমেই স্যার টমাস উইলিয়ামসকে দেখালেন। স্যার টমাস উইলিয়ামসের মুখে হাসির রেখা দেখতে পেলাম। মনে হলো, একজন শিক্ষক কৃতী ছাত্রের সাফল্যে যে আনন্দ পান সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ তাঁর হাসির মধ্যে ফুটে উঠল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় স্যার টমাস উইলিয়ামস প্রধান কৌসুলি ছিলেন। এই মামলায় ড. কামাল হোসেন তার অন্যতম সহকারী হিসেবে কাজ করেন। সেই থেকে তাঁদের মাঝে বোধ হয় কৌসুলি হিসেবে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। টার্মস রেফারেন্সের কাগজটি এরপর হাসিনা আপার দিকে এগিয়ে দেওয়া হলো এবং জানতে চাওয়া হলো এই লেখায় তিনি সন্তুষ্ট কি-না। হাসিনা আপা টার্মস অফ রেফারেন্সটি পড়ার পর তাঁর সম্মতির কথা জানান। এরপর স্যার টমাস উইলিয়ামস একে একে উপস্থিত সব এমপিকে এটা দেখিয়ে তাদের সম্মতি নিলেন। সর্বশেষে সলিসিটার অব্রে রোজকে টার্মস অফ রেফারেন্স দিয়ে বললেন, আজ থেকে কমিশন গঠন করা হলো। এ ব্যাপারে তাঁর সলিসিটার ফার্ম যেন সব কাগজপত্র তৈরি করে। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো, আগামীকাল অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলন ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশন গঠনের ঘোষণা দেওয়া হবে।

১৯ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের হাউস অব কমন্সের নিকটবর্তী কুন্দন রেস্টুরেন্টে বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজনে স্যার টমাস উইলিয়ামসকে সাহায্য করেন যুক্তরাজ্যের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। এই কমিশন গঠন ও তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দেওয়ার প্রস্তুতি এখানকার বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের মাঝে ভীষণ সাড়া জাগায়। হাসিনা আপা ও রেহানাকে দেখলাম প্রচণ্ড উৎসাহী। মনে হলো, এই দু'জনের এতদিনের প্রাণের দাবি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ও তাঁর পরিবার এবং চার জাতীয় নেতার হত্যার বিচারের একটা ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পেরে এরা দু'জনেই কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য দিলেন স্যার টমাস উইলিয়ামস। উনি বললেন, 'কমিশনের প্রথম কাজ হলো আইনের অবস্থান নির্ধারণ এবং লন্ডন থেকে তা করা যেতে পারে। ইতোমধ্য প্রাপ্ত দলিলপত্র ও অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ যাচাই করা হবে। কমিশনের একজন কিংবা দু'জন সদস্য বাংলাদেশ সফরে যাবেন। স্যার টমাস আরো বলেন, 'কমিশনের দুটি মূল কর্তব্য হলো, (১) আইন তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হবে বলে জিয়া যে আশ্বাস দিয়েছে তা এখনো পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়নি কেন এবং (২) বাংলাদেশে প্রচলিত ফৌজদারি

আইনের আওতায় হত্যাকারীদের বিচার করা যায় কি-না তা নির্ধারণ করা। তদন্তের আগেই যদি মনে হয় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার জন্য আমরা বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলকে রাজি করানোর চেষ্টা করব।' স্যার টমাস আরো বললেন,'অ্যাটর্নি জেনারেলকে মামলা দায়ের করাতে রাজি করানো সম্ভব না হলে কমিশন বিষয়টি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কাছে পেশ করবে।'

সন ম্যাকব্রাইড বলেন, 'আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি অবজ্ঞার ফলে বর্তমান, দুনিয়ায় গুরুতর ব্যাপার অপরাধের জন্য প্রাপ্য শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার ঝোঁক দেখা দিয়েছে।' শেখ মুজিবের হত্যার পর ম্যাকব্রাইড মানসিকভাবে নিদারুণ আহত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর অন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে দুনিয়ার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন। হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পর্কে কোনোরকম তদন্ত না করার জন্য ম্যাকব্রাইড বাংলাদেশ

কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ১৯৭৭ সালে এ সম্পর্কে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আলোচনাকালে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়, 'আইন তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হবে।' একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে বলেও তাঁর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। ম্যাকব্রাইড বলেন, তিনি হত্যাকারীদের বিচার করার প্রতিশ্রুতি এখন পর্যন্ত কেন কার্যকর করা হয়নি তার কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করবেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যা তদন্ত কমিশনের পরবর্তী কাজে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কমিশনের দু'জন সদস্যকে বাংলাদেশে যাতায়াতের ভাড়া, সলিসিটার এবং জেফ্রি টমাস কিউসির ফি। এ জন্য প্রয়োজন দশ হাজার পাউন্ডের মতো। হাসিনা আপা যাওয়ার পরপরই সিদ্ধান্ত নিলাম এ অর্থ জোগাড়ের জন্য। আওয়ামী লীগ ও তার সংগঠন, যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধু অনুসারীরা এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাজ্যের চাঁদা তোলার ব্যাপারে অতীতে নানারকম ঝামেলা হয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি দ্বারা সংগৃহীত চাঁদা কিছু ক্ষেত্রে সঠিক কাজে ব্যবহার না হওয়া অভিযোগের কারণে এই কমিশনের চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা সতর্ক

হলাম। কমিশনের নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং ক্রস চেকের মাধ্যমে এই অ্যাকাউন্টের নামে চাঁদা তোলা এবং পরবর্তীকালে সমুদয় দেওয়া ব্যবস্থা করা হলো।

আমাদের সবারই ইচ্ছা ছিল ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে এই চাঁদা সংগ্রহের অভিযান শুরু করা। কিন্তু কামাল হোসেনের 'ধরি মাছ না ছুই পানি'র মতো ব্যবহার অনেককে অসন্তুষ্ট করে। এ ব্যাপারে আমরা ড. কামালকে না পেয়ে নিজেরাই বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে চাঁদা সংগ্রহে নেমে পড়লাম। ইস্ট লন্ডনে নেতৃত্ব দিলেন সমরু মিয়া, মোহাম্মদ সেলিম, আবু লাইস ও শফিক চৌধুরী, ওয়েস্টে নেতৃত্ব দেন আতাউর রহমান খান রমজান আলী। লুটনে নেতৃত্ব দেন মহিবুর রহমান ও আসকির মিয়া, এবং সাউথ লন্ডনে নেতৃত্ব দেন সামসুদ্দিন খান, সুলতান শরীফ, জোয়ার্দার ও হাসেম সাহেব। আমি যেহেতু সাউথ লন্ডনে থাকতাম, সেহেতু এই সাউথ লন্ডন গ্রুপের সঙ্গে চাঁদা তোলার কাজে নেমে পড়ি। আমরা কাজের দিনগুলোতে প্রায়ই রাত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ করে বাঙালিদের মালিকানা পরিচালিত রেস্টুরেন্টে চাঁদার জন্য যেতাম। ছুটির দিনগুলোতে আমরা দিনের বেলায় বের হতাম এই চাঁদা সংগ্রহে। কিছুদিন পরপরই আমরা মিলিত হতাম এবং বিভিন্ন গ্রুপের সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ জানতে এবং কী কী উপায়ে আরো চাঁদা সংগ্রহ করে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত টার্গেট পূর্ণ করা যায়। এ সময়টা ছিল শীতের মাস অর্থাৎ অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস। এই প্রচণ্ড শীতের মাসগুলোতে আমি প্রায়ই চাঁদা তোলার জন্য সামসুদ্দিন খান, সুলতান শরীফ ও হাসেম সাহেবের সঙ্গে যেতাম। মাইলের পর মাইল গাড়ি চালিয়ে কোনো ব্যক্তির বাসা অথবা কোনো একটি নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করতাম। আমাদের মতো অন্যান্য গ্রুপও একই পন্থায় কাজ করত। তখন ববির বয়স মাত্র ৬/৭ মাস হবে। রাতে বাসায় রেহানা ও ববিকে রেখে আমাকে এই চাঁদা তোলার জন্য যেতে হতো। এ ব্যাপারে রেহানা কখনো আপত্তি করেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার খারাপ লাগত এই ভেবে যে, ওদের রাতে একা ফেলে যেতাম। ছুটির দিনেও এই তিন মাসের প্রায়দিনই ববিকে সঙ্গ দিতে পারিনি। কিন্তু তা নিয়ে তখন বেশি ভাবার সময় ছিল না। কেননা আমাদের সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল তদন্ত কমিশনকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জোগাড় করে দিয়ে এর দু'জন সদস্যকে

বাংলাদেশে পাঠানো। শেষের দিকে আমরা যখন দেখলাম আমাদের আকাঙ্ক্ষিত টাকা সংগৃহীত হয়নি তখন আওয়ামী লীগের প্রত্যেক সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে আরো অর্থ জোগান দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ সদস্যের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এই ভালো না থাকা অবস্থায়ও তারা যেভাবে এতে সাড়া দিয়েছিল, তা দেখে আমার মনে হলো, প্রকৃত অর্থেই তারা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে এবং বঙ্গবন্ধুর যোগ্য অনুসারী।

তদন্ত কমিশনের সদস্যদের প্রথম শ্রেণীর দুটি বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করে ঢাকায় যাতায়াতের জন্য সলিসিটার অব্রে রোজকে বাংলাদেশ হাইকমিশনে ভিসার জন্য আবেদন করতে বলা হলো। জানুয়ারিতে ৮১' এর দ্বিতীয় সপ্তাহের একদিন অব্রে রোজ নিজেরও জেফ্রি টমাস কিউসির জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনে ভিসার আবেদন করলেন। নিয়মমাফিক পরদিন তাদের দু'জনের ঢাকায় যাওয়ার জন্য ভিসা পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু পরদিন হাইকশিমন থেকে অব্রে রোজকে জানানো হলো, তাদের ভিসার ব্যাপারে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অব্রে পরে ভিসা নিতে গেলে তাকে বলা হলো, এখনো ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তারা এই দু'জনের ভিসা ইস্যু করার ব্যাপারে কোনো নির্দেশ পায়নি। অব্রে রোজ যেন পরে এসে এ বিষয়ে খোঁজ নেন। এই কথা শুনে আমাদের মনে একটু সন্দেহের সৃষ্টি হলো। বঙ্গবন্ধু হত্যা তদন্ত কমিশনের হাইকমিশনার ছিলেন মি দোহা। আমরা জানতাম তিনি অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির লোক এবং তিনি জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষ করে চলতেন। ভিসা নিয়ে এহেন কালক্ষেপণ করার মধ্যে আমরা একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম।

আমাদের অনুমানই সত্য প্রমাণিত হলো। হাইকমিশন থেকে জানানো হলো, কমিশনের দু'জন সদস্য অব্রে রোজ এবং জেফ্রি টমাসের ভিসার আবেদন নাকচ করা হয়েছে। ভিসার ব্যাপারে অব্রে রোজের আবেদনের দিন থেকে প্রায় প্রতিদিন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীবৃন্দ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন। কমিশনের এই দু,জন সদস্যের ভিসা পাওয়ার সংবাদে তারা সবই ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়লেন। ইয়র্ক হলে হাসিনা আপার কমিশন গঠনের ঘোষণা থেকে

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের এসব নেতাকর্মী প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে কমিশনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তাদের মনে একটা আশা ছিল, এই কমিশন বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যাপারে একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। সামরিক সরকার কর্তৃক কমিশনের সদস্যদের ভিসা নামঞ্জুরের মাধ্যমে তাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল, এই সামরিক সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করা সম্ভব হবে না। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের এই আন্তর্জাতিক কমিশনের দাবি উপেক্ষা করে সরকার এটাই প্রমাণ করল, তারা প্রকৃতই হত্যাকারীদের দোসর।

হাসিনা আপা লন্ডন থেকে দিল্লি ফিরে গেলেন সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে। হাসিনা আপার লন্ডন অবস্থান রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ পঁচাত্তর পরবর্তীকালে তাঁর সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এই লন্ডন অবস্থানকালেই ঘটে। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক সভা, বঙ্গবন্ধু হত্যা তদন্ত কমিশন গঠন, নেতৃস্থানীয় ব্রিটিশ এমপি, ইউরো এমপি, হাউস অব লর্ডসের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ এই সফরের অন্যতম ফসল। এ ছাড়া অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস গ্রুপ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, বিদেশি খবরের কাগজ ও মিডিয়ার সম্পাদক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ ব্রিটেনের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এ সময়েই। মোটকথা '৭৫ পরবর্তীকালে এই প্রথম বোধ হয় হাসিনা আপার আন্তর্জাতিক পরিচিতি আসে। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও তাঁর অংশগ্রহণের প্রস্তাব এ সময় বোধ হয় বিশেষভাবে আসতে থাকে। হাসিনা আপার কাছ থেকেই আমার শোনা যে, কামাল হোসেন সাহেব তাঁকে বলেন, প্রেসিডিয়াম সিস্টেম চালু করার একটা চিন্তাভাবনা চলছে এবং তিনি হাসিনা আপার প্রস্তাবিত প্রেসিডিয়ামের একজন সদস্য হওয়ার অনুরোধ জানান। উত্তরে হাসিনা আপা বলেন, তিনি প্রথম অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য হিসেবে কাজ করতে চান। এই জন্যে যে, এর মাধ্যমে নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হবে ও তাতে আওয়ামী লীগের ' ৭৫ উত্তর রাজনীতি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল হবেন। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সম্পর্কে জানার আগ্রহেই বোধ হয় লন্ডনে আসার কিছুদিন পর তিনি ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি

জনাব মোহাম্মদ হানিফকে লন্ডনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। হানিফ ভাই বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর একান্ত সচিব ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও বহু বছর তিনি বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু পরিবারের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। হানিফ ভাই লন্ডনে প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সময় আমাদের সঙ্গে কাটান। খোকা চাচা হানিফ ভাইয়ের থাকার সমস্ত বন্দোবস্ত এ সময় করেন। ঢাকাসহ বাংলাদেশের রাজনীতির বিস্তারিত খবর ও নেতাকর্মীদের অবস্থান সম্পর্কে হানিফ ভাই হাসিনা আপাকে অবহিত করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যে সময় তিনিও হাসিনা আপাকে রাজনৈতিকভাবে আরও একটু সক্রিয় ও বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার অনুরোধ করেন। পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের তিনি তখন সাধারণ সম্পাদক।

হাসিনা আপা লন্ডনে আসার দিন থেকেই বঙ্গবন্ধুর অনুসারী ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে থাকেন। হাসিনা আপা অত্যন্ত সহজভাবে তাদের গ্রহণ করতে এবং মুহূর্তে আপন করে নিতে পারতেন যা দেখে আমার মনে হয়েছে তিনি সহজেই নেতাকর্মীদের মন জয় করে নিতে পারবেন। তাঁর মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে, যা কর্মীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। লন্ডনের প্রথম জনসভা নিঃসন্দেহে হাসিনা আপার বাংলাদেশের সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশের প্রথম দৃপ্ত পদক্ষেপ। দেশ থেকে যোজন যোজন দূরে অনুষ্ঠিত হলেও এই নেতৃত্ব আরও সুসংহত করেছে। এক কথায় বলা যায়, এ সভাতেই হাসিনা আপা অভিষিক্ত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের সময়োপযোগী এক সুযোগ্য নেত্রীরূপে। তাই হাসিনা আপার এই প্রথম জনসভার সার্থকতা তাঁর হাজারো জনসভাকে ছাপিয়ে যায়।

ড. শিহাব শাহরিয়ার

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভানেত্রী, এদেশের গণ-মানুষের নন্দিত জননেত্রী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা এবং বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের পথযাত্রী। শুভ শুভ শুভ দিন, শেখ হাসিনার জন্মদিন।

শেখ হাসিনা। একেবারেই সাধারণ এবং আটপৌরে একটি নাম। 'শেখ' পারিবারিক পদবী। আরবী শায়ক থেকে শেখ আর হসীন থেকে হাসিনা। সাধারণ নামের এই মানুষটি অসাধারণভাবে জয় করেছেন বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়। সারাবিশ্বের ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর খ্যাতি।

নদী মেখলা বাংলাদেশের প্রিয় মধুমতি নদীর তীরে শ্যামল স্নিগ্ধ প্রত্যন্ত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। বাবা শেখ মুজিবুর রহমান ও মা বেগম ফজিলাতুন্নেসার প্রথম সন্তান তিনি। দাদা শেখ লুৎফর রহমান ও দাদি সায়েরা খাতুন আদর করে প্রিয় নাতনিকে ডাকতেন হাসু।

পাখিডাকা, ধুলিমাখা, ছায়াঘেরা সবুজ পাড়াগাঁও টুঙ্গিপাড়ায় কেটেছে শেখ হাসিনার শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো। পড়াশোনার হাতেখড়ি সেখানেই। বাবা শেখ মুজিবকে কদাচিৎ কাছে পেতেন, কারণ তৎকালীন পুর্ববাংলার তিনি ছিলেন জাতীয় নবজাগরণের পথিকৃত। সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে। জেল-জুলুম অত্যাচার সহ্য করে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। নিজের ঘরের দিকে তাকাবার তেমন সময় ছিল না তাঁর। তখনো তিনি বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেননি। কিন্তু এদেশের মানুষের কাণ্ডারি হয়ে উঠেছেন।

শেখ হাসিনার ভাইবোনেরা হলেন শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা ও শেখ রাসেল। পরিবারে বড় সন্তান বলে একটু বেশিই আদর পেয়েছেন বড়দের কাছ থেকে। আর শৈশবেই পেয়েছেন আবহমান বাংলার

ধুলি-মাটির গন্ধ। পেয়েছেন সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ। আত্মস্থ করেছেন লোক বাংলার সংস্কৃতি।

১৯৫৪ সালে শেখ হাসিনা পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় আসেন। কারণ বাবা শেখ মুজিব ওই বছর প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঢাকায় এসে উঠেন রজনী বোস লেনের একটি ভাড়াটিয়া বাসায়। এরপর বাবা মুজিব যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য হলে তারা পুরনো ঢাকা থেকে ৩ নম্বর মিন্টু রোডের বাসায় এসে উঠেন।

এসময় পাকিস্তান সরকার মন্ত্রী পরিষদ ভেঙে দেয় এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। এ জন্য তারা আবার আবদুল গনি রোডের বাসায় এসে উঠেন। ১৯৬৫ সালে শেখ হাসিনা ভর্তি হন টিকাটুলির নারীশিক্ষা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ে। গ্রামের স্মৃতি রেখে শুরু হল নগর জীবন।

বর্তমান বাঙালির কেন্দ্রে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িতে বাবা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে শেখ হাসিনা সপরিবারে উঠেন ১ অক্টোবর ১৯৬১ সালে।

শেখ হাসিনা আজিমপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সাল মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। ভর্তি হন বর্তমান বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে।

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর বড় কন্যা শেখ হাসিনা বাবার রাজনৈতিক চেতনা, চর্চা ছোটবেলা থেকেই দেখে ও উপলব্ধি করে আসছেন। সেকারণে রাজনৈতিক চেতনা তাঁর ভেতরেই গড়ে উঠছিল। তিনি তৎকালীন বকসী বাজার গার্লস কলেজের ছাত্রী-সংসদের সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত হন। এসময় তিনি ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সেই সময়েই তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনাকে বিশিষ্ট পরমানু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় বঙ্গবন্ধুকে জেলখানা থেকে আসতে দেওয়া হয়নি বরং তাঁর পরিবারের উপর নির্যাতন করে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকার।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনাও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার ও

বাঙালি হত্যাযজ্ঞ শুরু করে এবং তাঁর পরিবারকেও ভয়াবহ নির্যাতন করে। এ বছরেই ২৭ জুলাই শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান জয়'র জন্ম হয়। হাসপাতালে বেগম মুজিবকে যেতে দেয়নি জালেম সরকার। ১৯৭২ সালে ৯ ডিসেম্বর তাঁর দ্বিতীয় কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের জন্ম হয়। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি বি এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার সময় ছোটবোন রেহানাসহ তিনি বিদেশে ছিলেন। হত্যাকারীদের রোষানল থেকে রেহাই পেতে আর দেশে ফেরা হয় না।

প্রিয়জনদের স্মৃতি বুকে নিয়ে, প্রিয় মাতৃভূমিতে না ফেরার বেদনা নিয়ে শুরু হয় দুঃসহ প্রবাস জীবন।

বেদনাকে জয় করে নির্বাসিত জীবনেই জাতির জনকের নির্মম হত্যার বিচার, দেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিশ্ব জনমত গড়তে কাজ শুরু করেন। ১৯৮১ সালে ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে তাঁকে দলের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। সে বছরেই ১৭ মে সামরিক জান্তা জিয়াউর রহমানের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বৃষ্টিভেজা দিনে বাঙালির ভালবাসায় সিক্ত হয়ে স্বদেশের পবিত্র মাটিতে ফিরে আসেন। এরপর আন্দোলন ও সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে বাংলার গণতন্ত্রকামী সংগ্রামী মানুষের নন্দিত জননেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

দুঃসহ প্রবাস জীবন ও বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া এবং সরকার পরিচালনার মহান দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে যে অবসর সময় পান সে সময়ের মধ্যে তিনি লেখালেখিও করেন। ইতোমধ্যে তাঁর রচনা ও সম্পাদনায় বেরিয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই। যেমন : 'ওরা টোকাই কেন, বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম, সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র, দারিদ্র্য দূরিকরণ: কিছু ভাবনা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন, আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম, বাংলা আমার আমি বাংলার, বাংলাদেশের সংসদে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু,' লেখাগুলো তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

'এশিয়া এওয়ার্ড' পুরস্কার ও ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার, পদক, সম্মাননা ডিগ্রি লাভের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে,

বাংলাদেশ ও বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান অনস্বীকার্য। সেজন্যই তিনি গণতন্ত্রের মানসকন্যা, শান্তির পথযাত্রী।

বর্ণাঢ্য এক সংগ্রামমুখর জীবন তাঁর। বাবা জাতির পিতাকে তেমন কাছে পাননি, মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ছিলেন গৃহবন্দী, পঁচাত্তরে প্রবাসে অবস্থানকালীন সময়ের হারিয়েছেন প্রিয় পরিবারকে, তারপর স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিএনপি-জামাত জোট জালেম সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বার বার শক্রর হামলা ও মৃত্যুর কাছে থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া বাঙালিদের এক প্রাণের মানুষ শেখ হাসিনা।

তাঁর আজীবনের স্বপ্ন বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, এই শ্যামল-সবুজ বদ্বীপ বাংলাদেশকে সোনার বাংলা, উন্নত বাংলা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে নির্মাণ করা। জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়ছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র ও শান্তির পক্ষে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

শেখ হাসিনা আপনার জয় হোক। আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করুন। আপনি বাঙালিদের কাণ্ডারি, আলোর দিশারী, স্বপ্নদ্রষ্টা। আপনার স্বপ্নের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকবে প্রিয় বাংলাদেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানস কন্যা, শান্তির পথযাত্রী, জাতির জনকের সুযোগ্য উত্তরসূরি আপনাকে আবারো প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আমরা আপনার শান্তি ও মঙ্গলময় জীবন কামনা করি। আপনার মাধ্যমেই দেখি ফুল, পাখি, নদী আর শ্যামল বাংলাদেশ।

ড. হারুন-অর-রশিদ

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাঁইত্রিশ বছর ॥ কী পেল বাংলাদেশ

১৭ মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড পরবর্তী ৬ বছর বিদেশে নির্বাসিত থাকতে বাধ্য হয়ে অতঃপর সাঁইত্রিশ বছর পূর্বে ১৯৮১ সালের ১৭ মে তিনি তাঁর স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন। সে সময়ে দেশে চলছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানের বেসামরিক লেবাসে সেনা-গোয়েন্দা নিয়ন্ত্রিত শাসন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে একদল সেনা-সদস্যের হাতে জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার এক বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন (২৫ মার্চ ১৯৮২)। শুরু হয় জেনারেল এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছর সেনাশাসন।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ক্ষমতাসীন মোশতাক, জিয়া সরকার বাংলাদেশকে একটি মিনি পাকিস্তানে পরিণত করেছিল। ১৯৭৫-১৯৭৯ পর্যন্ত একটানা সামরিক শাসন চলে। জনগণের সর্বপ্রকার মৌলিক অধিকারহরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পুরস্কৃত করা হয়। তাদের যাতে ভবিষ্যতে বিচার না হতে পারে সে জন্য জারি করা হয় কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' (সেপ্টেম্বর ১৯৭৫)। মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ-রাষ্ট্র গঠনের চেতনাকে ভূ-লুণ্ঠিত করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার পক্ষের বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী-সমর্থকদের ওপর নেমে আসে সরকারি চরম নির্যাতন-নিপীড়ন। রাতের আঁধারে গোপন স্থানে শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। অপরদিকে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া সংবিধানকে কেটে-ছেটে বিকৃত করা হয়। '৭১ এ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগী ও গণহত্যায় জড়িত নিষিদ্ধ থাকা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল-গোষ্ঠীসমূহকে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়। ধর্ষণ-হত্যা-অগ্নিসংযোগ, অন্য কথায় যুদ্ধাপরাধের দায়ে গ্রেফতারকৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়। এমনি

এক শ্বাসরুদ্ধকর, বিভীষিকাময় রাজনৈতিক পটভূমিতে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বিদেশে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি মতিঝিলের ইডেন হোটেলে তিন দিনব্যাপী আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওই কাউন্সিল অধিবেশনকে সামনে রেখে দলের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব চরমরূপ লাভ করে। দল নিশ্চিত ভাঙনের দোরগোড়ায় পৌঁছে। এমনি এক অবস্থায় বলতে গেলে নাটকীয়ভাবে সবপক্ষের সম্মতিক্রমে কাউন্সিলে শেখ হাসিনা দলের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। দল নিশ্চিত ভাঙনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪ বছর। সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর প্রতিনিধির সঙ্গে ২৪ ফেব্রুয়ারি একটি সাক্ষাতকার দেন, যা পরেরদিন আজাদ পত্রিকায় 'আওয়ামী লীগ সভানেত্রী হওয়াতে উল্লাসিত হওয়ার কারণ দেখি না' শিরোনামে ছাপা হয়। সাক্ষাতকারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে তাঁর মানস ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা দৃঢ় দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য: হারুন-অর-রশিদ, মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬, বাংলা একাডেমি ২০১৬, পৃ. ৪৬২-৪৬৩; আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য, ওই, পৃ. ২০১-২১৮)।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানাতে সেদিন কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে লাখো জনতার সমাবেশ ঘটে। বিমানবন্দর থেকে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডি পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষা-এক নজর তাঁকে দেখা। রাজধানী ঢাকা শহর সেদিন পরিণত হয়েছিল মিছিলের নগরীতে। কালবৈশাখী ঝড় ও প্রবল বৃষ্টি কিছুই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনাকে এতটুকু বিঘ্নিত করতে পারেনি। শেখ হাসিনাকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করলে সৃষ্টি হয় এক আবেগঘন মুহূর্ত। আনন্দ আর বিষাদের অশ্রু দিয়ে দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনতা তাঁকে বরণ করে নেয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে প্রকৃতিও যেন তাতে যোগ দেয়। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে বৃষ্টিতে ভিজে লাখো জনতা মিছিল সহযোগে তাদের প্রিয় নেত্রীকে নিয়ে আসে বাঙালির জাতীয় মুক্তির সূতিকাগার, জাতির জনকের স্মৃতিঘেরা ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়ির সম্মুখে,

যেখানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত হয় গ্রীক ট্র্যাজেডির চেয়েও করুন ও মর্মান্তিক এক বিয়োগান্তক ঘটনা-জাতির জনকসহ পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্যের রক্তাক্ত, নিষ্ঠুর, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। কিন্তু বাড়ির ভেতর প্রবেশ করার সুযোগ পেলেন না শেখ হাসিনা। তখনও শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক সেটি ছিল অযত্ন-অবহেলায় সিল করা অবস্থায় ফেলে রাখা।

বাংলার মাটিতে পা রেখে এই মাটি ছুঁয়ে শেখ হাসিনা সেদিন জাতির পিতা ও একাত্তরের শহীদদের রক্তের নামে ১৫ আগস্টের হত্যাকারীদের বিচার, সেনা শাসকদের কবল থেকে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার উদ্ধার এবং মুক্তিযুদ্ধের ধারায় দেশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার শপথ নিয়েছিলেন। শুরু হয় তাঁর জীবনের নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্ন এক কঠিন সংগ্রাম।

এ পর্যায়ে জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্বভার গ্রহণের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার পূর্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে খানিকটা আলোকপাত করা যাক। রাজনৈতিক পরিবারে তাঁর জন্ম (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল)। রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই তিনি বেড়ে ওঠেছেন। জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে অনেক কিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কখনও কখনও সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৫৪ ও ১৯৫৬-৫৭ সালে পিতার স্বল্পকালীন মন্ত্রিত্বের সময় মিন্টো রোডের বাসায় থেকেছেন। আবার পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে ১২ বছর বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনকালীন নানা দুরাবস্থা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে প্রথমে আজিমপুর গার্লস স্কুল, এরপর ইডেন গার্লস কলেজ, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাকালীন শেখ হাসিনা সক্রিয় ছাত্র রাজনীতিতে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি ছিলেন ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। '৬৬-এর ৬-দফা আন্দোলন, '৬৮-এর আগরতলা মামলা-বিরোধী ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তিনি রাজপথের মিছিলে শামিল হয়েছেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়, বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্ত র না করে আলোচনার নামে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়ার কালক্ষেপণ ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২ থেকে ২৫ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ পালন ও বাঙালি জাতির উত্থান, ২৬ মার্চ পাক হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে

বঙ্গবন্ধুর সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পরিশেষে, ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, এ সবই তিনি (শেখ হাসিনা) অতি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন '৫২-এর ভাষা-আন্দোলন শিশু বয়সে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী (তখন বয়স মাত্র ৫ বছর) শেখ হাসিনার ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল, বঙ্গবন্ধুর লেখায় তা এভাবে ফুটে ওঠে :

'পাঁচ দিন পর বাড়ি পৌছালাম... হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, 'আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, ঢাকা ২০১২, পৃ. ২০৭)। এরপর বঙ্গবন্ধুর মন্তব্য, '২১ ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে' (ঐ, পৃ. ২০৭)।

১৯৭৫ সালে স্বামী পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিঞার সঙ্গে বিদেশে থাকায় শেখ হাসিনা ও একমাত্র ছোট বোন শেখ রেহানা প্রাণে বেঁচে যান। অন্যথায়, মা-বাবা-ভাই, ১০ বছরের শিশু রাসেলসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্য সবার মতো খুনীদের হাতে নিশ্চিতভাবে এ দুই বোনকেও ১৫ আগস্টের নিষ্ঠুর ভাগ্যবরণ করতে হতো। এর পর তাঁকে দীর্ঘ ৬ বছর দেশের বাইরে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনে সক্ষম হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের বিপুল সমর্থন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে শেখ হাসিনার দ্বিতীয়বারের সরকার গঠন। নানা অজুহাতে দেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি ও এর রাজনৈতিক সহযোগী, যুদ্ধাপরাধী জামাতে ইসলামীর নির্বাচনের পথ পরিহার করে ভিন্ন পন্থায় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে দেশে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তিনি এককভাবে যে দৃঢ়তা, দুরদর্শিতা ও সাহসী নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য শিক্ষণীয়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্ব আজ বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে সমাদৃত। এখানে পৌছাতে তাঁকে অনেক চ্যালেঞ্জ আর বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে। একাধিকবার গ্রেফতার

হয়েছেন, কারাগারে থেকেছেন। ২০০৭-২০০৮ সালে সেনাসমর্থিত তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রায় বছরকাল সাবজেলে তাঁর নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন কেটেছে। একের পর এক হয়রানিমূলক মামলা হয়েছে। প্রহসনমূলক বিচারের আয়োজন হয়েছে। রাজনীতি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর কিংবা দেশের বাইরে নির্বাসনে পাঠানোর অপচেষ্টাও হয়েছে। বিগত সময়ে ২৩-২৪ বার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ২০০৪ সালের গ্রেনেড হামলা, যাতে নারী নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান এবং কয়েকশ' লোক আহত হন। বলার অপেক্ষা রাখে না, ঘাতকদের মূল টার্গেট ছিল শেখ হাসিনা। অলৌকিকভাবে তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রধান দিক হচ্ছে, তিনি জাতির পিতার কন্যা। বঙ্গবন্ধুর রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহমান। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'ই ছিল তাঁর রাজনীতি। পিতার অনেক আদর্শই শেখ হাসিনা জেনেটিক্যালি পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে বঙ্গবন্ধু ভক্ত এ দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়জুড়ে তিনি রয়েছেন। তাদের স্নেহ ও ভালবাসায় তাঁর জীবন সিক্ত। দ্বিতীয়ত. তাঁর রয়েছে আওয়ামী লীগের মতো এমনই একটি অভিজ্ঞ, ঐতিহ্যবাহী, সুদৃঢ় সংগঠন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যার রয়েছে অসংখ্য কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী; যে দল দেশের বৃহত্তম; যে দল কালোত্তীর্ণ (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯) এবং নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান; যার রয়েছে এদেশের স্বাধীনতাসহ যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর তার সিংহভাগ অর্জনের মূল কৃতিত্ব। তৃতীয়ত. তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে সৎ, সাহসী, দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মপ্রত্যয়ী রাজনৈতিক নেতৃত্বের বড়ই অভাব। সেক্ষেত্রে, শেখ হাসিনা ব্যতিক্রম এবং তিনি নেতৃত্বের এসব গুণের অধিকারী। চতুর্থত. শেখ হাসিনা ব্যক্তিজীবনে যেমন খুবই ধর্মপ্রাণ, তেমনি একই সঙ্গে সেক্যুলার। প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সেক্যুলারিজমের কোন বিরোধ নেই। বাংলাদেশের মানুষও একই সঙ্গে ধর্মপ্রাণ ও অসাম্প্রদায়িক। এটি হচ্ছে আমাদের দীর্ঘ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আমাদের দেশের রাজনীতিতে তাই শেখ হাসিনা হচ্ছেন, এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সার্থক প্রতিনিধি। পঞ্চমত. শেখ হাসিনা

মনেপ্রাণে একজন আধুনিক মানুষ। ১৯৮১ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের অনেক পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসের তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলা ভাষায় রয়েছে প্রভূত দখল। তিনি একাধিক গ্রন্থেরও প্রণেতা। ষষ্ঠত. অতীত সম্বন্ধে তিনি যেমন সচেতন, তেমনি একই সঙ্গে ভবিষ্যৎমুখীও। তাঁর 'ভিশন-২০২১' এরই সার্থক প্রমাণ। শেষত. বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনা হচ্ছেন সেক্যুলার-ডিমোক্র্যাটিক ধারার প্রধান প্রতিনিধি এবং স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ঐক্যের প্রতীক।

বাংলাদেশের রাজনীতি তথা সার্বিক উন্নয়নে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের উজ্জ্বলতম অর্জনসমূহ হচ্ছে-সকল প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করা, সেনা শাসনের হাত থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে (১৯৯৭) ওই অঞ্চলের প্রায় দু'দশক ধরে চলমান সশস্ত্র সংঘাতের অবসান, নারীর ক্ষমতায়ন, সার্বজনীন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন (২০১০), নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ ও লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী (৩ জুলাই ২০১১)-এর মাধ্যমে '৭২-এর সংবিধানের ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি প্রতিস্থাপন, সাধারণ দারিদ্র্যের হার ২৪% ও অতিদারিদ্র্য ১২% এ নামিয়ে আনা, বৃদ্ধির হার ৭.৬৫% এবং শিক্ষার হার ৭১ ভাগে উন্নীত করা, ১৬ হাজারের অধিক কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন, ১৮ হাজর মেগাওয়াটের অধিক বিদ্যুত উৎপাদন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় জঙ্গীগোষ্ঠীর উত্থান রোধ, দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করা, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা ও রায় কার্যকর করা, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা-বিরোধ নিষ্পত্তি, ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ছিটমহল সমস্যার সমাধান ও দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের নারী-পুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে ১০ লক্ষাধিক জীবন বিপন্ন রোহিঙ্গাকে শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আশ্রয় দান, বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ইউনেস্কো-স্বীকৃতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সর্বজনীন রূপায়ণ এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ভিশন-২০২১,

স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্তির জাতিসংঘের স্বীকৃতি অর্জন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

একটি দেশ বা জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কীরূপ ভূমিকা পালন করে, তা দ্বারা নেতৃত্বের স্থান নির্ধারিত হয়। মুস্তফা কামাল পাশাকে বলা হয় আধুনিক তুরস্কের জনক বা আতাতুর্ক। মাহাথির মোহাম্মদ হচ্ছেন মালয়েশিয়ার বর্তমান উন্নতি-অগ্রগতির স্থপতি। জওয়াহারলাল নেহরুকে মনে করা হয় আধুনিক ভারতের পথিকৃত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন বাঙালির জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার মহানায়ক। আবার, বিভিন্ন দেশে এমন অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্ব রয়েছে, ইতিহাসে যাদের অবস্থান অতি সাধারণ এবং জনমনে থাকেন বিস্মৃত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের মূল্যায়ন কী হবে? গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার অর্জন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি, এক কথায়, দেশের ও জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণে বিগত ৩৭ বছর ধরে তিনি যে ভূমিকা পালন করে আসছেন, সে-সব বিবেচনায় আমাদের জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধুর পর তাঁর স্থান সর্বশীর্ষে। সামগ্রিকভাবে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শিক ছায়াতলে বেড়ে ওঠে শেখ হাসিনা নিজগুণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের বিশেষ একটি স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি জাতিকে অনেক দিয়েছেন। এরপরও তাঁর কাছে জাতির প্রত্যাশা আরও অনেক, কেননা তিনি শুধু রাজনীতিক বা প্রধানমন্ত্রী নন, 'মাদার অব হিউম্যানিটি', তিনি জাতির পিতার কন্যা।

ডাঃ কামরুল হাসান খান

মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় শেখ হাসিনার অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন 'বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 'একটি স্বাধীন, সার্বভৌম সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার।' বাংলার মানুষের সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছিলেন রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালা। বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হলে চাই একটি স্বাস্থ্যবান জাতি। এজন্য তিনি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি গ্রহণ করেছেন সময়োপযোগী পদক্ষেপ। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে একটি শক্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা, অবকাঠামো রেখে গেছেন যার ওপরে গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বনন্দিত অনেক কার্যক্রম। বঙ্গবন্ধুর তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসা সেবার জন্য থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প আজও বিশ্বে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার এক সমাদৃত মডেল। বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রয়েছে-

১. আইপিজিএমআর (পিজি হাসপাতাল) কে শাহবাগে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল হিসেবে স্থাপন, ২. বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) প্রতিষ্ঠা, ৩. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এ্যান্ড সার্জন্স (বিসিপিএস) প্রতিষ্ঠা, ৪. স্যার সলিমুল্লা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, ৫. ১৯৭৩ সালে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান, ৬. চিকিৎসকদের সরকারী চাকরিতে ১ম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান, ৭. নার্সিং সেবা এবং টেকনোলজির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, ৮. উন্নয়শীল দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূলনীতি হলো- Prevention is better than cure এ নীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন নিপসম-১৯৭৮-সালে।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর সুদীর্ঘ ২১ বছর চলেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত ধারায় পাকিস্তানী ভাবধারা অনুসরণ করে। যে কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সকল উন্নয়ন ব্যাহত হয়, বঞ্চিত হয় সাধারণ মানুষ। দেশে বিএমএর নেতৃত্বে চিকিৎসকদের দীর্ঘ তুমুল আন্দোলন হয়েছে, ডা. মিলন জীবন দিয়েছে গণমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের জন্য। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণ করার পর চিকিৎসকদের কোন আন্দোলন করতে হয়নি, বিষয়গুলো উনার নজরে আনলেই বাস্তবায়ন হয়েছে। দ্রুতই চিকিৎসকদের সকল দাবি পূরণ হয়েছে। বাস্তবায়ন হচ্ছে গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম। ২১ বছর লড়াই সংগ্রাম নির্যাতনের পর ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন জননেত্রী শেখ হাসিনা বাবার আজীবন লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে সরকার পরিচালনায়ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অগ্রগণ্য থাকে। দেশের মানুষ, চিকিৎসক, সমাজসহ সকল শ্রেণিপেশার প্রস্তাব-পরামর্শ ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন দেশে একটি গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে অধ্যাবধি বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও মেডিক্যাল শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আজকে বিশ্বের দরবারে সমাদৃত। শেখ হাসিনার তিন দফায় দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে-

১. কমিউনিটি ক্লিনিক : প্রতি ৬০০০ গ্রামীণ জনগণের জন্য একটি করে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৯৬ সালে এবং ১৯৯৮-২০০১ এর মধ্যে ১০,০০০ এর অধিক চালু করা হয়েছিল যার সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর কেবল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে জনগণের অতি প্রয়োজনীয় এ সুবিধা বন্ধ করে দেয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করেন। বর্তমানে ১৩ হাজার ৭০০টি ক্লিনিক চালু আছে। যেখান থেকে ৩০ রকমের ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান, স্বাভাবিক প্রসব ব্যবস্থা, টীকাদান কর্মসুচিসহ নানা ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক এখন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি অতি জনপ্রিয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

২. মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় : দেশের চিকিৎসকদের তিন দশকের দাবি ছিল মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। এর আগে অনেক সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বাস্তবায়ন করেনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ১৯৯৭ সালের ৩১ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারি আদেশ প্রদান করেন যার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল। এ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মেডিক্যাল শিক্ষা, সেবা এবং গবেষণায় বিশ্ব সেরা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবার ক্ষমতায় এসে আরও তিনটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং সিলেটে।

৩. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি : ১৯৯৬ সালের আগে এদেশে কোন সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনীতি ছিল না। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির দাবিতে অনেক আন্দোলন হয়েছে, ষড়যন্ত্র হয়েছে। শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে ১৯৯৬-এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সর্বদলীয় কমিটি এবং সাধারণ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে সর্বজন গ্রহণযোগ্য জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০০ প্রণীত হয়। এ স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ সালে আবার যুগোপযোগী করা হয়।

৪. মেডিক্যাল শিক্ষা : ২০১০-২০১৮ পর্যন্ত নতুন ২৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ (এর মধ্যে ৫টি সামরিক বাহিনীর অধীনে), ৬টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ১৪টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। নতুন ১৬টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল এবং ৪টি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

৫. জাতীয় ওষুধ নীতি : ওষুধ শিল্প এখন বাংলাদেশের গৌরবের শিল্প। দেশের ৯৭% চাহিদা পূরণ করে ১০১টি দেশে রফতানি করছে। ওষুধের মান এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতীয় ওষুধ নীতি যুগোপযোগী করা হয়েছে।

৬. অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা : এ ধরনের রোগে আক্রান্ত শিশু এবং শিশুর অভিভাবকরা এক অসহায় দুর্বিষহ জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদের বিশেষ উদ্যোগে দেশে অটিজম বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠে এবং এ শিশুদের পুনর্বাসনের নানা উদ্যোগ

গ্রহণ করা হয়। এখন এ শিশুরা আর অবহেলিত নয় এবং এদের অভিভাবকরা অসহায় নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এ্যান্ড অটিজম (ইপনা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২২টি সরকারি ও বেসরকারী হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৭. ক্লিনিক্যাল সেবা

ক. ১৯৯৬-২০০১ সালে

১. শেরে-বাংলানগর ৪০০ শয্যার শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ৪০০ শয্যার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, কিডনি হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, মানসিক হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকার আজিমপুরে ১৭৫ শয্যার মা ও শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকার মাতুয়াইলে ২০০ শয্যার শিশু হাসপাতাল ও মাতৃ-স্বাস্থ্য ইনস্টটিউট, ৬০০ শয্যার ডিএমসিএইচ-২ ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা যা এ সময়ে বাস্তবায়ন হয়েছে, ২০ তলা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা ভবন নির্মাণের কাজে হাত দেয়া যা বর্তমানে বাস্তবায়িত হয়েছে, ২. ঢাকার মিরপুরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ঢাকা ডেন্টাল কলেজের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

খ. ২০০৯ থেকে অধ্যাবধি

১. এ সময়ে ১৩টি নতুন হাসপাতাল এবং ১০ হাজার ৬৬২টি নতুন হাসপাতাল শয্যা যুক্ত হয়েছে। কুর্মিটোলা ও মুগদার ৫০০ শয্যার হাসপাতাল, ৩০০ শয্যার ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স, তেজগাঁও- এ ৩০০ শয্যার নাক-কান-গলা ইনস্টটিউট, গোপালগঞ্জে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, শেখ ফজিলাতুন্নেছা চক্ষু হাসপাতাল, ২. শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট : প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ অক্টোবর এর কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। ৫০০ বেডের এ হাসপাতালটি বিশ্বের অন্যতম বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতাল, ৩. বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান সরকারের সহযোগিতায় ১০০০ শয্যার সুপার স্পেশাইসড হাসপাতাল নির্মাণাধীন।

৮. চিকিৎসক নিয়োগ ও পদোন্নতি :

ক. বিসিএসের মাধ্যমে ৯ হাজার ৯৪৪ জন চিকিৎসকসহ এই সরকারের আমলে ১৪ হাজার ৭৭ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে

১০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া চলছে যাতে তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসক সঙ্কট না থাকে, খ. পিএসসির দীর্ঘসূত্রিতার পরিবর্তে মেডিক্যাল শিক্ষকদের পদোন্নতি ডিপিসি এবং এসএসবির মাধ্যমে নেয়া-এ সরকারের জন্য একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল। ইতোমধ্যে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং কনসালট্যান্ট হিসেবে ৫ হাজার ৯০০ চিকিৎসককে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে, গ. চিকিৎসকদের প্রশাসনিক পদে ২২০০ জনকে এবং স্কেলের মাধ্যমে ৮০০০ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

৯. নার্সিং পেশা :

ক. নার্সদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে, খ. ১৫ হাজার নতুন নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে, গ. নার্সিং জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ১২টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। ৭টি ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। ঘ. নার্সদের উচ্চ শিক্ষার জন্য মুগদায় কোরিয়ান সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে National Institute of Advanced Nursing education and Research (NIANER) যেখানে ইতোমধ্যে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে, ঙ. নতুন করে জনবল কাঠামোসহ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদফতর সৃষ্টি করা হয়েছে, চ. বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী কাউন্সিল আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০. ডিজিটাল স্বাস্থ্য :

ক. ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে গ্রাম পর্যায়ের মাঠকর্মী থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপজেলা, জেলা এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের সকল হাসপাতালে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, খ. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতর কাগজনির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা বাদ দিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হয়েছে, গ. ই-টেন্ডারিং চালু হয়েছে, ঘ. টেলিমেডিসিন সেবাকেন্দ্র ৯৫টিতে উন্নীত হয়েছে, ঙ. স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে অটোমেশনসহ ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হয়েছে।

১১. বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন :

ক. ১৯৯৮-২০০৩ সালের জন্য পঞ্চম স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা পর্যায়ে পরিকল্পনা (এইচপিএসপি) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়, খ. ২০০৯- অদ্যাবধি : ৩য়

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচী ২০১১ - ২০১৬ প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, গ. '৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচী ২০১৬-২০২১' প্রণয়ন করে বাস্তবায়নাধীন আছে।

১২. হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি :

৩৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে। ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা হাসপাতাল এখন ৪৪১টি, মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোতে প্রায় ২ হাজার ৫০০ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৩. অন্যান্য প্রতিষ্ঠান :

ক. ১৭১টি মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ৫৪টি হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, খ. সাভার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্থ ম্যানেজমেন্ট ভবন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৪. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :

বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১.৩৭ যা ২০০৮ সালে ছিল ১.৪১। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের মাধ্যমে যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫. মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি : ৭২.৮ বছর।

১৬. জরুরী স্বাস্থ্যসেবা ও এ্যাম্বুলেন্স : বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় ৪০০টি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে দুর্গম হাওর অঞ্চলের জন্য ১০টি নৌ এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।

১৭. স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি : দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার তিনটি উপজেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা শীর্ষক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের জন্য কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট স্থাপন ও কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১৮. নীতি কাঠামো ও আইন :

ক. বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১১, খ) ধূমপান নিবারণে ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১২, গ) শতাব্দী পুরাতন আমানবিক কুষ্ঠ আইন (লেপ্রসি এ্যাক্ট) ১৮৯৮

বাতিল, ঘ) রোগী ও চিকিৎসক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক আইন, ঙ) মানবদেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন ২০১৭, চ) বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এবং সার্জনস (বিসিপিএস) আইন ২০১৭।

১৯) বেসরকারি খাত :

ক. দেশের চিকিৎসা জনবলের অভাব পূরণে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট, হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও মিডওয়াইকারী ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়েছে, খ. বেসরকারী পর্যায়ে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, গ. সরকারী-বেসরকারী যৌথ অংশীদারিত্ব প্রকল্প চালু হয়েছে।

২০) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা- ক. জাতিসংঘের ২০১০ সালে এমডিজি -৪ এবং ২০১১ সালে 'ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমন্টে' শীর্ষক সাউথ সাউথ পুরস্কার গ্রহণ করেন, খ. টিকাদান কর্মসূচী সাফল্যের জন্য ২ বার গ্যাভি এওয়ার্ড গ্রহণ, গ. সায়মা ওয়াজেদকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক কার্যালয় অটিজম বিষয়ে অবদানের জন্য এক্সলেন্স ইন পাবলিক হেলথ পুরস্কার প্রদান করে।

এ প্রবন্ধে দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কিছু মৌলিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা-বাজেটের স্বল্পতা, দক্ষ মানবসম্পদের অভাব, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। এরপরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি নেতৃত্বের জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও মেডিক্যাল শিক্ষার অনেক সূচকই ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে। এ উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি হয়েছে শেখ হাসিনার সুপরিকল্পিত নেতৃত্বের জন্য।

তপন রশীদ

শেখ হাসিনার সংগ্রাম এবং বাংলাদেশর দিনবদল

বাংলাদেশের মানুষের রাজপথের সংগ্রামে বিংশ শতকের শেষে এবং একুশ শতকের শুরুতে সাহসী, সংগ্রামী এবং সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন আজকের দেশ শাসক এবং প্রশাসক শেখ হাসিনা। নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বুঝতে হলে তাঁর জীবনের শুরু, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা-দীক্ষা, বিয়ে, রাজনীতিতে প্রবেশসহ জীবনের মূল কর্মকাণ্ডকে বুঝতে হবে। যদিও এ লেখার পরিসরে এই বড় মাপের মানুষটিকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা একেবারেই সম্ভব নয়। তবুও অনুরোধে ঢেকি গেলার মতই এ লেখায় শেখ হাসিনা এবং তার সংগ্রাম ও সম্ভাবনার চুম্বকটি ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

হাজার হাজার বছর ধরে হিমালয়ের অজস্র ঝর্ণাধারায় তৈরি মানস সরোবরের গঙ্গোত্রি থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা নদী বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বয়ে চলেছে। সীমানা পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেই এ নদী নাম নিয়েছে পদ্মা। শতসহস্র বছরের প্রবহমানতায় পদ্মা এই বঙ্গীয় ব-দ্বীপে বহু শাখানদীর প্রসূতি হয়েছে। তেমনি এক মধুপ্রসবিনী শাখানদী মধুমতি। মধুমতিরই শাখা নদী বাইগার। শেখ বংশের আবাস টুংগীপাড়ার বুক চিড়ে ক্ষীণতোয়া বাইগার বয়ে চলেছে। শেখ আউয়াল নামের একজন ইসলাম প্রচারক ও সাধক একদিন বাঘ আর কুমিরের অভয়াশ্রম সেই বাইগার নদী বেয়েই টুংগীপাড়ায় এসে বসতি গেড়ে বসেন। সম্ভবত বাইগার এসেছে বাঘের শব্দটি থেকে। মাত্র দেড়-শত বছর আগেই বাইগার নদীটি ছিল বাঘ, কুমির এবং অসংখ্য শ্বাপদ, সরীসৃপের বিচরণ ভূমি। কথিত আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেখ আউয়াল বাঘের পিঠে চড়েই টুংগীপাড়ায় প্রথম আসেন এবং ইসলাম প্রচার ও ধর্ম সাধনার জন্য টুংগীপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। হতদরিদ্র, ঘনবসতিপূর্ণ সমস্যাসংকুল বাংলাদেশের রাজনীতি নামক বাঘের পিঠে এই বংশের এক পিতা ও এক কন্যাও অসম সাহসের সাথে বসেছেন। এই বংশেরই উত্তরসূরী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ ফজিলাতুন্নেছার গর্ভে এবং বঙ্গবন্ধুর ঔরসে বাইগার তীরের দাদার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। অর্ধশতাব্দীরও আগে সেই নিভৃত-নিঝুমপ্রায়

টুংগীপাড়ায় যে শিশু কন্যা পৃথিবীর আলো দেখতে পায় সেই আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

১৯৫৪ সালে যখন শেখ মুজিব তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রীর সদস্য হন তখনই প্রথম শেখ হাসিনা দাদার গয়না নৌকায় চড়ে মায়ের সাথে প্রথমবারের মত ঢাকায় আসেন। এরপর তাকে আজিমপুর গার্লস স্কুলে ভর্তি হতে হয়। স্কুল জীবনেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির কঠিন সত্যের মুখোমুখি হন তিনি। এর মধ্যদিয়ে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করেন হাসিনা। কারণ তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে তার প্রিয় জ্যেষ্ঠ কন্যার স্কুল জীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই কারান্তরালে কাটাতে হয়। পাঞ্জাব শাসিত পাকিস্তানের মধ্যযুগীয় সেনাশাসন এবং তার হীন চক্রজালের বলী হয়ে। এসএসসি পাশের পর ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েই পিতার যথোপযুক্ত কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনা পুরোদস্তুর ছাত্রনেতা হয়ে উঠেন। ১৯৬৭ সালে শেখ হাসিনা ইডেন কলেজের ভিপি নির্বাচিত হন সাধারণ ছাত্রীদের ভোটে। ১৯৬৭ সালেই শেখ হাসিনা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের কর্মকর্তা ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে বিয়ের মালা বদল করেন। তাদের এই বিয়েতেও বঙ্গবন্ধু উপস্থিত থাকতে পারেননি। জেলগেটে নবদম্পতি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। উনসত্তরের গণঅভ্যূত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে নিস্কৃতি পেয়ে মুক্ত হন। সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু এবং তার দল আওয়ামীলীগ তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন তাইত ছিল পাকিস্ত ানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অভিপ্রায়। কিন্তু সামরিক শাসক ইয়াহিয়া এবং

পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অভিপ্রায়। কিন্তু সামরিক শাসক ইয়াহিয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ভুট্টো তা হতে দিলেন না। একাত্তরের ৭ই মার্চের বক্তৃতায় এবং ২৫ শে মার্চের রাত ১২টা ১ মিনিটে ওয়ারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান। শেখ হাসিনার সংসার জীবনের শুরুতেই সংগ্রামের উর্মিমালায় বিচঞ্চল বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন একে একে জয়ের পতাকা ওড়াতে শুরু করেছে তখন হাসিনা-ওয়াজেদ দম্পতির প্রথম সন্তান

মাতৃগর্ভে। সে এক নির্মম সময় কারণ ২৬ শে মার্চ রাতেই পাক হানাদাররা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। আর বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, রেহানা ও রাসেল ঢাকায় পাক হানাদারদের হাতে গৃহবন্দী হন। একদিকে লাখো লাখো বাঙালির আত্মাহুতির রক্তগঙ্গায় জন্ম নিচ্ছে স্বাধীনতা আর অন্যদিকে সেই দেশেই শেখ হাসিনা বন্দিশিবিরে নিজের শরীরে বহন করছেন আরেক মানবজীবনের বীজ। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যেই জুলাই মাসে সেই শিশু জন্ম নেয় যার পুরো নাম তার সজীব ওয়াজেদ। স্বাধীনতার পর মাত্র ৩ বছরের মাথায় রাষ্ট্রপিতা এবং তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবংশে খুন হন, যে কথা সকলেরই জানা। কোন গ্রহের ফেরে কিংবা আল্লাহ তায়ালার অপার করুণায় শেখ হাসিনা এবং রেহানা বেঁচে যান। কিছুদিন জার্মানি ও লন্ডনে থেকে এবং এরপর ভারতে দীর্ঘ ছয় বছর প্রবাস যাপন শেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা শেখ হাসিনাকে প্রথম বারের মত বাঘের পিঠের সওয়ারী বানান। যখন তারা তাঁকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করেন ১৯৮১ সালে। এরপর দীর্ঘ পনের বছর ধরে তিনি সামরিক শাসক জিয়া এরশাদ এবং পূর্বতন সামরিক শাসকের স্ত্রী খালেদা জিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। দীর্ঘ একুশ বছর পর শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে জয়ের সুবাদে পুনরায় ক্ষমতার আসনে বসাতে সক্ষম হন। বিংশ শতাব্দীতে এটি অবশ্যই এক প্রণিধানযোগ্য ঘটনা। সেই পাঁচ বছরের শাসনকালে লালহরফে লেখা ঘটনা হল: ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ ১৯৭৫ বাতিল করা এবং বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও জেলে পোরা। জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং জেলে পোরা। এসময়ে দেশ উন্নয়নে শেখ হাসিনার সরকার ১২টি বিজ্ঞান ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করেন। কম্পিউটারের আমদানী শুল্ক কমিয়ে দেন। ঢাকায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন তথা ন্যাম সম্মেলন তথা জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর বিশ্ব সম্মেলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সম্মেলনের অতিথিদের জন্যে আবাসিক স্থাপনাও নির্মাণ করা হয়। এ সময়েই বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল টেস্ট এবং ওয়ানডে স্ট্রাটাস লাভ করেন। এরই মধ্যে চলে আসে ২০০২ এর সাধারণ নির্বাচন লতিফুর রহমানের

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সামরিক আমলাচক্রের সহযোগিতায় এক সুক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামীলীগকে হারিয়ে দেয়। ক্ষমতায় আসে বিএনপি। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয় বাংলাদেশ। কারণ ক্ষমতায় এসেই বিএনপি নেতা খালেদা জিয়া জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব সম্মেলন বাতিল করে দেন।

আবারো আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে রাজপথে নেমে আসেন শেখ হাসিনা নির্মমতম সামরিক স্বৈরশাসকের স্ত্রী খালেদা জিয়া তার দুই পুত্র, দুই ভাই, দুই প্রিয় পিএস, এপিএস, সত্তরজন মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর লুণ্ঠনবৃত্তি, দূর্বৃত্তপরায়নতা, প্রশাসনিক চরম বিশৃঙ্খলা, মৌলবাদী সন্ত্রাসের ভয়াবহ উত্থান বাংলাদেশকে ঐ শাসনামলে প্রায় উচ্ছন্নের পর্যায়ে নিয়ে যায়। কিন্তু নিজেদের শয়তানি কূটকৌশল বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয় খালেদা-তারেক- নিজামী চক্র। ক্ষমতায় আসে এক অভিনব সরকার সামরিক ছাউনীর প্রচ্ছন্ন নেতৃত্বে। সম্মুখ থেকে যাতে নেতৃত্ব দেন ইয়াজউদ্দীন ও ফখরুদ্দীন । পেছন থেকে সমর্থন দেন জেনারেল মঈনুদ্দীন। শুরুতে দুর্নীতি দমন এবং নানা সংস্কারের কথা বললেও এ সরকারও দুর্নীতি দমন করতে গিয়ে মহাদুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ফখরুদ্দীন সরকারের আমলেও শেখ হাসিনাকে জেলে যেতে হয়। ছয় মাসেরও বেশি জাতীয় সংসদ ভবনের সাবজেলে থাকার পর

জনতার সংগ্রাম শেখ হাসিনাকে জেল থেকে মুক্ত করে আনে । এরপর ২০০৮ এর নির্বাচনে মহাজোটবদ্ধ আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সাংসদ নিয়ে সরকার গঠন করে। দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। কিন্তু যেমন বয়ে চলে বাইগার, তেমনি সময়ও বয়ে যায় নদীর স্রোতের প্রায়। দিন বদলের শ্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর এরমধ্যেই শেখ হাসিনা সরকারের সাড়ে তিন বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা এ কথা জানি এবং মানি যে, একই বাইগার নদীতে দ্বিতীয়বার সাঁতার কাটা কারও পক্ষে সম্ভব হতোনা। তেমনি দিনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। বাংলাদেশের দিনও ক্রমশও ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। বিএনপি আমলে বাংলাদেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল চার শতাংশ। এখন এই জাতীয় প্রবৃদ্ধির গড় হার ৬.৭৫ শতাংশ। এটা দিন বদলের সুস্পষ্ট আভাস। ব্যক্তিগত আয়ও গত সাড়ে তিন বছরে উল্লেখ করার মত হারে বেড়েছে।

বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে, সড়ক, নৌ ও রেল যোগাযোগ বিস্ত তকরণে শেখ হাসিনার সরকার বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম ছয় লেন সড়ক, নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। ঢাকা- ময়মনসিংহ চার লেন সড়ক নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে পৌছেছে। ঢাকা-শহরে বেশ কিছু নতুন ফ্লাইওভার নির্মাণ সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে গত চল্লিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোন সরকার ঢাকা শহরে নতুন ১০টি সরকারি স্কুল নির্মাণ করেছে। দেশব্যাপী নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ নির্মাণ হচ্ছে। প্রথমবারের মতো একটি এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি (বাপেক্স) কে এক হাজার কোটি টাকা দিয়ে ড্রিলিং মেশিনসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা করেছে। যার ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চারটি নতুন গ্যাসক্ষেত্র এবং দুইটি নতুন তেলক্ষেত্র আবিস্কৃত দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিকতা, গতিহীন প্রশাসন এবং অদক্ষতাজনিত কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক উল্লস্ফন ঘটানো সম্ভব হচ্ছেনা। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যে সত্যিকারের দিন বদলাতে চাইলে শেখ হাসিনাকে সময়ের সুদক্ষ সেনাপতি হিসেবেই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। পদক্ষেপ নিতে হবে দুর্নীতি এবং নির্বোধ পুজিবিকাশের সুযোগে বেড়ে ওঠা নির্লজ্জ পাহাড়সম অর্থনৈতিক বৈষম্য সহনীয় মানবিক পর্যায়ে কমিয়ে আনার। নানাবিধ দূর্নীতির শেকড়মূল উপড়ে ফেলতে পারলে দুর্নীতি এবং অপরাধও স্থানীয় পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য। বাংলাদেশের মত জটিল দুর্নীতি প্রবণ দেশে কাজটি খুবই কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। কিন্তু পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই। কারণ বাংলাদেশের ভবিতব্য শেখ হাসিনার হাতে এ সুযোগটি এনে দিয়েছেন। শেখ হাসিনার সরকার এ সাড়ে তিনবছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এবার ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতেই শেখ হাসিনাকে তীব্র লড়াইয়ে নামতে হয় স্বীয় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে। বিডিআর বিদ্রোহের মত অনাকাংখিত নারকীয় ঘটনার কারণে। প্রাজ্ঞ, স্থিতধী নেতৃত্ব দিয়ে সেই দুঃসহ ক্রিয়াকর্মের জটাজাল থেকে বেড়িয়ে এসে সারাবিশ্বের প্রশংসা পান শেখ হাসিনা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিংবা বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে যেভাবে দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের ইশতেহারে যে মধ্য আয়ের বাংলাদেশ গড়ার প্রতীজ্ঞা উচ্চারণ করা

হয়েছে তা এখনো অনেক দূরের পথ। এ সুন্দর স্বপ্নকথা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার শেখ হাসিনাও প্রায়শঃই করে থাকেন। বাংলাদেশকে সেই স্বপ্নের সোপানে পৌঁছাতে হলে বাংলাদেশের সকল প্রশাসনের এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কাণ্ডের স্থানীয়করণ করতে হবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই কাজটিই শুরু করেছিলেন ৬৪ জেলায় গভর্ণর নিয়োগের মাধ্যমে। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসে বিশ্বাসঘাতক মোশতাক এবং এর ৮৬ দিন পর তাকে লাথি দিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নেয় ইতিহাসের নির্মমতম সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান। এ দুজন বঙ্গবন্ধু গৃহীত সকল পদক্ষেপ একে একে রদ করেন এবং বাংলাদেশকে এরা মহা অন্ধকারের উল্টো পথে টেনে নিয়ে যান। ফলে এদেশের মানুষের ভাগ্যের বিপ্লবাত্মক রূপান্তরের আকাঙ্খা অন্ধকারের অতলে হারিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ৩৭ বছর পেরিয়ে গেছে। একটি জাতির জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি বা হতে পারে। একচল্লিশ বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির একনিষ্ঠ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমার বিবেচনায় যে কাজটি বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন-অর্থাৎ বাংলাদেশের আপামর মানুষের ভাগ্য বদল তথা সোনার বাংলা বিনির্মাণের কাজটি করতে পারবেন বলে মনে হয় । শেখ হাসিনার হাতে অর্পণ করেছেন। কারণ এদেশের আর কোন দৃশ্যমান রাজনৈতিক নেতা নেই যিনি শেখ হাসিনার চেয়ে যোগ্যতরভাবে এ কাজটি করতে পারবেন বলে মনে হয়। শেখ হাসিনার সরকার ইতোমধ্যে জেলা পরিষদ ঘোষণা করেছেন। জেলা পরিষদকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক- প্রশাসনিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সূতিকাগার হিসেবে গড়ে তুললে এবং তা গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারলে অবশ্যই বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর সম্ভব এ কাজে শেখ হাসিনার মধ্যবর্তী পরীক্ষা চলছে। আগামী নির্বাচনের পর তার চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হবে। আমার গভীর বিশ্বাস বাংলাদেশের জনগণ সেই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ তাকে দেবেন। আর তখনই শুরু হবে প্রশাসক হিসেবে শেখ হাসিনার আসল পরীক্ষা।

তোফায়েল আহমেদ

জয়যাত্রায় জননেত্রী

'বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আমরা এখন ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হয়েছি। এই একটি কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সুনাম এখন অনন্য উচ্চতায় উঠেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বাণিজ্যিকভাবে সফল হবে। মাত্র ৭ বছরের মধ্যে এর বিনিয়োগকৃত অর্থ উঠে আসবে এবং বাকি ৮ বছর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। প্রতিবছর ১৭ মে যখন আমাদের জীবনে ফিরে আসে, তখন স্মৃতির পাতায় অনেক কথাই ভেসে ওঠে। তবে তিনটি কারণে এবারের ১৭ মে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এবার আমরা সফলভাবে 'বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট' মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছি। এর আগে আমরা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের লাইসেন্সপ্রাপ্তির মাধ্যমে 'নিউক্লিয়ার নেশন' হিসেবে বিশ্ব পরমাণু ক্লাবের সদস্য হয়েছি। আর স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের গৌরবময় সুনাম এবং মহত্তর অর্জনের এই বীজ রোপিত হয়েছিল সেদিন, যেদিন বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৮১'র ১৭ মে ঝড়-বৃষ্টি আঁধার রাতে স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

দীর্ঘ নির্বাসন শেষে '৮১-এর ১৭ মে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছর তার ৩৭তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বার্ষিকী। শেখ হাসিনা যেদিন স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন, সেদিন শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না, ছিল সর্বব্যাপী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ। সামরিক স্বৈরশাসনের অন্ধকারে নিমজ্জিত স্বদেশে তিনি হয়ে ওঠেন আলোকবর্তিকা, তথা অন্ধকারের অমানিশা দূর করে আলোর পথযাত্রী। '৮১-এর ১৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন। কাউন্সিলে অনেক আলাপ-আলোচনার পর জাতীয় ও দলীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে

শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। আমরা সাব্যস্ত করি মহান জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব প্রদানকারী দল আওয়ামী লীগের পতাকা তাঁরই হাতে তুলে দেব। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হন তিনি। একই বছরের ১৭ মে এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বৃষ্টিমুখর দিনে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন। ওইদিন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ৭৩৭ বোয়িং বিমানে ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে সে সময়ের ঢাকা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে বিকাল সাড়ে ৪টায় এসে পৌঁছেন। সারা দেশ থেকে লাখ লাখ মানুষ তাকে সংবর্ধনা জানাতে সেদিন বিমানবন্দরে সমবেত হয়। ওই সময় লাখো জনতা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিল, 'শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছা-স্বাগতম'; 'শেখ হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেবো'; 'ঝড়-বৃষ্টি আঁধার রাতে, আমরা আছি তোমার সাথে'; 'বঙ্গবন্ধুর রক্ত বৃথা যেতে দেবো না'; 'আদর্শের মৃত্যু নাই, হত্যাকারীর রেহাই নাই'।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের জন্য রাজনীতি কঠিন করে তুলেছিলেন স্বৈরাশাসক জেনারেল জিয়া। সংবিধান স্থগিত করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। রাজনীতিকদের বেচাকেনার সামগ্রীতে পরিণত করে রাষ্ট্রীয় মদতে দল ভাঙার নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। জেনারেল জিয়া সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, 'মানি ইজ নো প্রোবলেম' এবং 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর পলিটিশিয়ানস'। জেল, জুলুম, হুলিয়া, গুম-খুন ইত্যাদি ছিল নিত্যকার ঘটনা। প্রতিদিন সান্ধ্য আইন জারি ছিল। চারিদিকে গড়ে তোলা হয়েছিল এক সর্বব্যাপী ভয়ের সংস্কৃতি। '৭৬-এর ১ আগস্ট সামরিক শাসক জেনারেল জিয়া সীমিত পরিসরে 'ঘরোয়া রাজনীতি' করার অনুমতি দেন। আমরা যারা জেলে ছিলাম এবং যারা জেলের বাইরে ছিলেন, তারা দলকে সংগঠিত করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় নেতা মহিউদ্দিন আহমেদকে সভাপতি ও সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী লীগ পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক নিপীড়নের

মধ্যে '৭৭-এর ৩ ও ৪ এপ্রিল মতিঝিলের হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে কয়েক হাজার নেতাকর্মী সমবেত হয়। নেতৃবৃন্দ মতবিরোধ নিরসন এবং দলীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার্থে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে। এক বছর পর '৭৮-এর ৩ থেকে ৫ মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধাভাজন নেতা আবদুল মালেক উকিল সভাপতি, শ্রদ্ধেয় নেতা আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক ও কারান্তরালে থাকা অবস্থায়ই আমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়।

'৮১-এর সম্মেলনে সবাই ধরে নিয়েছিল আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা জীবনপণ চেষ্টা করে সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে আওয়ামী লীগের ঐক্য ধরে রেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ওপর দলের নেতৃত্বভার অর্পণ করেছিলাম। দলের শীর্ষ পদে তাকে নির্বাচিত করে আমরা ভারতের রাজধানী দিল্লি গিয়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আগমন দিনটি নির্ধারণ করেছিলাম। যেদিন তিনি ফিরে এলেন, সেদিন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মনে করেছিল শেখ হাসিনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকেই তারা ফিরে পেয়েছে। সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে সবার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি যখন দলীয়প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুকন্যার নাম প্রস্তাব করি, তখন তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। সে কী আনন্দ-উচ্ছ্বাস, সে কী দৃশ্য! চোখের সামনে সেই ছবি ভেসে ওঠে, আজ যা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। মনে হয়েছে, আমরা আবার বঙ্গবন্ধুর রক্তের কাছে, যে রক্তের কাছে আমরা ঋণী, যে ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না- সেই রক্তের উত্তরাধিকার শেখ হাসিনার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে ঋণের বোঝা কিছুটা হয়তো হালকা করতে পেরেছি। সভানেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার নাম শুনে নেতাকর্মীরা উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং বিপুল করতালির মাধ্যমে দলের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করে। শেখ হাসিনা সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আব্দুর রাজ্জাক এবং আমি পুনঃনির্বাচিত হই। '৮১-এর ১৭ মে দেশে ফিরে আসার আগে জেনারেল জিয়ার নির্দেশে 'শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীকে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরা।

বিমানবন্দরে লাখ লাখ লোক তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছিল। সেদিন মনে হয়েছে বঙ্গবন্ধুই যেন শেখ হাসিনার বেশে আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। আমরা যখন মানিক মিয়া এ্যাভিনিউয়ে যাই, রাস্তার দু'পাশে লাখ লাখ লোক। এমন দৃশ্য যা বর্ণনাতীত। মঞ্চে উঠে তিনি শুধু ক্রন্দন করলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে হৃদয়ের আবেগ ঢেলে সেদিন বলেছিলেন- 'আজকের জনসভায় লাখো চেনামুখ আমি দেখছি। শুধু নেই প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু, মা আর ভাই, আরও অনেক প্রিয়জন। ভাই রাসেল আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। আপা বলে ডাকবে না। সব হারিয়ে আজ আপনারাই আমার আপনজন। স্বামী-সংসার-ছেলে রেখে আপনাদের কাছে এসেছি। বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য আমি এসেছি। আওয়ামী লীগের নেতা হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই। আবার বাংলার মানুষ শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি। শোষণের মুক্তি। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছিলেন। আজ যদি বাংলার মানুষের মুক্তি না আসে তবে আমার কাছে মৃত্যুই শ্রেয়। আমি আপনাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করে মরতে চাই। স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতি রক্ত দিয়েছে। কিন্তু আজ স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। ওদের রুখে দাঁড়াতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সংগ্রাম করি। আপনাদের ভালোবাসার আশা নিয়ে আমি আগামী দিনের সংগ্রাম শুরু করতে চাই। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা না পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের ভার সরকারের কাছে নয়, আমি আপনাদের কাছে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।'

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটানা ১৪ বছর দলের সাংগঠনিক সম্পাদক (তখন ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক ছিল) হিসেবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা

করেছি। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবেও কাছে থেকে কাজ করেছি। এ ছাড়াও মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। আমার বারবার মনে হয়েছে, যখন তার কাছে বসি বা ক্যাবিনেট মিটিং করি বা সভা-সফর করি, তখন বঙ্গবন্ধুর কথা স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে। প্রিয় নেত্রী আওয়ামী লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর নিষ্ঠার সঙ্গে, সততার সঙ্গে দলকে সংগঠিত করেছেন। দীর্ঘ ২১ বছর পর '৯৬-এ তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। আমি সেই মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলাম। কাছে থেকে দেখেছি দৃঢ়তা ও সক্ষমতা নিয়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। 'ইনডেমনিটি বিল' বাতিল করে সংবিধানকে কলঙ্কমুক্ত করে জাতির পিতার বিচারের কাজ শুরু করেছিলেন।

২০০১-এ বিএনপি ক্ষমতায় এসে সেই বিচার বন্ধ করে দেয়। আবার ২০০৮-এর নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় অর্জন করার পর তার আমলে শুধু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের কাজই সম্পন্ন করেননি, মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজও এগিয়ে চলেছে এবং ইতিমধ্যে শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ শেষ হয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। ২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত ৯ বছরের বেশি আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই ৯টি বছরে শেখ হাসিনা দেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। বিশ্বে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। জাতির পিতাকে আমরা ১৫ আগস্ট হারিয়েছি। নিষ্পাপ শিশু রাসেলকে সেদিন হত্যা করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় দুই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা যদি সেদিন দেশে থাকতেন, খুনিচক্র তাদেরও হত্যা করত। সেদিন জ্যেষ্ঠ কন্যার হাতে বঙ্গবন্ধুর রক্তে গড়া আওয়ামী লীগের পতাকা আমরা তুলে দিয়ে সঠিক কাজটিই করেছিলাম। ইতিহাস সৃষ্টি করে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। রক্তেভেজা সেই পতাকা হাতে তুলে নিয়ে দল ও দেশকে তিনি প্রগতির পথে এগিয়ে নেয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর ভাষায়, বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি চমৎকার। এটা আন্তর্জাতিক বিশ্বের জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয়।

নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেনের ভাষায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ পাকিস্তান থেকে এগিয়ে। এমনকি সামাজিক

সূচকের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারত থেকে এগিয়ে। অনেক বড় বড় প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করার পরও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু করে। আজ তা সমাপ্তির পথে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতু ও পদ্মা সেতুতে রেলপথ, বঙ্গবন্ধু সেতুতে পৃথক রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ, মেট্রো রেল, এলিভেটরি এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল, রামপাল ও মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ সর্বমোট ১১৯টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩,২০০ থেকে ১৬,১৪৯ মেগাওয়াট, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩.৫ থেকে ৩৩.০৪ বিলিয়ন ডলার, রফতানি আয় ১০.৫২ থেকে ৩৪.৪২ বিলিয়ন ডলার, পায়রা বন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনসহ অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭.২৮ শতাংশ করে জনগণের মাথাপিছু আয় ১,৬১০ ডলারে উন্নীত করেছেন। সবল-সমর্থ আর্থ-সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করার ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি।

আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'বাংলাদেশ ২০২৩ নাগাদ বিশ্বের ২৯তম ও ২০৫০ নাগাদ ২৩তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত হয়ে উন্নত দেশের তালিকায় স্থান করে নেবে।' সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের এসব কৃতিত্বের জন্য জাতিসংঘসহ আন্ত র্জাতিক সংস্থাগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ পর্যন্ত ১৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করেছে। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে যা এই ক্ষুদ্র লেখায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

২০০৮-এর নির্বাচনে রূপকল্প তথা ভিশন-২০২১ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম আয়ের দেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন নয়, বাস্তব। ইতিমধ্যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছি এবং উন্নয়নশীল দেশে প্রবেশ করেছি। ২০২১-এ যখন স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি হবে, তখন আমরা পরিপূর্ণভাবে মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করব। এগুলো সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে। শেখ হাসিনা যা বিশ্বাস করেন,

জাতির জনকের মতো তা-ই তিনি বলেন এবং বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। জাতির পিতা দুটি লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতি করেছেন। একটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আরেকটি অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়ে যেতে পারেননি। সেই কাজটি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা করে চলেছেন। ধীরে ধীরে যেমন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন অনেক দূর এগিয়ে গেল, তেমনি সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন স্বাধীন বাংলাদেশ হবে মর্যাদাশালী, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। আমরা সেই পথেই বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছি। ইনশাআল্লাহ, বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হবে। এটাই জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে আমাদের প্রত্যাশা।

নজরুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রীর অর্জন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার অভিজ্ঞতা তিন মেয়াদে প্রায় ১৪ বছর, তৃতীয় মেয়াদ পূর্তিতে হবে ১৫ বছর। বিরোধী দলের নেতা ছিলেন দু'দফায় দশ বছর। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা তথা দেশ গঠনে তাঁর সুযোগ ছিল, আছে এবং তিনি সে সুযোগ কাজে লাগাবার আন্ত রিক চেষ্টা চালিয়েছেন, চালিয়ে যাচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলতা পেয়েছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তেমটি পাননি, না পাওয়ার নানা গ্রহণযোগ্য কারণও ছিল বা আছে। কিন্তু দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রামে তার যে সাফল্য বা অর্জন তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রশংসনীয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিস্ময়কর। পাশাপাশি তিনি তাঁর দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে সুসংহত করেছেন, শক্তিশালী করেছেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের মতো বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত, ভৌগোলিক অর্থনৈতিক , সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিল সমস্যাসংকুল একটি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। প্রথমত, নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়ে আসলেও ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই এরকম একটি দেশে খুবই শক্ত এক চ্যালেঞ্জ। মেয়াদকালে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ নয়। দ্বিতীয়ত দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন বা তা দৃশ্যমান করা একই রকম চ্যালেঞ্জ। ইদানিং উন্নয়ন তত্ত্বে সব রকমের ভৌত-আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মুল্যায়নে সুশাসনের শর্তটি অবশ্য পালনীয় মনে করা হচ্ছে। সুশাসনের ধারণা আবার সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সমাজের একরকম নয়, অবশ্য জবাবদিহিতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের প্রশ্নটি সর্বজনগ্রাহ্য, সন্দেহ নেই। অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থা সবার কাম্য। দুর্নীতি উন্নয়নের অনুষঙ্গ হবে, এটি আদৌকাম্য নয়। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের ১৪ বছরে অর্জনের তালিকা যেমন সুদীর্ঘ তেমনি অনেক, ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যময় ও সুদূরপ্রসারী ফলবাহী। তাঁর প্রথম পর্বের

প্রধানমন্ত্রীত্বকালের বিশাল অর্জন অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করা; কিছু অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও একথা মানা যায়। যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু (যমুনা) বহুমুখী সেতু নির্মাণ উদ্বোধন করা, বিশেষত, শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে সেতুতে রেল সংযোগ যুক্ত করা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় অর্জন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকার্য শুরু করাটাও ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় অর্জন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকার্য শুরু করাটাও ছিল শেখ হাসিনার সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্ততার প্রমাণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়াদের সরকার পরিচালনার সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি করা, ও রাজনৈতিক স্থিতিশলীতা বজায় রাখা, মায়ানমার ও ভারতের সাথে আইনি লড়াই করে সমুদ্র বিজয়, দীর্ঘস্থায়ী ছিটমহল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পাশাপাশি দেশের যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামোতে ব্যাপক অগ্রগতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের ব্যাপক উন্নয়ন, সর্বোপরি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (মাথাপিছু আয় বিচারে নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করা), দারিদ্র্য মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া ইত্যাদি নানা খাতে পরিমাপ যোগ্য উন্নয়ন বা অগ্রগতি সাধন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্জন। বাংলাদেশ যে তার বৃহত্তর প্রতিবেশী ভারত বা পাকিস্তানের চেয়ে আর্থ-সামাজিক খাতে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে গেছে একথা নোবেল-বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বার বার আমাদের মনে করিয়েছেন। তবে একথাও সত্য যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজে বৈষম্য মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, এদিকটাতে খবরদারি কম হচ্ছে। এমনটি যে বিশ্বের বৃহত্তম সমাজতান্ত্রিক দেশ গণচীনেও হচ্ছে, তা অবশ্য আমাদের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয় এবং সে রকম ব্যবস্থা কোনো মডেল হতে পারে না

শেখ হাসিনার শাসনামলের নানাবিধ অর্জনের বিস্তারিত খতিয়ান দেয়ার আমার তেমন প্রস্তুতি নেই। তার জন্য অনেক যোগ্যতর বিশ্লেষক রয়েছেন, আমি বরং আমার নিজের যে বিচরণ ক্ষেত্র সেদিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারি।

আমি মূলত একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন উপলক্ষে উচ্চশিক্ষায় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ছিলাম। আমি দীর্ঘকাল নগর গবেষণা,

নগর পরিকল্পনা, নগর উন্নয়ন ও পরিবেশ নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছি। পাশাপাশি আমি শিল্পকলা তথা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কোনো কোনো বিষয়ে ভূমিকা রাখার সুযোগ পেয়েছি। এসব ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাসঙ্গিক কিছু অর্জন বা অবদানের উল্লেখ করছি।

উচ্চ শিক্ষার

শেখ হাসিনা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-সব পর্যায়েই ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব করেছেন, অবশ্য একথা সত্য যে সংখ্যাগত বা পরিমাণগতভাবে যতটা উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধি হয়েছে, মানগত দিক তেমনটি হচ্ছে না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নয়ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বা কারিগরি ও পেশাগত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং আছে। আমি নিজে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে ২০০৯ সালে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন কর্মসূচি সরকারের অনুমোদন লাভ করে। বিশ্বব্যাংকের অর্থানুকূলে পরিচালিত এই কর্মসূচি পরবর্তী সময়ে ২০১৮ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। কর্মসূচির ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে তেমন কোনো বিতর্ক নেই। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমর্থনেই পরিচিত হচ্ছে।

আমি মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুমোদনের সাফল্য পেয়েছিলাম, অবশ্যই প্রাধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় সমর্থনে। উল্লেখ সমীচীন, এক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শেখ হাসিনার একটি চিন্তা রয়েছে যে, দেশের সকল জেলায় অন্তত একটি করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইতোমধ্যে দেশের ১৯টি জেলায় ৪০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে বাকি জেলাগুলোতেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সুফল পাওয়া যাবে। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে শিক্ষার মানের দিকে সুদৃষ্টি রাখতে হবে এবং এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাড়াহুড়া করা সঠিক হবে না।

বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কঠিন কাজ। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজটি অত্যন্ত কঠিন, যেমন জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে অন্তত চারজন উপাচার্য তাদের মেয়াদ শেষের আগেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এরকম পরিস্থিতিতে প্রফেসর ড. ফারজানা ইসলাম বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন শুধু তা নয়, তিনি অত্যন্ত সততা, দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে তার নির্ধারিত মেয়াদ সুসম্পন্ন করছেন। কৃতিত্ব অনেকটাই শেখ হাসিনারও।

শিক্ষা সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুমোদন অবশ্যই শেখ হাসিনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, অবশ্য এর সাফল্য নির্ভর করছে যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যে। এক্ষেত্রে জরুরি হচ্ছে প্রাসঙ্গিক আইন অনুমোদন করানো ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠার, তাতে শিক্ষায় সু-শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাস একটি অপরিহার্য করণীয়। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নানা ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক ধারায় আনার চেষ্টা করা। কাজটি অত্যন্ত কঠিন । তবে মনে রাখা উচিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গঠিত ড. মুহম্মদ কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশনে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ ছিল।

নগরায়ন ও অঞ্চল উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ

কৃষি ও গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের পরিচয় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এখনো কর্মসংস্থানে কৃষির প্রাধান্য বজায় থাকলেও জিডিপিতে কৃষি খাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ইতোমধ্যে ২০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে, বরং শিল্পখাত ও সেবাখাতের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে নগরায়নের মাত্রা ৩০ শতাংশের নিচে হলেও জিডিপিতে নগর-খাতের অবদান ৬৫ শতাংশের ওপর, বিশেষ করে ঢাকা ও অন্যান্য মহানগর সমূহের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে বেশি। নগর-খাতের ভূমিকা আরো ইতিবাচক হতে পারবে যদি নগরায়ন ও নগর উন্নয়ন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন সম্ভব হয়। নগরী যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, আবাসন, পানি সরবরাহ, পয়ঃব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি সঠিক হওয়া খুবই জরুরি। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিকল্পিত নগরায়ন খুব দৃশ্যমান নয়। জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা এখনো অনুমোদনের অপেক্ষায়, তবে জাতীয় আবাসন নীতিমালা-২০১৬ সম্প্রতি

অনুমোদিত হয়েছে। এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। নগর উন্নয়নে পরিবেশ-প্রসঙ্গ গুরুত্ব দেয়ার জন্য শেখ হাসিনা ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন, প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঢাকার নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকায় পরীখা নির্মাণের নির্দেশ ও বাস্তবায়ন ও বর্তমানে কুড়িল-পূর্বাচল ৩০০ ফুট প্রশস্ত সড়কের দুপাশে ১০০ ফুট করে দুটো খাল খনন নিশ্চিত করণের নির্দেশ। ইতোমধ্যে হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ঢাকা শহরের পরিবেশ উন্নয়নে শেখ হাসিনার আগ্রহের কথাও বলা যায়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা ঢাকা মহানগরাঞ্চলের জন্য প্রণীত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা বা এসটিপি অনুমোদন করেছেন এবং কিছুটা দেরীতে হলেও ইতোমধ্যে এর বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে এসটিপি বাস্তবায়ন হলে ঢাকা মহানগরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশাল পরিবর্তন সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে এসটিপি বহির্ভূত কোনো রকম মেগা-প্রজেক্ট গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। পুরাতন ঢাকার স্থানান্তরিত কেন্দ্রীয় জেলখানার জায়গায় ঐতিহ্য ও বিনোদন সমৃদ্ধ উন্মুক্ত পরিসর পরিকল্পনাতেও শেখ হাসিনার আগ্রহ উল্লেখযোগ্য। দেশ পরিচালনার মতো নগর পরিচালনাতেও দূরদৃষ্টি ও দক্ষতাসম্পন্ন নেতৃত্বের বিকল্প নেই। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অরাজনৈতিক ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব আনিসুল হককে অনুপ্রেরণাদানকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নগরবাসীর কৃতজ্ঞতা পেতেই পারেন। রাজধানীবাসীর দুর্ভাগ্য, অত্যন্ত অল্পদিনের মধ্যে তারা প্রতিভাবান মেয়র আনিসুল হককে হারিয়েছেন।

আমরা অবশ্য আশা করবো শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরের উন্নয়ন নয়, সমগ্র বাংলাদেশকে (গ্রাম ও শহর সমন্বয়ে) একটি মহাবাস্তুপরিকল্পনা মাফিক উন্নয়ন করা হবে যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে। প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে সে লক্ষ্যে একটি কর্মসূচিতে সমর্থন দিচ্ছেন, এটি হলো 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান' পরিকল্পনা। এর মেয়াদ ২১০০ সাল পর্যন্ত। পানি খাতে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হলেও এই পরিকল্পনায় নগর ও গ্রাম পরিবেশ উন্নয়ন গুরুত্ব পাচ্ছে। পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে নেদারল্যান্ড সরকার। কাজটির বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী নিজে নেদারল্যান্ড সফর করেছেন। বাংলাদেশের বাস্তুগত উন্নয়ন তথা

সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে মহাপ্রকল্প, সেই পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে শেখ হাসিনার আগ্রহ ও উদ্যোগের বিষয় তো সবারই জানা। পদ্মা সেতু একটি ভৌত উন্নয়ন প্রকল্পই নয় এটি বাংলাদেশের মানুষের আত্মমর্যাদার প্রকল্প। পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যাপক পরিবর্তন হবে বলাই যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন হতে যাচ্ছে পদ্মা সেতু।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন, যে কারণে তিনি ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সম্মানজনক 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার অর্জন করেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অনুমোদন করছেন। অবশ্য বাগেরহাটের রামপালে নির্মিতব্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কিছু নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে পরিবেশবাদী ও ইউনেস্কোর আপত্তি রয়েছে, তবে প্রকল্পের পক্ষে সরকারেরও যুক্তি রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, শেখ হাসিনা পরিবেশ সচেতন মানুষ, তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সংস্কৃতি

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশে দেশের জনগণ, অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন, ব্যক্তি ও সংস্থা অবিরাম ভূমিকা রেখে চলেছে। সাথে রাষ্ট্রের বা সরকারের ভূমিকা থাকে। সরকার প্রধান যখন একজন সংস্কৃতি সচেতন শেখ হাসিনা, তখন সাংস্কৃতিক অবকাঠামো ও সার্বিক পরিবেশ নির্মাণে তাঁর বিশেষ ভূমিকা থাকতেই পারে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যক্ষ ভূমিকার মধ্যে উল্লেখ করতেই হয় নববর্ষ উদ্‌যাপনে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'বৈশাখী ভাতা' প্রবর্তন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহও এই ব্যবস্থার অনুসরণ করছে অসম্প্রদায়িক আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে এই ভাতার ভূমিকা থাকবে বলেই আমরা মনে করি।

রাজধানী ঢাকা নগরীতে একটি কেন্দ্রীয় 'সংস্কৃতি বলয়' পরিকল্পনা ও নির্মাণ শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রসূত একটি প্রকল্প। সেগুনবাগিচার

শিল্পকলা একাডেমী, রমনার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভ ও ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর, তথা বাংলা একাডেমী, শহীদ মিনার, টিএসসি, জাতীয় জাদুঘর ইত্যাদি সমন্বয়ে বাস্তবায়ন হবে 'সংস্কৃতি বলয়। এটি খুবই অর্থবহ একটি চিন্তা। কাঁচের স্থাপত্য 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' ক্রমান্বয়ে ঢাকা তথা বাংলাদেশের প্রধানতম সৌধ বা'আইকনিক স্ট্রাকচার' হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া স্তম্ভটি বাংলাদেশের এক নারী ও এক পুরুষ স্থপতির যেন নকশায় নির্মিত। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত নকশা মডেল অনুযায়ী স্ত ম্ভটি নির্মিত। উন্মুক্ত স্বাধীনতা চত্বরের আরো বিস্তৃত পরিকল্পনার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে মূল প্রেরণা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মঞ্চের স্থানটিকে যোগ্য ঐতিহাসিক মযাদার চিরস্মরণীয় করে রাখার চিন্তা।

উপসংহার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত অর্জন বা তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যে সরকার, সেই সরকারের অর্জনের তালিকা অবশ্যই অতি দীর্ঘ , ব্যর্থতাও যে নেই তাও নয়। ভুল ভ্রান্তিও রয়েছে। আমরা তাঁর অসংখ্য অর্জনের অল্প কিছু দৃষ্টান্তই শুধু তুলে ধরলাম। তবে যে বিষয়টি বিশেষ উল্লেখ দাবি করে (তার আলোচনা বিস্তৃত পরিসর দাবি করে, আমরা তা করতে পারছি না, অন্য কেউ নিশ্চয়ই করবেন), তা হলো বাংলার তরুণ সমাজকে ডিজিটাল সংস্কৃতি প্রবেশের আহ্বান ও সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। একদিকে বড় মাপের হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা করা, অন্যদিকে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল তথ্যকেন্দ্র চালু করা, দেশের চালচিত্র বদলে দেবার পদক্ষেপ বটে। বিশ্বমঞ্চে যে রাষ্ট্রনেতা সর্বশ্রেষ্ঠ সততার স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাঁর পক্ষে অনেক অসম্ভবই সম্ভব করা সম্ভব। সাড়ে ছয় লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর বাংলাদেশের আশ্রয় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তিনি যে সাহস ও মানবতাবোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা তুলনাহীন। আমরা বিস্মিত হই, কীভাবে ১৯৮১ সালে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি প্রায় অভিভাবকহীন আওয়ামী লীগের সভাপতি পদের দায়িত্ব নিয়ে ক্রমান্বয়ে দলটিকে গুছিয়ে নিয়েছিলেন, শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছেন, ৪৯ বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবার সুকঠিন ও

মহান যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দেশ শাসনের বিচক্ষণতা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

উপসংহারে আমরা বলবো, যা কিছু আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাবেন বা করেন, বা করতে চেষ্টা করেন, বা করবেন তা সবই যেন বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত ও সংবিধান সমর্থিত চার মূল নীতির অনুসরণেই করেন। তা হলেই বাঙালি জাতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে, বাংলাদেশ ধন্য হবে, সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ হবে।

নাসির আহমেদ

শেখ হাসিনা : ঝড়ের আকাশে শান্তির সাদা পায়রা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের হাত থেকে 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার' গ্রহণ করছিলেন। ওই দৃশ্য টেলিভিশনে দেখতে দেখতে আমাদের অনেকের মনে বঙ্গবন্ধুর জুলিওকুড়ি শান্তিপদক গ্রহণের স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি স্বীকৃতি। এ পুরস্কার বিশ্বের বহু বরেণ্য ব্যক্তিত্ব তাঁর আগে অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন-নেলসন ম্যান্ডেলা, মাদার তেরেসা, নোবেল সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাসসহ অনেকেই। পুরস্কার গ্রহণের গৌরবময় মুহূর্তটি টিভিতে দেখতে দেখতে বয়স্কদের অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে পড়েছে বঙ্গবন্ধুর জুলিওকুরি শান্তি পদক লাভের ঘটনা। কী বিস্ময়কর মিল পিতা আর কন্যার! সেদিন ওই অনন্য গৌরবময় পুরস্কার যত না বঙ্গবন্ধুকে ব্যক্তিগতভাবে মহিমান্বিত করেছে, ততোধিক মহিমান্বিত করেছে যুদ্ধে জয়ী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে। শত কোটি মানুষের দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে যারা জানেন, তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারেন 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার'-এর তাৎপর্য।

জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণতন্ত্র ও শান্তির সপক্ষে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯-এর ৬ জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে যে ভূমিকা পালন করে চলেছেন, তার নির্মোহ মূল্যায়ন নিশ্চয়ই আগামীর ইতিহাসে উৎকীর্ণ হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে হয়তো শান্তির জন্য শেখ হাসিনার সাহসী ভূমিকা আজ সবাই সমান চোখে দেখছেন না, কিন্তু ইতিহাস 'কালোকে কালো আর সাদাকে সাদা' হিসেবেই চিহ্নিত করে শেষ পর্যন্ত। সত্যের প্রতি অবিচল থাকলে বিস্মৃতি হওয়ার উপায় কী বাংলাদেশের অশান্ত পার্বত্য অঞ্চল একদিন প্রায় দেশের মুল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। উত্তাল রণাঙ্গনের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল পাহাড়ি জনপদ। একটি বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার মদদে উত্তর-পূর্ব ভারতকে যেমন অশান্ত

রাখতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনি বাংলাদেশকেও অস্থির আর উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল দুই দেশের বিচ্ছিন্নতাবাসীদের যোগসাজশ।

একের পর এক সামরিক-বেসামরিক সরকার গেছে, কিন্তু নেভানোর চেষ্টা হয়নি পার্বত্য অঞ্চলের অশান্তির আগুন। দীর্ঘ ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের আগুন নিভল পার্বত্য শান্তিচুক্তির মাধ্যমে। সশস্ত্র আদিবাসীরা অস্ত্র ফেলে ফিরলেন স্বাভাবিক জীবনে। এ অনন্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি (ইউনেস্কো ফেলিপস হুফে বেইনি শান্তি পুরস্কার)। শুধু তাই নয়, যে হেনরি কিসিঞ্জার একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন, দূর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে বিব্রত করেছিলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে অসম্মানজনক উক্তি করেছিলেন, সেই হেনরি কিসিঞ্জারকেই (সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) বঙ্গবন্ধু-তনয়ার হাতে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার তুলে দিতে হলো। ইতিহাস এভাবেই তার আপনগতিতে চলে। সারাবিশ্বে তার অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিকতা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই নন্দিত হয়েছে।

সাফল্যের এ উচ্চতায় পৌঁছার পথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, বরং ছিল দূর্গম আর কন্টকিত, সে সত্য বিস্মৃত হওয়ার অবকাশ নেই মোটেও। জাতির জনক রাষ্ট্রপতি পিতার গর্বিত তনয়া যিনি, সেই তিনিই মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল খুনির নৃশংসতায় মা-বাবা, তিন ভাইসহ পরিবারের সবাইকে হারিয়ে হলেন সত্যিকার অর্থেই নিঃস্ব-রিক্ত। এমনকি বিদেশের মাটিতেও নিরাপত্তাহীন ! একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদরা শেখ রেহানা, স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া আর দুই সন্তান নিয়ে কী দুঃসহ দিন কেটেছে তার পৃথিবীর দেশে দেশে! প্রিয় জন্মভূমির মধুর স্মৃতি থেকে বহু দূরের ভিন্ন পরিবেশে কীভাবে কেটেছে তার শোকে জর্জর দিনরাত্রি, সে বিবরণ পাওয়া যায় তার লেখা একাধিক গ্রন্থে। বাংলাদেশে খুব কমসংখ্যক রাজনীতিবিদ আছেন যারা লেখেন, সেই বাস্তবতায়, বাংলা সাহিত্যের এই প্রাক্তন ছাত্রী ব্যতিক্রম। তার লেখা গ্রন্থসংখ্যা অনেক। ওরা টোকাই কেন শিরোনামের বইটি পড়তে পড়তে তার স্বদেশ সমাজ ভাবনার পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনের অনেক আনন্দবেদনার স্মৃতির সন্ধান পাই। জানা

যায় ষাটের দশকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের উত্তপ্ত দিনগুলো সংগ্রামী পিতা শেখ মুজিবের আপসহীন সংগ্রামের প্রতিদিনের সাক্ষী এক তরুণী কেমন করে রাজনীতি আর গণসম্পৃক্ত হয়ে উঠছেন। নিজের স্মৃতিচারণ উঠে এসেছে তার জীবন-সংগ্রামের নানা চিত্র। বছরের পর বছর পিতা কারাগারে। মা ফজিলাতুননেসা আগলে রাখছেন সন্তান-সংসার, রাজনীতিতেও রাখছেন ভূমিকা।

জননেত্রী শেখ হাসিনার জীবন যেন সেই শান্তির প্রতীক শ্বেতকপোতের, যাকে সারাটা জীবনই পাড়ি দিতে হচ্ছে ঝড়ের আকাশ। হয়তো আরও অনেকদিন সেই দুর্গম ঝড়ো তাণ্ডব পার হতে হবে। শৈশব-কৈশোরে যে অনন্য নেতা বাবাকে দেখেছেন, তার প্রভাব মানস গঠন করেছে পরিণত শেখ হাসিনার। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পথ পাড়ি দিয়ে চলেছেন তিনি। কারাগার- মৃত্যুর হুমকি কোনো কিছুই টলাতে পারেনি বঙ্গবন্ধুকে। টলাতে পারেনি বঙ্গবন্ধু তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও।

একটু পেছনে ফিরে তাকালে সেই অটল সংগ্রামী দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পেয়ে যাই আমরা একই সঙ্গে পেয়ে যাই আটপৌরে সহজ জীবনযাপনের অতিসাধারণ লোকজ উপাদানসমৃদ্ধ মানসগঠনও। সর্বস্তরের সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অসাধারণ গুণ ছিল বঙ্গবন্ধুর। বঙ্গবন্ধু-তনয়াও সেই গুন রক্তের উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন। সাধারণের সহজ ভঙ্গিতে প্রাণ খুলে কথা বলা, হাস্যরসিকতা সব মিলিয়ে তিনি শ্রদ্ধা জাগানিয়া এক নারী- যার মুখাবয়বে প্রতিফলিত গ্রামীণ বাংলাদেশ। শৈশব-কৈশোর থেকে দীর্ঘ পথে এসেছেন প্রাচুর্যহীন মধ্যবিত্তের সাধারণ জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে। মিশেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। এমনকি বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতির অবিসংবাদিত নেতা তখনও সামান্য অহঙ্কার স্পর্শ করেনি ছাত্রলীগের একাদার এই নেত্রীকে। এমন দীক্ষা পেয়েছিলেন পরিবার থেকেই। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সেই মূল্যবোধ আর পিতার অতুলনীয় ত্যাগী নেতৃত্ব তাকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তা না হলে এত দুঃখ শোক আর দুর্যোগ পাড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া রাজনৈতিক দলটিকে প্রায় ধ্বংসের হাত থেকে আজকের এ অবস্থানে তুলে আনতে পারতেন না তিনি।

১৯৭৫- পরবর্তী দুর্যোগ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগকে আর কোণঠাসা, এমন দ্বিধাবিভক্তির ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল যে, বাঙালির স্বাধিকার আর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্লাটফর্মটি বিপন্নতার

মুখোমুখি তখন। দলের হাল ধরতে যদি সেদিন শেখ হাসিনা অস্বীকৃতি জানাতেন, তাহলে আজ দলটির অবস্থা কী হতো, তা কল্পনা করাও কঠিন। কারণ বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যে চার জাতীয় নেতা নেতৃত্ব দিতে পারতেন, তাদেরও কারাগারে হত্যা করা হয়েছে। এ অবস্থায় খন্দকার মোশতাকের মতো বিশ্বাসঘাতক আর সুবিধাবাদীরা যখন স্বরূপে প্রকাশিত, তখন দলের ঐক্যের জন্যই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নেতা বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই চরম দুর্দিনে বেগম জোহরা তাজউদ্দীন দলের হাল ধরে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাকেও অতিক্রম করে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা গ্রহণেচ্ছুর সংখ্যা কম ছিল না। বলতে গেলে আওয়ামী লীগের জন্য এক মহাবিপর্যয় অপেক্ষা করছিল। কেননা নেতৃত্বে ভাঙন ধরানোর জন্য তখনকার শাসকদলও নানা চেষ্টা চালাচ্ছিল। সে অবস্থায় সর্বজন মান্য নেতৃত্ব না হলে আওয়ামী লীগের ঐক্য রক্ষা করা কঠিন ছিল। সেই সংকটময় মুহূর্তে তাঁর অনুস্থিতিতেই ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। অবশ্য তাকে দল যেমন রক্ষা পেয়েছে, তেমনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন সম্প্রসারিত হয়েছে।

১৯৮১ সালের ১৭ মে দীর্ঘ ৭ বছর পর দেশে ফিরে আসেন এবং শোককে শক্তিতে পরিণত করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেন তিনি। বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে, যে বাংলাদেশ দেখে গিয়েছিলেন শেখ হাসিনা, সে বাংলাদেশ ততদিনে সাম্প্রদায়িকতা, আর পাকিস্তানি স্টাইলের সামরিক শাসনে পিষ্ট হচ্ছে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর অসাম্প্রদায়িক চেতনা তাও সংবিধান থেকে মুখে গেছে। সুতরাং জেনারেল শাসিত বাংলাদেশে সত্যিকার গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনা মরুভূমি ভেজানোর মতো প্রায় অসাধ্য ছিল। ততদিনে গোটা প্রশাসনেও পাকিস্তানি চেতনার বীজ বোনা হয়ে গেছে। ফলে দলটিকে তৃণমূল পর্যায় থেকে আবার সংগঠিত করা, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য প্রহসনমূলক নির্বাচনে পরাজয় জেনেও অন্তত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগকে নির্বাচনের উপযোগী করার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্বৈশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিরোধী মোর্চা গঠনসহ বহু ঝড়ঝঞ্ঝা পাড়ি দিয়ে দলকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হয়েছে তাকে।

১৯৯০-এ জেনারেল এরশাদের পতন পর দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও শেখ হাসিনার ভূমিকা অসাধারণ। সে ভিন্ন ইতিহাস কিন্তু ১৯৯১-৯৬ পর্যায়ে নির্বাচিত সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে সাজানো নির্বাচন কমিশনসহ দলীয় প্রভাবের আওতায় নির্বাচনের নামে প্রহসন ঠেকাতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে। যে বিএনপি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৯০ দিনের অস্থায়ী সরকারের অধীনে নির্বাচন করে ক্ষমতায় গেল, সেই দল যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অস্বীকার করে তখন সচেতন মানুষ বিস্মিত হয়। সেই বিস্ময়ই শেখ হাসিনাকে আরও বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়, যা ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগকে দেশের শাসনভার গ্রহণের সুযোগ এনে দেয়। বাংলাদেশকে তিনি আবার একাত্তরের চেতনার দিকে ফেরাতে সচেষ্ট হন।

কিন্তু সে পথ বড় দুর্গম। সামরিক স্বৈরাচারের আমলেই শেখ হাসিনাকে প্রকাশ্যে গুলি করে চট্টগ্রামে হত্যার চেষ্টা হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে নিরন্তর মৃত্যুঝুঁকি তাড়া করছে তাকে। ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ভোটকেন্দ্র দেখতে গেলে গুলি ও বোমা হামলা হয় তার ওপর। ভাগ্যগুণে বেঁচে যান তিনি। ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ট্রেনে যাওয়ার সময় ঈশ্বরদী ও নাটোর স্টেশনের প্রবেশমুখে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছিল। ফাটানো হয়েছিল অসংখ্য বোমা। এরপর ১৯৯৫-৯৬ সালে একাধিকবার তার সমাবেশে বোমা ও গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ১৯৯৬ সালে ২৩ জুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে একের পর এক তাকে হত্যার চেষ্টা চলছে। কোটালিপাড়া হেলিপ্যাডে মাইন পুঁতে রাখা থেকে শুরু করে ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা পর্যন্ত বহুবার তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এখনও সে চেষ্টায় দেশি-বিদেশি চক্রান্ত তৎপর।

কারণ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে ইনডেমনিটি অদ্যাদেশ জারি এবং পাকিস্তানি বাতিল মুল্যবোধ ফিরিয়ে আনার সদ্য সর্বাত্মক চেষ্টা চলছিল এ দেশে। একাত্তরের পরাজিত শক্তি কল্পনাও করেনি আবার ফিনিক্স পাখির মতো পুনরুত্থান ঘটবে একাত্তরের চেতনার ধারক বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের। কিন্তু যেহেতু গ্রামবাংলার অধিকাংশ দরিদ্র সাধারণ বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসেন এবং দলটির প্রতি আস্থাশীল, ফলে সববাধা পেরিয়ে জননেত্রী

শেখ হাসিনার নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ গণরায় পেয়েছে। জোট শাসনের পাঁচ বছরে বিএনপি-জামায়াত প্রগতিশীল সেকুলার আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। জঙ্গি আর বোমাবাজরা তৎপর হয়েছে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। দলীয় জোট আমলে জঙ্গিবাদ আরও ব্যাপক ডালপালা ছড়িয়েছে। জেএমবি, হিজবুত তাহরীরসহ বিভিন্ন জঙ্গীবাদী সংগঠন বলতে গেলে মৌলবাদী সরকারের পৃষ্টপোষকতায় বিকশিত হয়েছিল বাংলাদেশে। এমনকি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার জনসভায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। বিলম্বিত হলেও আজ সেই হামলার নেপথ্যে তৎকালীন সরকারের একাধিক মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা বেরিয়ে আসছে। সেই হামলায় দলের শীর্ষস্থানীয় নেত্রী আইভি রহমানসহ অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শত শত নেতাকর্মী গ্রেনেডের স্পিস্নন্টারে গুরুতর আহত হয়ে এখনও সেই যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন। শেখ হাসিনার জীবন এখনও মৃত্যু ঝুঁকি সঙ্গী করেই জননেত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করতে চান প্রতিষ্ঠা করতে চান দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তির পরিবেশ। শান্তির জন্য শুধুই ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার নয়, নোবেল শান্তি পুরস্কারের মতো স্বীকৃতিও তাঁর জন্য অনিবার্য বিবেচিত হতে পারে বলে মনে করি।

নূহ উল আলম লেনিন

শেখ হাসিনা গৌরচন্দ্রিকা

আমি হলফ করে বলতে পারি অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে আমি শেখ হাসিনার আগেই না ফেরার দেশে চলে যাব। আমি যদি ওর আগে চলে যাই, তা হলে প্রথাগতভাবে ওকে নিয়ে আমার স্মৃতিচারণ সম্ভব হবে না। আমার বিকল বৃক্ষ ইতোমধ্যেই আমাকে আগাম নোটিস দিয়ে রেখেছে, ওপারের টিকেট বুকিং করা হয়ে গেছে। আমি তাই প্রথা ভেঙে শেখ হাসিনা সম্পর্কে আমার সব কথা নয় (সব কথা ওর জীবিতাবস্থায় বলা শোভন নয়), কিছু কথা বলে যেতে চাই। হয়তো জীবন আমাকে সব কথা বলার সুযোগ দেবে না।

তার আগে একটু কৈফিয়ৎ আছে। শেখ হাসিনাকে নিয়ে আমার এই লেখাটির দুটি অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ব প্রকাশিত উল্লিখিত রচনাংশ দুটি কেটে-ছেঁটে পুনর্লিখন করেছি এবং পরে এই প্রবন্ধে অন্তর্ভূক্ত করেছি। স্মৃতিচারণ অংশটি একেবারেই নতুন।

আমি এ ব্যাপারে সচেতন যে, শেখ হাসিনার মতো দেশের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যে কোন অসতর্ক মন্তব্য বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে। তবু আমি যেহেতু হাসিনার সতীর্থ ছিলাম, যেহেতু আমি ওর আগে মারা যাব, সে জন্য, গোধুলি গগনে মেঘে, আমার যা কথা, তা সেরে নিতে চাই।

কথারম্ভ

পিঙ্গল চোখ। হাঁটুর নিচে নেমে আসা মৃত্তিকস্পর্শী কালো কুন্তলা । কে এই শুভবসনা শ্যামলা মেয়েটি? জান না? ওই তো হাসিনা। শেখ মুজিবের মেয়ে। ছোট ইডেনের ভিপি।

আমার বন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সিরাজুম মুনীর বকশি বাজারের কাফেকাশ রেঁস্তোরার পাশে দাঁড়িয়ে এভাবেই আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিল শেখ হাসিনাকে। সে-ই প্রথম দেখা। সাদা সালোয়ার-কামিজ পরা লিকলিকে একটা মেয়ে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আমাদের তখন খুব মন

খারাপ। বকশি বাজার 'সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক মহিলা মহাবিদ্যালয়; ছাত্র সংসদের সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে 'ইপসু' বা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ভিপি, জিএস-সহ অধিকাংশ পদে পরাজিত হয়েছে। ভিপি পদে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে ছাত্রলীগের শেখ হাসিনা আর জিএস পদে মেনন গ্রুপের প্রার্থী নাজমা। এর আগেরবার পুরো প্যানেলে জয়লাভ করলেও এবার মাত্র কয়েকটি পদ পেয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন। পক্ষান্তরে অতীতে ওই কলেজে ছাত্রলীগের তেমন ভালো সংগঠন না থাকলেও ৬-দফা আন্দোলনের প্রভাব ছাড়াও শেখ হাসিনার সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা, তার আচার-ব্যবহার এবং পিতার বন্দিত্বের কারণে সহানুভূতি সাধারণ ছাত্রীদের মধ্যে তাকে পপুলার করে তোলে। হাসিনা ছাত্রী সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন এবং আরও কিছু পদ ছাত্রলীগকে পাইয়ে দেন। কলেজ বা বিদ্যালয় ছাত্র সংসদে ভিপি বা সহ-সভাপতি পদটিই হচ্ছে মূল। আমি তখন জগন্নাথ কলেজে পড়ি। থাকি ৩১/১ হোসনি দালানে অবস্থিত ছাত্র ইউনিয়নের অফিসে। বকশি বাজার গার্লস কলেজ (এ নামেই পরিচিত ছিল, আবার 'ছোট ইডেন' ও বলা হতো) ছাত্র ইউনিয়ন অফিসের কাছে হওয়ায়, প্রায় প্রতিদিনই কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক মেয়েদের অনেকেই নিয়মিত অফিসে ঢু মারত। বিশেষ করে কলেজ সংসদের পুরো নির্বাচনটাই পরিচালিত হয়েছে ওই অফিস থেকে। ঘটনাক্রমে সাহায্যকারী হিসেবে ওই নির্বাচনে আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম। নির্বাচনের টেকনিক্যাল ব্যাপারে অনেক পরিশ্রমও করতে হয়েছে। নির্বাচনের আগে ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে ও আলোচনাও হয়েছে যে, শেখ সাহেবের মেয়ে হাসিনার সহ-সভাপতি পদে জয় লাভের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। তবে ছাত্রলীগ যে আরও পদ পাবে তা আদৌ ভাবেনি ছাত্র ইউনিয়ন। ফাঁকে মেনন গ্রুপও জিএস-সহ কয়েকটি পদ পেয়ে যায়।

আমাদের পরিচয়ের পালাটি আরও পরে। ১৯৬৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষ অনার্সের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস। কলাভবনের দোতলার পশ্চিম দিকের ২০৬৮ নং কক্ষ। বাংলা বিভাগের প্রধান প্রয়াত প্রফেসর আবদুল হাই ড. রফিকুল ইসলামকে সাথে নিয়ে ঢুকলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে আমাদের সাথে রফিক স্যারকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হাই স্যার চলে

যাওয়ার পর রফিক স্যার একটি খাতা থেকে নাম ডাকতে শুরু করলেন নাম ডাকার পর সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীকে উঠে দাঁড়াতে বলা হলো। তারপর তার রোল নম্বরটি বলে দেয়া হলো। রফিক স্যার কড়া মেজাজে শিক্ষক। ভুল উচ্চারণ শুনতে পেলে রেগে যেতেন। প্রথম দিনেই কারও কারও ভুল 'স্যার' উচ্চারণেও ভুল হলে বাংলা বর্ণমালা 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' উচ্চারণ করতে বলেছেন। কেবল প্রথম দিনই নয়, একাধিকবার আমাদের প্রয়াত সতীর্থ আব্দুস সাত্তার বিশ্বাসকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। ভয়ে আতঙ্কে আমাদের অনেকেরই এ জন্য ঘাম ঝরছিল। একসময়ে রফিক স্যার শেখ হাসিনার নাম ধরে ডাকলেন। সামনের সারিতে বসা মেয়েদের মাঝ থেকে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরা একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। আমাদের অনার্স ক্লাসের ৬৭ জন ছাত্রী-ছাত্রদের মধ্যে সেদিন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া শেখ হাসিনাকে চিনতেন না। সে যে শেখ মুজিবের মেয়ে, সেটাও আমরা কয়েকজন ছাড়া অন্যরা জানত না। কথাটা প্রায় সবার বেলাতেই সত্য। আমরা পরস্পরকে চিনতাম না। সেই প্রথম দিনের ক্লাস শেষ হতেই পরস্পরকে চেনা জানার শুরু।

বাংলা বিভাগে অধ্যয়নকালে আমাদের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে মেয়ে সতীর্থদের চেনা-জানা বন্ধুত্ব হতে বেশ সময় লেগেছিল। এখনকার মতো সে সময়ে প্রথম পরিচয়েই 'তুই' তুমিতে' নেমে আসার চল ছিল না। দু'একজন ছাড়া 'আপনি'তে সম্বোধনের সৌজন্য সীমাবদ্ধ থাকত। আমাদের অনেক সতীর্থ বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে হাসিনা বা অন্যরা 'তুই' তুমিতে নেমেছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনেই। আর এই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এখন সবাই আমরা প্রায় সবাই তুমি, তুইতে সখ্য গড়েছি। একমাত্র হাসিনা-ই ব্যতিক্রম। আপনি'র দেয়ালটা আমরা কেউই ভাঙতে বা টপকাতে চেষ্টা করিনি।

হাসিনার সঙ্গে আমার সরাসরি কথাবার্তা হয় বাংলা বিভাগের বিভাগীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। দুটি প্যানেল পড়ে। একটি ছাত্রলীগ সমর্থিত, অন্যটি ছাত্র ইউনিয়নের। যদ্দুর মনে পড়ে ওই নির্বাচনে ১৯টি পদে ভিপিসহ ৬টি আসন পেয়েছিল ছাত্রলীগ এবং জিএস-সহ ১৩টি আসন লাভ করেছিল ছাত্র ইউনিয়ন। প্রথম বর্ষ থেকে বেবী মওদুদ ছিল ছাত্র ইউনিয়নের জিএস প্রার্থী। ভিপি প্রার্থী ছিল মাস্টার্সের ছাত্র।

প্রবল না হলেও একটা মিস্টি উত্তেজনা ছিল বিভাগীয় নির্বাচন নিয়ে। ওই নির্বাচনে শেখ হাসিনা বা আমি প্রার্থী হইনি। তবে দু'জনেই ছিলাম দুই তরফের কেউকেটা সংগঠক। ছাত্রলীগ তরফে স্বাভাবিকভাবেই বকশি বাজার কলেজের সাবেক ভিপি এবং শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার বেশ দৃশ্যমান প্রভাব ছিল। তবে বাংলা বিভাগে ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সমর্থক বেশি থাকায় আমাদেরও পোক্ত অবস্থান ছিল। এখনকার মতো মুখোমুখি সম্পর্ক নয়, তবে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এবং দূরত্ব সব সময়ই ছিল।

আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী (৪৫ বছর) পর এসে মনে হচ্ছে জাতীয় নেতৃত্বের আসনে সমাসীন থেকেও শেখ হাসিনা যখন তার তরুণ বয়সে ফিরে যান, তিনি মুহূর্তে 'ছাত্রলীগ' হয়ে যান। সুযোগ পেলে আমাকেও দাঁড় করান ১৯৬৭-এর দূরত্বে। আমরা তখন ছাত্রলীগ আর ছাত্র ইউনিয়ন হয়ে যাই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমার কমিউনিস্ট জীবন। সুযোগ পেলে হাসিনা প্রায়শই বলেন, 'কম্যুরা পাকলে আওয়ামী লীগ হয় আর পঁচলে কী হয়? বিএনপি। ঠাট্টাছলে বললেও এ কথায় যেমন কিছুটা সত্যতা আছে, তেমনি আছে শ্লেষ। তবে আমি যখন দু'একবার বলেছি , নেত্রী আওয়ামী লীগ পঁচলে কী হয়? তখন সে উত্তরটা এগিয়ে গেলেও, প্রসঙ্গটা আর এগোয়নি। মনে পড়ে একবার ইচ্ছে করেই তিনি আমাকে ক্ষ্যাপাতে মজা করে।

একাধিকবার আগের কথাটা পুনরুচ্চারণ করলে, আমিও কাটা ঘাঁ-এ নুনের ছিটা দেই। বলি, নেত্রী, আওয়ামী লীগ পঁচলে কী 'মোস্তাক' হয়? হাল্কা পরিবেশটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ফিরে যাই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথায়। শেখ মুজিব তখন দেশ রক্ষা আইনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬-দফা দাবিতে আওয়ামী লীগ আহূত হরতালের পর আইয়ুব-মোনেমের পুলিশ বাহিনী পূর্ব বাংলায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী জেলখানায় আটক। সারা দেশে বিরাজ করছিল একটা শ্বাসরুদ্ধকর থমথমে অবস্থা। পুরো ১৯৬৬-৬৮ সাল জুড়ে এ অবস্থাটা অক্ষুন্ন থাকে।

নিজের অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে স্নেহের আত্মজা হাসুর-হাসিনার ভবিষ্যৎ ভেবে স্বভাবতই মুজিব উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ কারণে ১৯৬৬-৬৭ সালে শেখ মুজিব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকতেই শেখ হাসিনার বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সতীর্থদের অধিকাংশই এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি নি। হাসিনার ঘনিষ্ঠদের, বিশেষ করে মেয়ে বন্ধুদের কেউ কেউ ওর কাছ থেকে শুনেছে। কেউ কেউ বর ওয়াজেদ মিয়াকে অ্যাটমিক এনার্জি সেন্টারে গিয়ে দেখেও এসেছে। অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব ও সতীর্থদের অনুপস্থিতিও ১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের ১৮ নম্বর বাড়িতে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে হাসিনার আকদ সম্পন্ন হয়। আড়ম্বরহীন সে বিয়ের অনুষ্ঠানে ঘনিষ্ঠ কিছু আত্মীয় ও শেখ মুজিবের দু'চারজন রাজনৈতিক অনুসারী উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ের পরও হাসিনার শিক্ষাজীবন অব্যাহত থাকে। বিয়ের পরও তার জীবনযাত্রায় বা চলনে-বলনে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের মতোই নিরাভরণ, সূচিশুভ্র বেশ-ভূষা, সহজ-সারল্যে ভরা স্নিগ্ধ মাধুর্যেভরা আমাদের চেনা বাঙালি দুহিতা শেখ হাসিনা। ক্লাসে ওর সঙ্গে দেখা হতো। কদাচিৎ আমার সঙ্গে কথা হতো। মিতভাষী হাসিনা একটা সম্ভ্রম জাগানিয়া ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতেন। তবে কোনো আত্মম্ভরিতা বা অহঙ্কারের প্রকাশ ছিল না।

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি দিয়ে আবার জেলগেটেই গ্রেফতার করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করা হয়। তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় ঐতিহাসিক 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান গং' নামক রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা, যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে সমধিক পরিচিতি অর্জন করে। ওই একই বছর ১৯ জুন ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা মামলার শুনানি শুরু হয়।

শেখ মুজিবের ৬-দফা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিয়েছিল; মোড় পরিবর্তন হয়েছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিপথে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তেমনি দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে দিয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দমন পীড়ন তৎকালীন পূর্ব বাংলাকে একটা কারাগারে পরিণত করেছিল। অন্যদিকে আর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং শেখ মুজিবসহ ৩৫জন অভিযুক্তকে ঢাকা সামরিক

ছাউনিতে আটক রেখে বিচারের প্রহসন, সারা দেশে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ধরেই নেয়া হয়েছিল শেখ মুজিবকে হয়তো ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।

ভয়-ভীতি আতঙ্কের কারণে শেখ মুজিবের ৩২ নং রোডের বাসায় তখন রাজনৈতিক কর্মীদের আনাগোনা ছিল কম। অনেকে ভয়ে ও-বাড়ির দিকে পা বাড়াতে চাইতো না। শেখ হাসিনাই একদিন আমাদের কয়েকজনকে ও বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কোনো ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়ন পরিচয়ে নয়, রাজনৈতিক কারণেও নয়, আমরা গিয়েছিলাম সতীর্থ হিসেবে। যদ্দুর মনে পড়ে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা বার্ষিক বনভোজনে গিয়েছিলাম। জয়দেবপুর জাতীয় উদ্যানের সাল্লায়। সম্ভবত হাসিনা যেতে পারেন নি। এ ছাড়া তার বিয়েতেও সতীর্থদের অংশগ্রহণ ছিল না। এ সবটা মিলিয়েই ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চের কোনো একদিন আমরা ক'জনও বাড়িতে গিয়েছিলাম ।

বাঙালি জাতির ভাগ্য নির্ধারক ঐতিহাসিক ওই বাড়িটিতে সেবারই আমার প্রথম প্রবেশ। খালাম্মা (বেগম মুজিব) আমাদের গভীর স্নেহে দৈ মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। আমাদের মেয়ে সতীর্থরা বাড়ির দোতলায় চলে গিয়েছিল অবলীলায়। আমরা ড্রয়িং রুমে, বারান্দায় বসে গাল গল্প করে চলে এসেছিলাম। '৭১- এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় ৩২ নম্বর রাস্তায় জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য যাওয়া ছাড়া ১৯৭২ সালের আগে আর বঙ্গবন্ধু ভবনে আমার যাওয়া হয়নি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে একাধিকবার দেখতে গিয়েছিলাম বাংলা বিভাগের সতীর্থদের সঙ্গে। হাসপাতালের ডক্টরস কেবিনে বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হাসিনার সঙ্গে কথা ছাড়াও, ওই হাসপাতালেই প্রথম শেখ কামালের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। গোটা ৬৮ সালটি ছিল আশঙ্কা ও উত্তেজনায় ভরপুর। সবার দৃষ্টি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দিকে। ১৯ জুন শুনানি শুরু হওয়ার পর থেকে আপাত স্তব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশটায় নতুন বিস্ফোরক উপাদান যুক্ত হতে থাকে। ক্যান্টনমেন্টে স্থাপিত বিচারিক এজলাসে শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মপক্ষ সমর্থন সূচক সাহসী উচ্চারণ, মামলার আসামিদের সওয়াল জবাব সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে থাকে। সামরিক

শাসকদের রক্তচক্ষু ও কঠোর সেন্সরশিপ এড়িয়ে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও আজাদ প্রভৃতি সংবাদপত্রে মামলার বিবরণীগুলো বাঙালির মনে বিস্ফোরণের ইন্ধন থাকে।

শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্টে বন্দি থাকলেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জনগণের মনোভাবের কথা জানতে পারতেন বাইরে থেকে পাঠানো গোপন চিরকুট এবং সাক্ষাৎপ্রার্থী বেগম মুজিব ও কন্যা হাসুর কাছ থেকে। হাসিনা, শেখ মুজিবের স্নেহের হাসু হয়ে ওঠেন বন্দি শেখ মুজিব ও বাইরে থাকা দলীয় নেতা ও ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্যকার সেতুবন্ধ। কথাটা হাসিনার কাছ থেকেই শোনা। তবে ১৯৬৯ সালে যখন ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এনএসএফ (একাংশ) এবং ডাকসু মিলে ৬-দফা ভিত্তিক ১১-দফা দাবি প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে তখন, হাসিনার মাধ্যমেই আমরা এর প্রতি শেখ মুজিবের অনুমোদন বা সম্প্রীতির কথা জানতে পারি।

ঠিক সম্মুখসারিতে না থাকলেও হাসিনা ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের নেপথ্যে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য এটা তখন, আমাদের জানার কথা না। কিন্তু ঊনসত্তরের আন্দোলন চলাকালে কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপনকারী নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, সামসুদ্দোহা প্রমুখদের সাথে সংযোগ রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার সুবাদে নেপথ্যের কথাই আমার পক্ষে জানা সহজ হয়। ঊনসত্তরের ২৪ জানুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানের পর ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত কেবল নেপথ্যে নয়, প্রকাশ্যেই হাসিনা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাকে আমরা প্রায়শ জহুরুল হক ক্যান্টিন ও ডাকসু কার্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখতাম।

বিপুল গণ-আন্দোলনের মুখে শেখ মুজিবের মুক্তি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবকে ছাত্রসমাজের সংবর্ধনা ও বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করার পর দৃশ্যপট বদলে যায়। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সারা পাকিস্ত ানে নতুন করে সামরিক আইন জারি হয়। আইয়ুব খাঁ পদত্যাগ করে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া অবিলম্বে এক লোক এক ভোট ভিত্তিতে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে 'এলএফও' নামে অধ্যাদেশ জারি করে।

দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পাল্টে যায়। শুরুতে নূর খানের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলেও, দেশ দ্রুত নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ ফোরাম ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি বা 'ডাক'ও ভেঙে যায়।

আমরা আবার ক্লাসে ফিরে আসি। লেখাপড়ায় মনোযোগ দেই সাব-সিডিয়ারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। এর মধ্যে শুনতে পাই হাসিনা তার পরমাণুবিজ্ঞানী স্বামী ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে ইতালি না ইংল্যান্ড কোথায় চলে গেছেন। পরীক্ষা না দিয়ে চলে যাওয়ায় আমরা কিছুটা বিস্মিত হই।

হাসিনার পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। সাত মাস পরে দেশে ফিরে এলেও হাসিনা আর আমাদের সাথে অনার্স কোর্সে থাকতে পারেন নি। সম্ভবত পরের সেশনে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আগে আর শিক্ষাজীবনে তার ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। সেই সঙ্গে একই বিভাগের সহপাঠী হিসেবে তার সঙ্গে আমাদের আমার যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। নির্বাচনে এবং পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যে যার অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করলেও, শেখ হাসিনা আর আমাদের মধ্যে তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধকালে তার অবরুদ্ধ অবস্থার কথা আমরা জানতাম।

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ওয়্যারলেস মারফত প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার পরক্ষণেই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ২৭ মার্চ বেগম মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যরা ৩২ নম্বরের বাড়ি ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। হাসিনা থাকতেন ধানমন্ডির ১৫ নং রোডে ড. ওয়াজেদের বাসায় ২৫ মার্চ রেহানাও ওর সাথে ছিল। সেই ঘোর দুর্দিনে ঢাকা শহরে কেউই বঙ্গবন্ধু পরিবারকে আশ্রয় দিতে চায়নি। বঙ্গবন্ধু পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে পরিচিত ধানমন্ডির ২৭ নং রোডের ধনাঢ্য কাজী মাবুবুল্লা সাহেবের (কাজী

জাফরুল্লাহ্র বাবা) কাছে সহায়তা চেয়েও বেগম মুজিব প্রত্যাখ্যাত হন। মগবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকবার বাড়ি বদল করার পরও কোথাও নিরাপদ আশ্রয় তারা পাননি। প্রথম দিকে আলাদা থাকলেও ঢাকা শহরের অবস্থার আরও অবনতি ঘটলে হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ মিয়া বেগম মুজিবের কাছে এসেই থাকতে শুরু করেন। হাসিনা তখন সন্তান সম্ভবা। আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা এবং তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্যে কেটেছে সেইসব দিন।

অবশেষে সেই পলাতক জীবনের অবসান ঘটে। ধানমন্ডির ১৮ নং রোডের একটি একতলা বাড়িতে বঙ্গবন্ধু পরিবারকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রহরায় অন্তরীণ রাখা হয়। এই বাড়িতে বন্দি থাকাকালেই শেখ হাসিনাকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৭ জুলাই যখন হাসিনা তার প্রথম সন্তানের মা হন, তখনও পাকহানাদার বাহিনী বেগম মুজিব বা পরিবারের কোনো সদস্যকে তার কাছে যেতে দেয়নি। নবজাত শিশুকে নিয়ে কয়েকদিন পর হাসিনা আবার ১৮নং রোডের সেই বন্দিশালায় মায়ের কাছে চলে আসেন।' ৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর এই বাড়ি থেকেই বঙ্গবন্ধু পরিবারকে মুক্ত করে ভারতীয় মিত্রবাহিনী।

স্বাধীনতার পর আমি ছাত্র আন্দোলনের মধ্যমসারির নেতা থেকে প্রথম সারিতে উঠে আসি। একসময়ে (১৯৭৩-৭৪,৭৬) আমি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব পালন করি। ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেলের সহ-সভাপতি প্রার্থী হিসেবে (১৯৭৩) ডাকসু নির্বাচনও করি। আর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু বাকশাল করার পর বাকশালের অঙ্গ সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত হই। আর পুরো সময়কালটিতে শেখ কামালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়লেও হাসিনার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত বহুবার আমি আমার ছাত্র আন্দোলনের সহকর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসভবন, পুরনো গণভবনে দেখা করেছি। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের দুটি সম্মেলনেই প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেছেন। আওয়ামী লীগ অনুসারী ছাত্রলীগ চলে যাওয়ায় বঙ্গবন্ধু দুঃখ পেয়েছিলেন। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর পাশে দৃঢ়ভাবে ছিলাম আমরা-ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন এবং ভরসাও করতেন।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি থাকাকালে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাওয়ার অবাধ সুযোগ ছিল আমার।

সে জন্য সুযোগ পেলেই আমরা ৩২ নম্বরের বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চলে যেতাম। তবে ১৯৭৩ এর পর ৩২ নম্বরের বাড়িতে বেগম মুজিবের সঙ্গে, কামাল ও রেহেনার সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হলেও হাসিনার সঙ্গে দেখা হয়নি, কথা হয় নি।

হাসিনা তখন অন্তরালবর্তীনি গৃহবধূ। দুই শিশু সন্তানের জননী। নিঃসন্দেহে তার ছাত্রলীগ করা সতীর্থ ও বন্ধু-বান্ধবীদের তার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। শেখ কামাল ও জামাল বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছাড়া ছাত্র ইউনিয়ন থেকে আগত 'জাতীয় ছাত্রলীগের' নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, ১৯৭৫ সালে জাতীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ শহীদের বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে ওকে দেখেছিলাম কি-না।

অতঃপর ছায়াচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন। ১৯৭৫ সালের ১৫ সালের আগস্টের মহাট্র্যাজেডি। রাহু কবলিত বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা ও রেহানার প্রবাস জীবন। ১৯৮১ সাল। বঙ্গবন্ধু শূনত্য বাংলাদেশে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন। ইতিহাসের নতুন অধ্যায় । নতুন অভিযাত্রা।

নির্বাসিত জীবন : শোক থেকে শক্তির উদ্বোধন

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের যে প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন, সেদিন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ছিলেন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে। জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সংবাদ তাদের জানান। শেখ হাসিনা ও রেহানা অবিলম্বে জার্মানি প্রত্যাবর্তন করেন।

সম্প্রতি প্রয়াত হুমায়ূন রশিদ চৌধুরীর স্ত্রীর এক টিভি সাক্ষাৎকারে জানা যায় হুমায়ূন রশিদ চৌধুরীর বাসভবনে অবস্থানকালেও শোক বিহ্বল দুই বোন জানতেন না যে ঢাকায় তাদের পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। এমনকি হাসিনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে এ মন্তব্য করেছেন যে, আব্বা বলেছেন, আমার কোনো বিপদ হলে তোরা তোদের মোস্তাক কাকার কাছে যাবি

(বেগম হুমায়ূন রশিদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ..... টিভি)। মনে প্রশ্ন জাগে সত্যিই কী বঙ্গবন্ধু মোস্তাককে এতটা বিশ্বাস করতেন? ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস!

যে আত্মস্বীকৃত খুনিরা জাতির জনককে পাশবিক উল্লাসে হত্যা করেছে, তারা সুযোগ পেলেই বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যাকেও হত্যা করতে পারে বলে একাধিক সূত্রে জানা যায়। নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার জীবন এমতাবস্থায় তৎক্ষণাৎ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন যে নিরাপদ ছিল না তা বলাই বাহুল্য। তারা সে সময় ঢাকায় ফিরে এলে ঘাতকরা তাদের ও বাঁচতে দিত না। ৩ নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডই তার প্রমাণ।

বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা তাই ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট তারা নয়াদিল্লি পৌঁছান। শুরু হয় দীর্ঘ ছয় বছরের অনিশ্চিত নির্বাসিত জীবন।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশে একটি ফ্যসিবাদী সামরিক চক্র ক্ষমতা দখল করার পর বঙ্গবন্ধু পরিবারের জীবিত দুই সদস্যকে আশ্রয়দানের মতো তেমন কোনো বন্ধুরাষ্ট্রও ছিল না। অবশ্য সে চেষ্টাও করা হয়নি। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপের দেশ অথবা ব্রিটেন তাদের আশ্রয় দিত কি-না যাচাই করলে হয়তো তা জানা যেত। তবে এই যাচাই করা বা অনুন্ধান করার মতোও তেমন কোনো বান্ধব ছিল না। এমতাবস্থায় জার্মানিতে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত প্রয়াত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর পরামর্শে ও মধ্যস্থতায় শেখ হাসিনা ও রেহানার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতকে বেছে নেয়া হয়। ভারতে তখনও ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী। ভারত সরকার নয়াদিল্লিতে হাসিনা-রেহানাকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে।

কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও তখন টালমাটাল। জরুরি অবস্থা জারি করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে যে বাড়াবাড়ি করা হয়, তার ফল হয় উল্টো । সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। মিসেস গান্ধী নিজে পরাজিত হন। ক্ষমতাসীন অকংগ্রেসী দেশই সরকার বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি, আওয়ামী লীগ ও

বঙ্গবন্ধুকন্যাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। ৭৫ এর বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগের যে শত শত নেতা-কর্মী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, মানবেতর জীবন-যাপনের পর অচিরেই তাদেরকে ভারত ত্যাগ করে বাংলাদেশে চলে আসতে হয়। সম্ভবত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নানা বিবেচনায় শেখ হাসিনাকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করা হয়নি। বলাবাহুল্য, শেখ হাসিনার দিল্লি প্রবাস-জীবন খুব একটা সুখকর ছিল না। ড. ওয়াজেদকে ভারত সরকার ভারতীয় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে একটা চাকরি দেয়। খুব সীমিত আয় দিয়ে, দুই সন্তানের পড়াশোনাসহ সংসার চালাতে হয়। শুধু তা-ই নয়, দিল্লির ওই অনিশ্চিত জীবনের মধ্যেই তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী আত্মীয় পরিজন, দলীয় কর্মী, এমনকি ঢাকাস্থ আত্মীয় এবং দলীয় কর্মীদেরও নানাভাবে সাহায্যের উদ্যোগ নেন।

১৯৭৫ সালে দিল্লিতে প্রথমে 'ডিফেন্স কলোনির একটি বাড়িতে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে' হাসিনা রেহানাকে আশ্রয় দেয়া হয়। পরে 'ইন্ডিয়া গেট'-এর কাছে পাণ্ডারা রোডের একটি বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে তাদের থাকতে দেয়া হয়। প্রায় ছয় বছর ওই বাড়িতেই ছিলেন হাসিনা। ২০১১ সালে আমি সস্ত্রীক দিল্লি গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মোৎসবে যোগ দিতে। সরকারি প্রতিনিধি দল তিন দিন শেষে চলে আসার পর আমরা কয়েকদিনের জন্য দিল্লি থেকে যাই।

আমার খুব কৌতূহল ছিল শেখ হাসিনার দিল্লির আশ্রয়স্থলটি দেখার। দিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার এনামকে বলায়, সে আমাদের পাণ্ডারা রোডের ওই বাড়িতে নিয়ে যায়। ওই বাড়ি দেখে এসে ২০১১ সালের ১৭ মে আমি আমার ডায়রিতে যে কথা গুলো লিখে রেখেছি, এখানে তা হুবহু তুলে ধরছি-

আজ সকালে গিয়েছিলাম পাণ্ডারা পার্ক এলাকায়। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জার্মানি থেকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে শেখ হাসিনা, রেহানা যে বাড়িটিতে উঠেছিলেন, সে বাড়িটি দেখতে গিয়েছিলাম।

ভারতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার এনামুল হক চৌধুরী বস্তুত রাজনৈতিক নিয়োগ পেয়ে এখানে আছেন। এনাম জোট সরকারের আমলে নিগ্রহের শিকার হয়েছিল। তাকেই আমার ইচ্ছেটা জানাই। শেখ

হাসিনার জীবন ভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ ছবির অ্যালবাম করব বলেই এই বাড়িটি দেখা ও ছবি তোলা জরুরি ছিল। ছবি উঠেছে কি-না বুঝতে পারছি না। এনামের মেয়েও তুলেছে। যাই হোক ছবি পাওয়া যাবে।

CI-28 PANDARA PARK-DELHI-এর এই বাড়িটি দোতলা। ভেতরে ঢুকতে পারিনি। বাইরে থেকেই কয়েকটি ছবি তুলেছি। বর্তমানে একজন উচ্চপদস্থ পিএইচডিধারী অঝও কর্মকর্তা থাকেন। পুরো দোতলা বাড়িটির দু'পাশে দু'জন কর্মকর্তা থাকেন। এই এলাকাটাই সরকারি কর্মকর্তাদের বাসভবনের জন্য নির্দিষ্ট। ড.ওয়াজেদ মিয়াকে ভারতীয় পরমাণু কমিশনে চাকরি দিয়ে এ বাড়িটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। বাড়ির সামনে গাছ-গাছালি ভরা ছোট একটা পার্ক। এই পার্কে ঘুরে বেড়াত এবং খেলা করত শিশু জয় ও পুতুল । সামনেই, তিনশ' গজের মধ্যে একটি স্কুলে (আমি নিশ্চিত নই) জয়কে পড়তে দেয়া হয়েছিল বলে শুনেছি। সম্ভবত সে স্কুলটিই আজ দেখেছি এক পলক। এনাম জানালো গত বছর সস্ত্রীক জয় এসেছিল দিল্লিতে। সে তার শিশুকন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে শৈশবের ওই বাড়িটি বাইরে থেকেই দেখে গেছে। জয় ওর শিশুকন্যাকে, ও নিজে শৈশবে যে গাছটিতে চড়তে ভালোবাসত, সে গাছটিতে চড়িয়েছে, ছবি তুলেছে।

হাসিনা মানুষ হিসেবে এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে কতটা বড়মাপের হয়েছে, তার বিচার করবে ইতিহাস । কিন্তু তার ব্যক্তিগত-পারিবারিক জীবনের ট্রাজেডি, দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করা বাংলাদেশের সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক আবহে চরম প্রতিকূলতা মোকাবেলা করা সর্বোপরি প্রতিটি মুহূর্তে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে চলা এক অতুলনীয় ঘটনা দিল্লির এই নির্জন এবং আত্মীয়-বান্ধবহীন বাড়িটিতেই চলেছে তার নীরব প্রস্তুতি। বলা যেতে পারে এখান থেকেই তার শুরু। এই বাড়িটির তাই একটা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। প্রবাসে যে বাড়িটিতে তিনি থেকেছেন, বাংলাদেশের স্থপতির কন্যা যিনি, যিনি বাংলাদেশ দু'দুবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তার স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটিকে সংরক্ষণ করার কথা উঠানো কী আদিখ্যেতা হবে? ব্যক্তির জীবিতকালে সাধারণত এসব হয় না। হয় মৃত্যুর বহু পরে। প্রচলিত এই প্রত্নচিন্তা' বর্জন করে আমি অন্তত ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে আমার প্রস্ত

াবটা তুলতে পারি। হাসিনাকে না জানিয়েই। স্তাবকতা নয়, ইতিহাসের দাবি মেটাতে।

এই নির্বাসিত জীবনে শেখ হাসিনা কেবল আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন না। নবতর সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং নির্বাসনে থেকেই বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের পুনর্সংগঠিত করার কাজ শুরু করেছিলেন। শেখ হাসিনার শৈশব-কৈশোর ও তারুণ্যের দিনগুলো কেটেছে বাঙালি জাতির প্রতিটি সংগ্রামের পুরোধা বঙ্গবন্ধুর স্নেহচ্ছায়ায় এবং স্বাধিকার আন্দোলনের পুরোগামী ছাত্র আন্দোলনের সম্মুখসারিতে। রাজনীতি এবং দ্রোহ চেতনা ছিল তার মজ্জাগত।

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে তার অগ্রণী ভূমিকার কথা আগেই বলেছি। স্বাধিকার আন্দোলন থেকে ১৯৭১- এর অসহযোগ আন্দোলনেও শেখ হাসিনার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি পাশে থেকে পিতাকে সাহায্য করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পাকিস্তানি শাসকদের হাতে সপরিবারে বন্দিত্বের যন্ত্রণা ভোগ করেছে। আন্দোলন-সংগ্রাম-বন্দিত্বের মধ্যেই কেটেছে শৈশব-কৈশোর ও তারুণ্যের সোনালি দিনগুলো। অদম্য জ্ঞানস্পৃহা, শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে নিজের আইডেন্টিটি প্রতিষ্ঠার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে শিশু-সন্তানদের কোলে নিয়েই স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে শেখ হাসিনা ইডেন কলেজ থেকে পরীক্ষা এবং স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে এভাবেই গড়ে উঠেছে সংগ্রামের আগুনে পোড় খাওয়া তার ইস্পাত দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি পেয়েছেন সাহস, ধৈর্য এবং দেশমাতৃকার জন্য পিতার মতো অন্ধ ভালোবাসা।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রাথমিক ধাক্কাটা সামাল দেয়া, ছোট বোন রেহানার বিয়ে দিয়ে তার জীবনের অনিশ্চয়তার অবসান এবং নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত করার পর নির্বাসনের দিনগুলোতে ধীরে ধীরে স্বজন হারানোর সুগভীর শোককে তিনি শক্তিতে পরিণত করেন। নির্বাসনে থাকলেও মাতৃভূমিতে সংগ্রামরত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং বঙ্গবন্ধুর অপরাপর অনুসারী ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রগতিশীল দল, ব্যক্তি ও সিভিল সোসাইটির সদস্যদের সঙ্গে গড়ে তোলেন ঘনিষ্ট যোগাযোগ। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু ও জেলাখানায় নিহত জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের

বিচার এবং বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি ।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরপরই শেখ হাসিনা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও অন্যান্য দেশের সরকার প্রধান, রাজনীতিবিদ, সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠনের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ করেন। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের একটি প্রতিনিধি দল সন্ ম্যাকব্রাইডের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফর করে। প্রতিনিধি দলটি জেনারেল জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। জিয়া এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো অঙ্গীকার না করে বিচারের প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। অতঃপর শেখ হাসিনা ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন । ১৯৭৯ সালে ৮-১০ মে সুইডেনস্থ বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলন এক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। সম্মেলনে শেখ রেহানা ও সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম যোগদান করেন। শেখ হাসিনা সম্মেলনে যোগদান করতে না পেরে একটি দীর্ঘ বাণীতে দিকনির্দেশনা দেন।

আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন

শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার নিরন্তর চেষ্টা এবং প্রবাসী বঙ্গবন্ধু অনুসারীদের উদ্যোগের ফলে ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যা সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য স্যার টমাস ইউলিয়াম কিউসিকে চেয়ারম্যান করে গঠিত কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে, ছিলেন নোবেল বিজয়ী প্রবীণ আইরিশ আইনজীবী ও অ্যামনেস্টির সাবেক সভাপতি সন্ ম্যাকব্রাইড, জেফরি টমাস কিউসি এমপি এবং অব্রে রোজ (সলিসেটার)। মি. রোজ ছিলেন কমিশনের সদস্য সচিব। এই কমিশন গঠন করার ভেতর দিয়ে শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের দাবিটি আন্ত র্জাতিক অঙ্গনে উত্থাপন করেন।

এ ঘটনাটি বাংলাদেশে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং বঙ্গবন্ধু অনুসারীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় সাহস ও

উদ্দীপনা। দেশের বাইরে থাকলেও শেখ হাসিনার ওই উদ্যোগ জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত করে নতুন মাত্রা। ১৯৮২ সালের ২০ মার্চ আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তথ্যগত নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ প্রতিবেদনেই প্রথম বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও জেলহত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের একাংশকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়। মানবতা-বিরোধী অপরাধ হিসেবে এসব হত্যাকাণ্ডের বিচারের প্রশ্নটি বিশ্বজনীন গুরুত্ব অর্জন করে। ইতোমধ্যে শেখ হাসিনার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ডাক আসে।

মাতৃভূমির ডাক

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত ঘটনাবলির পর তাৎক্ষণিকভাবে স্বদেশে ফেরার কোনো পরিবেশ ছিল না। মাতৃভূমি বাংলাদেশে তখন চলছে ক্যু পাল্টা ক্যু। ক্ষমতার বখরা নিয়ে চলছিল হিংস্র শকুনিদের টানাহেঁচড়া। জেনারেল জিয়ার বর্বর সামরিক জান্তার বুটের তলায় পিষ্ট হচ্ছিল পবিত্র সংবিধান, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। বঙ্গবন্ধু অনুসারীদের পেছনে তাড়া করে ফিরছিল মৃত্যুর বিভীষিকা। বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ ছিল নিষিদ্ধ। সামরিক জান্তা চায় নি বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসুক। তাই তারা তৈরি করে নিষেধের বেড়াজাল, দেশের বুকে জন্ম দেয় 'ভয়ের সংস্কৃতি'।

এদিকে দিক-নির্দেশহীন, কাণ্ডারিবিহীন জাতি অতল অন্ধকারের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তার হাতে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেও চলছে নেতৃত্বের শূন্যতা। গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এই দুর্দিনেও দলের একাংশ দল থেকে বেরিয়ে পাল্টা সংগঠন করেছে। মূল দলেও চলছে উপদলীয় কোন্দল,পরস্পর অবিশ্বাস। লাখ লাখ আওয়ামী লীগ কর্মী হতাশায় মূহ্যমান।

অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শিবিরের অন্যান্য দলেও চলছে নানা বিভ্রান্তি। এক ঘোর অমানিশার রাহু যেন সব কিছু গ্রাস করেছে।

এমনি এক দুঃসময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতৃবর্গ সর্বসম্মতভাবে জাতিকে নেতৃত্বের শূন্যতা থেকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরে এসে দলের দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ

জানান। স্বভাবতই দেশ মাতৃকার প্রতি কর্তব্যবোধে প্রাণিত শেখ হাসিনা এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। দলের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেও দল তাকে সভাপতির দায়িত্বভার চাপিয়ে দেয়। ১৯৮১ সালের ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে তার অনুপস্থিতিতে তাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। আর ওই বছরেরই ১৭ মে দীর্ঘ ছয় বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে আসে শেখ হাসিনা।

তিন দশকের সংগ্রাম ও সাফল্য

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তিন দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। এই তিন দশক ধরে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষ ব্যক্তি। আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের প্রতীক। এ নিবন্ধে আমি শেখ হাসিনার কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে চাই না। তবে তার তিন দশকের সংগ্রামের মূল অর্জনগুলো সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণাটুকু যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই।

অনেকেই বলবেন, তার বড় কৃতিত্ব তিনি ইতোমধ্যে দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এবং প্রায় ৩১ বছর যাবত আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমার মতে, প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়াটা শেখ হাসিনার প্রধান অর্জন নয়। একজন রাজনৈতিক কর্মীর ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারের কথা বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে এর (প্রধানমন্ত্রী হওয়া) চেয়ে বড় কোনো অর্জন হতে পারে না। কিন্তু জাতির জীবনে এর মূল্য কতটুকু?

আমি মনে করি শেখ হাসিনার জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বা জাতীয় জীবনের সঙ্কট উত্তরণে তার অসাধারণ ভূমিকা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে তার প্রজ্ঞা, সাহস, ধৈর্য দৃঢ়তা, রাজনৈতিক কৌশল এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশকে চূড়ান্ত অধোগতি থেকে রক্ষা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ধারা ও গৌরব পুনরুদ্ধার, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আওয়ামী লীগকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা ও শক্তিশালী করা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা ও এগিয়ে

আওয়ামী লীগের যেসব জ্যেষ্ঠ নেতা শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তাদের ধারণা ছিল শেখ হাসিনাকে শিখণ্ডী হিসেবে সামনে রেখে তারাই দল চালাবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সে ধারণা ভুল প্রমাণিতহলো। চলতে চলতে শেখা এবং শিখতে শিখতে ক্রমশ তার ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বলতর হতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসকদের তীব্র দমননীতির শিকারে পরিণত হয় আওয়ামী লীগ। খন্দকার মোস্তাকের অনুসারী একটি অংশ আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগেই আওয়ামী লীগ একাধিক উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নামেই স্বতন্ত্র দল (মিজান লীগ হিসেবে পরিচিত) গঠন করে। সিলেটের (হবিগঞ্জ) সদ্য প্রয়াত দেওয়ান ফরিদ গাজীর নেতৃত্বেও একটি উপদল আত্মপ্রকাশ করে। সেনাশাসকরা আওয়ামী লীগকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা এবং মুসলিম লীগের মতো মৃত দলে পরিণত করার জন্য সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীকে লাগিয়ে সব রকম চেষ্টা করে। শেখ হাসিনা এসব ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এবং আক্রমণকে মোকাবেলা করেই দলকে পুনর্গঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বড় হোঁচট খান ১৯৮৩ সালে দলের প্রভাবশালী সংগঠক এবং তরুণদের কাছে অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের দল ভাঙার উদ্যোগে। গুছিয়ে তোলার আগেই দলে বড় রকমের ভাঙন ধরে। আবদুর রাজ্জাক ও মহিউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালের ২২ অক্টোবর বাকশাল গঠিত হয়। ছাত্রদের প্রধান অংশ এবং দলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী বাকশালে যোগদান করে। দলের মধ্যে সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব সঙ্কট।

শেখ হাসিনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব পুরো আশির দশক জুড়ে স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি আওয়ামী লীগকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা। অসীম ধৈর্য ও একাগ্রতা নিয়ে তিনি দলকে তৃণমূল পর্যায় থেকে পুনঃসংগঠিত এবং যারা দলত্যাগ করেছিলেন তাদের বিভেদের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে ঐক্যবদ্ধ করার মতো অসাধ্য সাধন করেন। ফলে সাড়ে আট বছর পর ১৯৯১ সালের ১৪ আগস্ট বাকশালের বিলুপ্তি ঘটিয়ে আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বাধীন অংশটি মূল দলে পুনরায়

একীভূত হয়। সংকট সৃষ্টি করতে না পারলেও ১৯৯৩ সালে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একটি অংশ আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যায়। এ সত্ত্বেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই নবজাগ্রত ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং দীর্ঘ ২১ বছর পর আবার সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়।

দুই.

১৭ মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিনের মাথায় ৩০ মে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান নিহত হন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর বিচারপতি আবদুস সাত্তারের 'নির্বাচিত' স্বল্পায়ু সরকারের বছর না যেতেই (২৪ মার্চ, ১৯৮২) দেশে আবার সামরিক শাসন জারি হয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। দীর্ঘ ৯ বছর এরশাদের সামরিক-অসামরিক স্বৈরশাসন দেশের বুকে চেপে বসে থাকে।

এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলনের ভেতর দিয়েই শেখ হাসিনা জাতীয় নেতৃত্বের প্রথমসারিতে উঠে আসেন। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তিনি একদিকে সকল সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শক্তিকে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করেন; অন্যদিকে পৃথক পৃথক মঞ্চে বিএনপিসহ এরশাদ বিরোধী অন্যান্য দক্ষিণপন্থি শক্তিগুলোকেও 'যুগপৎ' আন্দোলনের ধারায় শামিল করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অনিবার্য বিজয় ছিনতাই হয়ে যায়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পুনর্জাগরিত আওয়ামী লীগ তার শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার আরেকটি সাফল্য হলো, এরশাদ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা এবং '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো। ১৯৯১-এর নির্বাচনে বিজয় লাভ সম্ভব না হলেও শেখ হাসিনার অনমনীয় ভূমিকার ফলে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

তিন.

শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এবং আওয়ামী লীগ অভিনব সঙ্কটে পড়ে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মতোই ২০০১ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল সুনিশ্চিত। '৯১ সালে দৃশ্যত অবাধ

নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলেও পর্দার অন্তরালে কলকাঠি নেড়ে বিএনপির বিজয় নিশ্চিত করা হয়। '৯১-এর নির্বাচনে জয়ী না হওয়ায় হতাশা সৃষ্টি হলেও দল তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সঙ্কটে পড়েনি। কিন্তু ২০০১ সালের কারচুপির নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ বিএনপি-জামাত জোটের হিংস্র আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। পঁচাত্তরের ট্রাজেডির কথা বাদ দিলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আর কখনও এমন রক্তাক্ত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কবলে পড়তে হয়নি দলটিকে। হাজার হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রাম ভিটেমাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলে পাশবিক নির্যাতন। শত শত মানুষ নিহত হয়। হাজার হাজার নারী হয় ধর্ষণের শিকার। জোট সরকারের পাঁচ বছরের সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য শাহ কিবরিয়া ও শ্রমিক নেতা সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ মাস্টারসহ আওয়ামী লীগের বহুসংখ্যক নেতা পরিকল্পিত হত্যাকান্ডে শিকার হন। এমনটি ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট উপর্যুপরি গ্রেনেড হামলায় শেখ হাসিনাসহ গোটা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। গ্রেনেড লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হওয়ায় শেখ হাসিনার প্রাণ রক্ষা পেলেও নারীনেত্রী আইভি রহমানসহ ২২ জন নেতাকর্মী নিহত হন। রাষ্ট্রীয় মদদে দেশে মৌলবাদী জঙ্গিবাদের সশস্ত্র উত্থান ঘটে। বিপন্ন হয়ে পড়ে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা।

হত্যা, সন্ত্রাস কারানির্যাতন ও নানামুখী দমন-পীড়ন মোকাবেলা করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন শেখ হাসিনা। গণতন্ত্র রক্ষা এবং অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে গড়ে তোলেন বৃহত্তর ঐক্য।

চার.

বিএনপি-জামাত জোট সর্বশেষ সঙ্কট সৃষ্টি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার লক্ষ থেকে তারা তাদের বশংবদ রাষ্ট্রপতি ইয়াজ উদ্দিনকে প্রধান করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন গঠন, এক কোটির ওপর ভুয়া ভোটার, প্রশাসন দলীয়করণসহ নীলনকশার নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন সম্পন্ন করে। কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি

ঘোষিত নির্বাচন বানচাল করে দেয়। দেশ এক অনিবার্য সংঘাত থেকে রক্ষা পায় এবং ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মতো আরেকটি প্রহসনের নির্বাচন ঠেকিয়ে দেওয়া হয়।

দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের জীবনে অভূতপূর্ব এক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। শুরু থেকেই শেখ হাসিনা অবিলম্বে নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। জরুরি অবস্থার পর অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় শেখ হাসিনা 'সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন' অনুষ্ঠানের পক্ষে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জরুরি অবস্থার সুযোগে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া এবং রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক নির্যাতনের আশঙ্কাও ব্যক্ত করেন। কিন্তু তার এই দুরদর্শী প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হয় নি। প্রবীণ নেতারা সময় দিতে চেয়েছে। অতঃপর হাসিনার আশঙ্কাই প্রমাণিত হলো। সেনাসমর্থিত এই সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় 'মাইনাস টু' ফর্মুলার নামে শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দেশে সংঘাতময় রাজনীতির জন্য দুই নেত্রীকে, কার্যত শেখ হাসিনাকে দায়ী করে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। বিদেশ ভ্রমণে গেলে তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু শেখ হাসিনার দৃঢ়তা এক জনমতের চাপে তাকে দেশে ফিরতে দিলেও, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করা হয়। রাজনীতিবিদগণ ক্ষমতায় যাবেন আবার জেলও খাটবেন-এতে কোনো অভিনবত্ব নেই সত্য।

কিন্তু বিনা অপরাধে জনগণ, দল এবং ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করার কোনো অধিকার কারও নেই। বলাবাহুল্য এই উদ্যোগের পেছনে দেশকে নেতৃত্বশূন্য করার গভীর ষড়যন্ত্র যেমন ছিল, তেমনি ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বানচাল করার পরিকল্পনা। 'মাইনাস টু' ফর্মূলার অংশ হিসেবেই সংস্কারের নামে আওয়ামী লীগকেও বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়। সেনা কর্মকর্তাদের চাপ ও বস্ন্যাকমেইলের কাছে কাপুরুষোচিতভাবে নতি স্বীকার করে আওয়ামী লীগের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা দলীয় ফোরামের বাইরে, পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলনে 'সংস্কার প্রস্ত

াব' উত্থাপন করেন। ভেতর থেকে দলকে বিভক্ত ও দুর্বল করার এই অপচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

দেশ ও জনগণের প্রতি অঙ্গীকার, পিতার মতোই মৃত্যুভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করার অসীম সাহস, মাথানত না করার দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস সর্বোপরি জনগণের প্রতি গভীর আস্থা থাকায় এই 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করতে অসাধারণ রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় দেন শেখ হাসিনা। রাজনীতি থেকে তাকে মাইনাস করার চক্রান্তকেই কেবল তিনি ব্যর্থ করে দেন নি, দলের ঐক্য রক্ষা এবং নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অভাবিত তিন-চতুর্থাংশ আসনে আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের বিজয় নিশ্চিত করে।

পাঁচ

সর্বশেষ শেখ হাসিনা মোকাবেলা করেন, বিডিআর বিদ্রোহ থেকে উদ্ভূত সঙ্কট। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা গঠনের মাত্র ৭২ দিন পর ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টসহ দেশের বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে সৃষ্টি হয় চাপা উত্তেজনা। খালেদা জিয়া এবং বিরোধীদল এর সুযোগ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করে। নির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল করে তোলা এবং দেশকে সংঘাত ও নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়ার পাঁয়তারা চলতে থাকে।

সরকার সংঘাত ও রক্তপাত এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের আত্মসমর্পণ এবং বিদ্রোহ প্রশমনের সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শেষ পর্যন্ত শান্তি পূর্ণভাবেই বিডিআর বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সহকর্মীদের জন্য শোকাহত সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণ অফিসারদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। সেনা সদস্যদের উত্তেজনা প্রশমন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টা বানচাল করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গমন করেন। তিনি অফিসার ও জওয়ানদের সমাবেশে (দরবার) বিক্ষুব্ধ অফিসার এবং জওয়ানদের ক্ষোভ, যন্ত্রণা, দুঃখ, বেদনা এমনকি ক্রুদ্ধ মন্তব্য শ্রবণ

করেন। খোলামেলা আলোচনায় তাদের নানা তীর্যক প্রশ্নের জবাব দেয়। অকুতোভয় শেখ হাসিনা যুগপৎভাবে সন্তানহারা অভিভাবক, স্নেহময়ী মা, ধীর শান্ত প্রজ্ঞাবান রাষ্ট্রনায়ক এবং সমব্যথী সহকর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জওয়ান ও ক্যান্টনমেন্টের এই দরবারটি সব অনিশ্চয়তা উত্তেজনা এবং অস্থিতিশীলতার অবসান ঘটায়। সম্ভাব্য বিপদ হতে দেশ ও জাতি রক্ষা পায়।

দ্বিতীয় মেয়াদে শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিন বছর অতিক্রম করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি আর বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন এবং করছেন। প্রাথমিকভাবে বিশ্বমন্দা মোকাবেলা করে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হলেও , ক্রনিক মন্দার অভিঘাত এখনও চলছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছেন, খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণে সাফল্য ঈর্ষণীয়। তবে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং যে ৩টি কাজ করেছেন, তা হচ্ছে , বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকর, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করে দেশকে ১৯৭২- এর মুক্তিযুদ্ধের মূলধারায় ফিরিয়ে নেয়া।

বলাবাহুল্য তার এসব কাজ মুক্তিযুদ্ধ ও সেক্যুলার গণতন্ত্র বিরোধী বিএনপি-জামাত-জঙ্গিবাদী শক্তিগুলো যে সহজে মেনে নেয়নি। সর্বশেষ গত ডিসেম্বর, ২০১১ মাসেই পরিকল্পনা করা হয় ১০ জানুয়ারি ২০১২ সেনা অভ্যুত্থানের । আগেই জানতে পারায় সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে সামরিক অভ্যুত্থানের এই ব্যর্থ চেষ্টা করে দেয়া হয়। সরকারিভাবেই গত ১৯ জানুয়ারি (২০১২) এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ও তা ব্যর্থ করে দেয়ার কথা সেনাসদরে অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক সাংবাদিক সম্মেলন করেই প্রকাশ করা হয়। এ ব্যাপারে জঙ্গি কানেকশনের কথা বলা হলেও এই অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার পেছনে আর কারা ছিল; রাজনৈতিক দলগুলো সংশ্লিষ্টতা কতদূর ছিল তদন্তের পরই তা জানা যাবে। আপাতত, শেখ হাসিনা আরেকটি ভয়ঙ্কর সঙ্কট থেকে দেশকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন, একথা বলা চলে। সরকার প্রধান হিসেবে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তার সাফল্য ও অর্জনগুলো পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। এই নিবন্ধে তার সুযোগ নেই।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে শেখ হাসিনা ইতোমধ্যেই তার একটি স্বতন্ত্র আসন করে নিয়েছেন। এই আসনটি কতটা উজ্জ্বল ও স্থায়ী হবে তা নির্ভর করছে রাষ্ট্র পরিচালনায় তার সাফল্যের ওপর।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যচর্চা

সাধারণভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে পড়াশোনা, জ্ঞানচর্চা এবং লেখালেখির তেমন কোনো ঐতিহ্য নেই। এই ঐতিহ্য রক্ষা করা গেছে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ বসু, জওহরলাল নেহেরু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতাদের মধ্যে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কারও উচ্চমানের রাজনৈতিক সাহিত্য চোখে পড়ে না। আবুল মনসুর আহমেদ ছাড়া আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যেও লেখালেখির অভ্যাস তেমন কারও ছিল না। তাজউদ্দিন আহমেদ ডায়রি লিখতেন। সে ডায়রিগুলো তখন আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের আকর উপাদান হিসেবে গণ্য।

বামপন্থী রাজনীতিবিদদের মধ্যে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠ ও অনেকেরই লেখালেখির ঐতিহ্য রয়েছে। দেশের মূলধারার রাজনীতির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম শেখ হাসিনা। দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও হাসিনা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। দেশ-বিদেশের রাজনীতি, সমাজ-অর্থনীতি এবং শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তার পড়াশোনা এবং জানা-বোঝার পরিধিটা ছোট নয়। যে কোনো বিষয়ের ডিটেইলসে যাওয়া, গভীরে যাওয়া তার একটা অসাধারণ গুণ।

রাজনৈতিক প্রস্তাব হোক, সিদ্ধান্ত হোক, কোনো কর্মসূচি হোক, গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র বা ইলেকশন ম্যানিফেস্টো হোক, কেবল আদ্যোপান্ত পাঠ নয়, হয় নিজে হাতে লেখা মার্জনা নয়তো খসড়ার মার্জিনে মন্তব্য লিখে দেয়া তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সরকারি নথিপত্রও তিনি পাঠ না করে সিদ্ধান্ত দেন না। আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের মধ্যে এ ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না।

মৌলিক গ্রন্থ রচনা ছাড়াও আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মসূচি, ঘোষণাপত্র এবং নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নেও তার রয়েছে নিয়ামক নেতৃত্বের ভূমিকা। গত দেড় দশক বিশেষভাবে লেখালেখির কাজে তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য আমাকে

সমৃদ্ধ করেছে। এ ব্যাপারে হাসিনা আমাকে দায়িত্ব দিয়ে এবং নানাভাবে সাহায্য করে, উৎসাহ দিয়ে যে সম্মান দিয়েছেন তা আমার জীবনের এক অমূল্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে। শেখ হাসিনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে/গ্রন্থে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের তিনিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, যার প্রায় ডজনখানেক বই রয়েছে এবং যিনি এখনও লিখে চলেছেন। রাজনৈতিক সাহিত্যচর্চা, লেখালেখি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার জন্য দেশের শাশ্বত সমাজে শেখ হাসিনার একটা মর্যাদার আসন রয়েছে।

দূরের মানুষ কাছের মানুষ

শুরুতেই বলেছিলাম শেখ হাসিনা সম্পর্কে 'সব কথা' বলা যাবে না। আর শেষ কথা তো নয়ই। শেখ হাসিনা অতিমানবী নন, সকল গুণে গুণান্বিতা স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবী নন। আমাদের মতোই রক্ত মাংসের মানুষ। আমাদের মতোই গাঁও-গেরামে জন্ম নেয়া লোকঐতিহ্যে ললিত চিরায়ত বাঙালি। ফলে তার মধ্যে উন্মুল এলিটিসিজম যেমন নেই, তেমনি গ্রাম বিচ্ছিন্ন নাগরিক বা কসমোপলিটান ঘরানার মনস্তত্ত্ব নেই। বলা যেতে পারে আমরা সবাই উত্তরণ প্রয়াসী দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি মধ্যবিত্ত ।

হাসিনার মধ্যে আমাদের মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্তের যাবতীয় শক্তি-দুর্বলতা কম-বেশি যেমন আছে, তেমনি আছে 'গ্রাম সংস্কৃতি'র ভালোমন্দ মিশেল বোধ, বিশ্বাস, অভ্যাস, সংস্কার, কুসংস্কার। এই সাধারণ সত্যের বাইরেও শেখ হাসিনার আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একটি রাজনৈতিক পরিবারে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারে যার জন্ম তার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের গুণাবলিতো বটেই, এমনকি তার মহীয়সী মায়ের গুণাবলির প্রভাব থাকবে, এটা স্বাভাবিক। দেশপ্রেম, সাহস, ধৈর্য, মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, উদারতা এবং জেদ বা একগুয়েমি যেমন প্রবলভাবে আছে, তেমনি আছে স্বতঃস্ফূর্ততা, সহজ-সারল্য, এবং বাক-সংযমের অভাব।

জেদ বা একগুয়েমি যেমন অনেক বড় বড় সঙ্কট মোকাবেলায় তাকে স্থির প্রত্যয়ী রেখেছে, তেমনি এই বৈশিষ্ট্যটি রাজনীতিতে প্রয়োজনীয় Flcxibility-কে খর্ব করেছে। স্বতঃস্ফূর্ততা ভালো ও মন্দ দুই-ই। স্বতঃস্ফূর্ততা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও

উৎসারিত হয় এই স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে। এগুলো ইতিবাচক দিক। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুলের কারণও হয়ে থাকে।

গড় দেড় দশক সক্রিয়ভাবে আওয়ামী লীগের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা এবং শেখ হাসিনার সহকর্মী হিসেবে কাজ করার সুবাদে তাকে আমি যেটুকু পর্যবেক্ষণ করেছি, তাকে আমার মনে হয়েছে "স্বতঃস্ফূর্ততা' ভালো ফল বয়ে আনেনি। বিশেষ করে মানুষ বিচারে বা নেতা-কর্মীদের 'যোগ্যতা' বিচারে অসতর্কতা কখনো কখনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি যখন আওয়ামী লীগে গোগদান করি তার আগে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার একাধিক একান্ত বৈঠক হয়। কথাচ্ছলে এ সময় হাসিনা আমাকে বলেছিলেন, তিনি স্তাবকতা পছন্দ করেন না। স্তাবকদের ব্যাপারে তিনি সতর্ক। আমার দেড় দশকের অভিজ্ঞতা বলছে, এ ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট সতর্ক নন। ফল হয়েছে এই যে, হাসিনাকে খুশি করতে প্রকাশ্যে যে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাকেই দেখেছি আড়ালে কুৎসিত সমালোচনা করতে। এমনও হয়েছে যে, ন্যায্য সমালোচনাও কেউ ফোরামে করতে চায় না। স্তাবক ও সুবিধাবাদীদের ভয় তো আছেই, ভয় হাসিনাকেও। হাসিনা যদি অসন্তুষ্ট হন-এই ভয়। একটা অহেতুক ভয়ের সংস্কৃতি তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে।

পরিবারের বাইরে দু'একজন ছাড়া রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে হাসিনার আস্থাভাজন বিশ্বস্ত স্থায়ী ঘনিষ্ঠ অনুসারী বেশি দিন কেউ থাকে না। একসময়ে যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বা কাছের বলে পরিগণিত হয় দেখা যায় পরবর্তী কোনো একসময়ে সে দূরে চলে গেছে। এর জন্য কে দায়ী তা আমি জানি না। তবে আমার মতো তার নেতৃত্বের প্রতি সৎ বিশ্বস্ত থেকে সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব রেখে চললে কারো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

হাসিনার মহত্ব, তার নেতৃত্বের ক্যারিশমা এবং অসাধারণ মানবিক গুনাবলি আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি। একই সঙ্গে দেখেছি, 'কানকথা'শুনে উত্তেজিত হতে, অযোগ্য লোককেও পুরস্কৃত করতে, অনাকাঙ্ক্ষিত দোষত্রুটিকে প্রশ্রয় দিতে এবং সামান্যকে অসামান্য ও অসামান্যকে তুচ্ছ করার মানবিক দুর্বলতাও। তবে সবচেয়ে বেদনাদায়ক হলো হাসিনা সম্পর্কে বঞ্চিতদের স্থূল ক্ষোভ ও আসুরিক নিন্দাবাদ।

যোগ্যতা থাক বা না থাক, ন্যায্য বা অন্যায্য যা-ই হোক সবাই দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার কাছে অথবা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পদ-পদবি, ক্ষমতা বা সুযোগ-সুবিধা চায়।

যোগ্য হলেও শেখ হাসিনার পক্ষে সবাইকে পদ-পদবি, ক্ষমতা বা সুযোগ-সুবিধা দেয়া সম্ভব নয়। যারা পদ, ক্ষমতা বা সুবিধাবঞ্চিত হলেন, তিনি বড় নেতা বা পাতি নেতা হতে পারেন, কেউই ব্যাপারটাকে সহজভাবে নেয় না। গালাগালি হতে শুরু করে স্থূল নিন্দাবাদ করতে কেউ দ্বিধা করে না। ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। আবার এমনও হয়েছে, হাসিনার সমালোচক নিন্দুক ও সুবিধাবাদী বলে পরিচিতজনকেও দেখা যাবে হঠাৎ করে পদ- পদবি-ক্ষমতা বা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে গেছেন। 'সাইকোফ্যান, বলে একটা ইংরেজি শব্দ চালু আছে। সবকালেই ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে ঘিরে একটি জী হুজুর- স্থাবক দল গড়ে ওঠে। ক্ষমতাধর ব্যক্তির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে তারা। সম্ভবত তারাই ক্ষমতাধর নেতা-নেত্রীর সব থেকে বেশি ক্ষতি করে থাকে। ক্ষমা একটা মহৎ গুণ। কিন্তু ক্ষমতা যখন অপাত্রে বর্ষিত হয় তখন তা ধরে কান্নাকাটি করলেই ক্ষমা পেয়ে গেছে অনেকে। বঙ্গবন্ধুর চেয়েও শেখ হাসিনা কাউকে ক্ষমা করে দেন এবং এমনকি পুনর্বাসিত করেন, তখন তার প্রতি অপরাধীদের আসলে কোনো ভয় থাকে না।

ঈশ্বরের মতো অসহায়

শেখ হাসিনা হচ্ছে ট্রাজেডির নায়িকা। তিনি সুখী কি-না আমি জানি না। তবে তিনি যে সারা জীবন প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে থেকেছেন, দুঃখ-যন্ত্রণা ও বেদনা যে তার সুকুমার বৃত্তিগুলোকে অহরহ ক্ষতবিক্ষত-রক্তাক্ত করেছে এবং প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত প্রাণের ঝুঁকির মধ্যে কাটাতে হচ্ছে, এটা প্রায় দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। তার দিন শুরু হয় বাবা-মা, ভাই-ভ্রাতৃবধূসহ পরিবারের ১৭ জন মৃত মানুষের মুখচ্ছবি দেখে। অতঃএব রাষ্ট্র ও রাজনীতির কুটিল-জটিল নানামুখী চাপ এবং প্রাণহীন নানা আনুষ্ঠানিকতা। অসাধারণ প্রাণশক্তি তার। প্রচণ্ড পরিশ্রমী। সবটাই দেশের জন্য, দলের জন্য মানুষের জন্য।

তার নিজের জন্য কোনো সময় নেই। তার চারপাশে মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। কিন্তু এই জনারণ্যে তিনি একা। শেখ হাসিনা হয় তো আমার সাথে

একমত হবেন না। তবে আমার ধারণা জন্মেছে, তার কোনো একান্ত বন্ধু নেই। তার চিন্তা, কর্ম এবং সাধনার অংশী হতে পারার মতো অথবা তাকে ঐ উচ্চতায় বোঝার ও সাহায্য করার মতো সক্ষম নেই কোনো অকৃত্রিম সহযোদ্ধা।

রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে তার অবস্থান। প্রতীকী অর্থে অনেকেই বলেন ঈশ্বরের পরেই সরকার প্রধানের ক্ষমতা। কিন্তু এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও একজন মানুষ যে কতটা অসহায় হতে পারেন, হাসিনা তার প্রমাণ। রক্তকরবীর রাজার মতো ক্ষমতার ফাঁদে বন্দি হাসিনার নিজস্ব কোনো আকাশ নেই। মুক্ত মানুষের মতো প্রকৃতির রূপরস সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ নেই তার। প্রসঙ্গটি শেষ করছি হাসিনাকে নিবেদিত আমার ইশ্বরের মতোই অসহায় কবিতাটি দিয়ে।

নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা তোমার আকাশে
তারা নেই, নেই মুগ্ধ কোজাগরী চাঁদ
দুরন্ত বাতাস নেই, সে তোমার
এলোমেলো করে দেবে কেশ।
নেই দুষ্টু প্রজাপতি, স্বপ্নাতুর শৈশবের
বিস্ময় ফড়িং।
নেই মুক্তি রোদেলা দুপুরে
দেখতে পাও না তুমি আলোর নাচন
শুনতে পাওনা তুমি মেঘের রাজ্য থেকে
ঝরে পড়া বৃষ্টির সিম্ফনি।

তোমার হুকুমে চলে রাষ্ট্রযন্ত্র, লেফট-রাইট
সান্ত্রী, মন্ত্রি, পাত্র-মিত্র পরিষদ
ইশারায় দামামা বাজে
সাইরেন সংকেতে থামে শিশুর ক্রন্দন।
তোমার দাক্ষিন্যে ওঠে রমিজার ঘর

মেহের আলী খুঁজে পায় নিজস্ব ঠিকানা।
এবং
যত্তোসব বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী আর স্তুতিজীবী বাস্তুঘুঘু
হতে পারে বুদ্ধিমান মৌসুমি পাখি
কেবল তোমার জন্য কেউ নেই
দিন-রাত্রি নেই, একান্ত নেই অবসর
গান নেই, স্বপ্ন নেই, আদিগন্ত
ভালোবাসা নেই।
ঈশ্বরের মতোই
তুমি ভীষণ অসহায়।

প্রত্যয় জসীম

জীবনজয়ী সর্বমঙ্গলা চিরায়ত বোন আমার...
তোমার মুখ দেখলেই-দেখি মুখ বাংলার

তোমার মুখ চিরায়ত বাঙালি নারীর মুখ : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেসার কোলকে আলোকিত করে জন্ম নেন আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সংগ্রামে তিনি সূর্যকন্যার ভূমিকা পালন করে চলেছেন। চিরায়ত বাঙালি নারীর চিত্ররূপ যেন তোমার মুখখানি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শোকাবহ দিন বুঝি নিত্য তোমার বুকের গহীনে বেদনার ঝড় তোলে। বেদনা ও শোক তোমাকে পরাভূত করতে পারে না । গণতন্ত্রহীন অবরুদ্ধ স্বদেশের মুক্তির মিছিলে যোগ দিতে সর্বহারা এক এক দুঃখিনী বোন দেশে ফিরেছিলেন ১৯৮১ সালে। পিতা, মাতা, ভাই, ভ্রাতৃবধূ সবাইকে হারিয়ে সবুজ শ্যামল বাংলায় যখন পা রাখলেন শোকে বেদনায় বাংলার সমস্ত প্রকৃতি বেদনায় কেঁদে কেঁদে বলেছিলো-পিতা হত্যার বিচার বাংলার মাটিতে একদিন হবেই। ১৭ মে ১৯৮১ তার পর শত বাধা বিপত্তি মৃত্যুভয় গ্রেনেড হামলা, মিছিলে ট্রাক তুলে দেয়া, ধর্মান্ধ জঙ্গীবাদের শত ষড়যন্ত্র সব উপেক্ষা করে তুমি দুই দুইবারের সফল প্রধানমন্ত্রী। দিনবদলের ইশতেহার নিয়ে 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নের ইস্পাত দৃঢ় প্রত্যয়ে অবিরাম ছুটে চলেছো, বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত উন্নয়নের আধুনিক চিন্তা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ' গড়ার স্বপ্ন আজ বাস্তবায়ন হচ্ছে। তোমার দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব অচিরেই বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বিশ্বের বুকে।

শান্তি কন্যা তুমি : ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার' এমন বহু পুরস্কার বিশ্বের বহু নামী দামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারেবল ডিগ্রি পেয়েছেন শেখ হাসিনা। মনে পড়ে ২০১০ সালের ১২ জানুয়ারি ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল-ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার মুজিব কন্যার হাতে যখন তুলে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন- 'গণতন্ত্র

ও শান্তির জন্য শেখ হাসিনার অনন্য অবদানের কথা ভারতবর্ষের মানুষ ভালোভাবেই জানেন। বঙ্গবন্ধুও 'জুলিওকুরি' শান্তি পদক পেয়েছিলেন। কি মিল পিতা কন্যার মাঝে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে যখন জিয়া এরশাদ এবং সামরিকজাত বিএনপি'র শাসনামলে পাহাড়ে পাহাড়ে রক্তের ঝরণা বইতো নিত্য, ঘুনে ঘুনে পাহাড়ের সবুজ পাতাগুলো হয়ে যেতো রক্তলাল- সেইসব দুঃসহ সময়কে কবর দিয়ে তুমি...শান্তি কন্যা শেখ হাসিনা। 'পার্বত্য শান্তি চুক্তি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দীর্ঘ অশান্তি, সংঘাত ও সন্ত্রাসের ইতি ঘটে। শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তা ও প্রজ্ঞাবান মননের সফল ছিলো এ চুক্তি। অশান্ত পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশের মূলভূখণ্ড থেকে বলতে গেলে আলাদা হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলো। পাহাড়ী জনপদ অশান্ত হয়ে উঠেছিলো। পার্বত্য অঞ্চলের অশান্তির আগুন চিরতরে নিভিয়ে দিলেন শান্তিকন্যা শেখ হাসিনা।

ভাষাকন্যা তুমি : অমর একুশে আজ বিশ্বজনের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির রক্তদান বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল ঘটনা। বাঙালির এই বলিদান বৃথা যায়নি। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যথাযথ কার্যকর উদ্যোগ ও তৎপরতার কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজনীন সম্মান পেল। বাঙালির লাল সবুজের পতাকা আজ বিশ্বের দেশে দেশে উড্ডীন হবে হিরন্ময় অহংকারে বাঙালির এই ভাষাবিজয় যাঁর কল্যাণে হয়েছে তিনি আর কেউ নয় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার ভাষাকন্যা শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁরই কন্যা বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বাঙালির একুশ'কে প্রতিষ্ঠিত করে আরো একবার বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে সুমহান উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। আর এ জন্যেই যর্থাথ অর্থেই তিনি আমাদের ভাষা কন্যা।

সমুদ্র জয়ের স্বপ্ন সারথী তুমি : বঙ্গবন্ধু দিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ, তাঁরই কন্যার সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা পেলাম ২০০ নটিক্যাল মাইল সুদীর্ঘ সমুদ্র এলাকা। ২০১২ সালের ১৪ মার্চ স্বাধীনতার মাসে জার্মানির হামবুর্গে সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্রুনাল (ইটল্স) এর ঐতিহাসিক রাং দীর্ঘ

৩৮ বছরের বিরোধের অবসান ঘটিয়ে বিশাল সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত হলো। এ ছাড়া এ রায়ের ফলে বঙ্গোপসাগরের জলরাশি এবং তলদেশের বিপুল সম্পদ রাজিতে বিশেষ করে তেল গ্যাসসহ সামুদ্রিক সম্পদের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্র সীমা মামলায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিজয়ের মূল কারিগর সমুদ্রকন্যা শেখ হাসিনা। তাঁর তড়িৎ ও দ্রুত সিদ্ধান্তের ফলেই ৩৮ বছরের বিরোধের অবসান হয়ে আমাদের বিজয় সূচিত হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের বিপুল মৎস্য সম্পদ, তেল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ, উত্তোলন এবং ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনজয়ী বিশ্বনেত্রীর সঙ্গী ধৈর্য ও সাহস : বিশ্ববিখ্যাত সাময়িকী টাইম ম্যাগাজিন ২০১০ সালের ২৩ আগস্ট তাদের অনলাইন জরিপে বিশ্বের সেরা দল নারী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর তালিকায় ছয় নম্বর অবস্থানে আছেন। বিশ্বের শীর্ষ দশ নারী নেত্রীর একজন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এর ফলে বিশ্বনেত্রী হিসেবে অভিষিক্ত হলেন বাংলার মুক্তিকামী প্রগতিশীল গণমানুষের নেত্রী সময়ের সাহসী নারী ডটার অব পিস রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রামে মিছিলে ট্রাক তুলে দিয়েছিলো সামরিক শাসকের লেলিয়ে দেয়া খুনিরা, সেখানেও নির্ভয়ে নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। ২০০৪ এর ২১ আগস্ট শেখ হাসিনার সমাবেশে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে গ্রেনেড হামলা চালায় খালেদা-নিজামীর সাঙ্গাতেরা। আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধু কন্যা। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমান সহ বাইশ জন নেতাকর্মী সেদিন প্রাণ হারান। তিন শতাধিক নেতাকর্মী আজও পঙ্গু জীবনের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে আছেন। চোখের সামনে পলকে অসংখ্য নেতা কর্মীর প্রাণ বিসর্জনের ঘটনায় ধৈর্য হারান নি শেখ হাসিনা। খালেদার সেই জঙ্গী-সঙ্গী জামাতের নেতাদের যুদ্ধাপরাধের বিচার চলছে। অচিরেই তাদের সাজা হবে।

সাহিত্যিক সর্বমঙ্গলা তুমি : রাজনীতি ও রাষ্ট্রকর্মের বাইরেও অন্য এক শেখ হাসিনাকে আমরা চিনি। যিনি বাঙালির চিরচেনা আদর্শ জননী.. জায়া..

ভগিনী। দেশকে ভালোবেসে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাষা সাহিত্যের কৃতি ছাত্রী, সময় পেলেই তিনি সাহিত্য রচনা এবং সম্পাদনার মতো কঠিন কাজেও মনোনিবেশ করেন। 'স্মৃতির দখিন দুয়ার' মনোরম ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় এ শিরোনামের লেখাটি তিনি লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখাগুলো হলো, 'বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা', 'সহেনা মানবতার অবমাননা', 'ওরা টোকাই কেন', 'বাংলাদেশের স্বৈরতন্ত্রের জন্ম', 'সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র', 'দারিদ্র্য দূরীকরণঃ কিছু চিন্তা-ভাবনা', 'বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন,' আমার স্বপ্ন, আমার সংগ্রাম'। এইসব লেখায় বিশেষভাবে ধরা দিয়েছে, এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি এবং গণমানুষের জীবনচেতনা সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গী ও জীবনবীক্ষা। একটি সুখী সমৃদ্ধ উন্নত আধুনিক ডিজিটার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছে।

দিনবদলের ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং 'ভিশন-২০২১' কার্যকর করতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বিকল্প বাংলাদেশকে বহুদূর নিয়ে যেতে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি আজ।

ফরিদ আহমদ দুলাল

জননেত্রী শেখ হাসিনা : বাঙালির নিজস্ব সংগ্রাম

আজকের এই মিডিয়া-প্রবল সময়ে সবকিছুই যেন নিয়ন্ত্রণ করে মিডিয়া। আর মিডিয়ার যে কোনো মাধ্যমেই জনপ্রিয় করে তুলতে কে কতো উত্তেজনা ছড়াতে পারে সেই প্রতিযোগে উদ্বিগ্ন থাকতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী থেকে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, সিইসি থেকে ডিসি-এসপি, দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে মানবাধিকার কমিশন, আমলা থেকে এনজিও সবাইকে। মিডিয়ার এই দৌদণ্ড প্রতাপের আতিশয্যে যে কেউ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাই যখন তখন। মিডিয়ার তাণ্ডব খোদ সরকার প্রধানকেও ছাড় দেয় না। কোনো কোনো সময় মিডিয়াও সীমা ছাড়িয়ে যায়। যদিও মিডিয়ারও দায়বদ্ধতা আছে, আর সভ্য পৃথিবীতে মিডিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণই হওয়া উচিৎ তার প্রধান শৃঙ্খলা। মিডিয়া আজকের আলোচ্য বিষয় নয়, আলোচ্য প্রসঙ্গ জননেত্রী শেখ হাসিনা, যাঁকে আমরা প্রধানত চিনি মিডিয়ার কল্যাণে। তাই আলোচনার শুরুতেই কিছুটা মিডিয়া বন্ধনা করে নেয়া। বাংলার জননন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনাকে কেবল একজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করলে চরম ভুল করা হবে। শেখ হাসিনার নামের সাথে সম্পৃক্ত আমাদের অহংকার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর নাম। সঙ্গত কারণেই জননেত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে লিখতে বসে দ্বিধায় পড়তে হয়। শেখ হাসিনা তো বঙ্গবন্ধু-কন্যার পাশাপাশি সরকারের নির্বাহী প্রধান-প্রধানমন্ত্রী। গোটা বিশ্ব যখন মন্দার ঝাপটায় বিপর্যস্তপ্রায়, তেমন দুঃসময়ে দারিদ্র-পীড়িত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মন রক্ষা করে চলা-চাহিদা পূরণ করে চলা সহজ কথা নয়; তারও উপরে আছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রকারীদের নিত্য-অপতৎপরতা। ষড়যন্ত্রীদের প্রসঙ্গ তুলতেই কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন' ৭১ প্রসঙ্গ আর কত টানবেন? কিন্তু বাংলাদেশের সচেতন জনগণকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, একটু ভেবে-চিন্তে বলুন- ৭১ এর পরাজিত শক্তি এই বাংলাদেশের মাটিতে কবে নিস্ক্রিয় থেকেছে? প্রথমত তারা বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে; পরবর্তীতে যখন তারা বুঝেছে 'সে গুড়ে বালি' তখন তারা ভিন্ন পথ ধরেছে। তাদের

সেই সব ঘৃণ্য প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর মতো বিশ্বনন্দিত নেতার সপরিবারে জীবনোৎসর্গের ঘটনা, দেখেছি স্বাধীনতা-বিরোধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন; শাহ আজিজ, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, মির্জা হাফিজ, আব্দুল আলীম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহম্মদ মুজাহিদসহ অসংখ্য চিহ্নিত দুর্বৃত্তদের গাড়িতে দেখেছি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মতো সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান, দেখেছি সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার অপচেষ্টা, দেখেছি ২১ শে আগস্ট-এর মতো নৃসংশতা, বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষের আয়োজনে দেখেছি বর্বর বোমা হামলা, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচীর জাতীয় সম্মেলনে বোমা হামলার মতো পৈশাচিকতাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ষড়যন্ত্রকারীদের বদৌলতে।

একদিকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যের মতো নিঃশব্দ শত্রু, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণবাদ-চক্র; একদিকে স্বাধীনতা বিরোধী-চক্র, অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী-চক্রের ক্ষমতার লোভ; একদিকে মুক্ত-বাণিজ্যের প্রবল প্রবাহ-উচ্চাভিলাষী শিক্ষিত শ্রেণীর সব পাবার মোহ, অন্যদিকে নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দাঁড়াবার প্রয়াশ, অন্যদিকে যে কোনো কর্মসূচিকেই বাতিল করে দেবার প্রবল প্রচারণা; এতোসব ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সাহস নিয়ে এগিয়ে যাবার নাম শেখ হাসিনা। কোথায় পেলেন তিনি সে সাহস? প্রথমত তিনি বঙ্গবন্ধুর মতো সাহসী পিতার সন্তান-বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার এবং শেষতক তিনি স্বজনহারা এক বঙ্গনারী, যিনি তাঁর বাবা-মা-ভাই- আত্মীয়-পরিজন সবাইকে হারিয়ে পেয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা, যে বাঙালি জাতির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর স্বজনদের মুখ। আকাশের মতো বিশাল-হৃদয় পিতা যিনি উচ্চারণ করেন 'আমার প্রথম চিন্তা আমার দেশেরজন্য। আমার আত্মীয়-স্বজনদের চাইতেও আমার ভালোবাসা আমার দেশেরই জন্য। আপনি তো দেখেছেন। আমাকে তারা কী গভীরভাবে ভালোবাসে।' (বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, যা ১৮ই জানুয়ারি' ৭২ নিউইয়র্কের টেলিভিশনে 'ডেভিড ফ্রস্ট শো' নামে প্রচারিত হয়। সেখানে তিনি এ কথা বলেন) সেই পিতার সন্তান হয়ে শেখ হাসিনা বাংলার মানুষকে ভালো না

বেসে পারেন না। বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে তাঁর কাছে হয়তো আমাদের অনেক প্রত্যাশা, কিন্তু আমাদের প্রত্যাশার পাশাপাশি যদি আমাদের হৃদয়ে সামান্য বিবেচনাবোধ থাকে এবং শেখ হাসিনা যাদের বিশ্বাস করে তাদের উপর আস্থা স্থাপন করেন, তারা যদি তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা দেন, তাহলে সমীকরণটি খুবই সহজ হয়ে যায়; কিন্তু তা তো হবার নয় কিছুতেই সঙ্গত কারণেই ঘটে যায় বিপর্যয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামল যে কোনো বিবেচনার উর্দ্ধে: ১৯৭৫-এর পর আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-আর্থসামাজিক অবস্থা-জনজীবন সব মিলিয়ে শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে যে সময়টিকে চিহ্নিত করতে পারি সেটি ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনামল। তাঁর সে সময়কালে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছিলো, দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে ছিলো, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিলো; সব মিলিয়ে বেশ সুসময়ে কেটেছে আমাদের প্রতিটি দিন; কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনে ভালো ফল আসেনি। নির্বাচন উত্তরকালে শেখ হাসিনা বলেছিলেন 'নির্বাচনে সুক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে।' জাতির অনেক মেধাবী লোককে দেখেছি, শেখ হাসিনার সেই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। আমি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ নই-রাজনৈতিক রচনা লিখতেও অভ্যস্ত নই; সাধারণভাবে আমি মোটা দাগে বিষয় বিশ্লেষণ করে থাকি, আমি ধারণা করি জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যত বক্তব্য দিয়েছেন তার মধ্যে সেদিনের সেই বক্তব্যটি সবচেয়ে মেধাদীপ্ত। সেদিনের সেই পরিস্থিতিতে এরচেয়ে খোলাশা করে বলার সুযোগ ছিলো না, আবার এরচেয়ে সত্যভাষণও কিছু হতে পারতো না। আমি তাঁর কাছে এমন মেধাবী বক্তব্যই প্রত্যাশা করে থাকি।

একজন রাষ্ট্রনায়কের কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ কাজটি করা উচিত আমি বলতে পারি না; এমন কী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোথায় কোন উদ্যোগটি নেয়া আবশ্যক সব সময় হয়তো বুঝে উঠতে পারি না কিন্তু একজন সচেতন সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে বুঝতে চাই-বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে, বাংলাদেশের মানুষ বেড়ে উঠবে নিজস্ব সংস্কৃতি-কৃষ্টি আর নিজেদের ঐতিহ্যকে ধারণ করে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ হবে, জাতিকে স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে; পাশাপাশি বাংলাদেশের মাটি-বাংলার প্রকৃতি বাংলার সুর ভালোবেসে অন্তরে ধারণ করবে প্রতিটি বাঙালি; লোকবাংলার

সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়ে উঠবে প্রতিটি বাঙালি, সে পরিবেশ এবং সে আয়োজন তার সামনে তুলে ধরতে হবে। সৃষ্টিশীলতার প্রতিটি শাখায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে আগামী দিনের দেশপ্রেমিক জাতি তৈরি করতে। আপাত অনুৎপাদনশীল সংস্কৃতি খাতে ব্যয় বরদ্দ করা হলে অনেকেই হয়তো আপত্তি তুলবেন, বিশেষকরে ধর্মান্ধগোষ্ঠী, স্বাধীনতা-বিরোধীচক্র এবং তাদের পোষ্য বুদ্ধিজীবীরা তো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে আদাজল খেয়ে লাগবেন সংস্কৃতি বিকাশ-কার্যক্রমের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে কোনো মূল্যে বাঙালির ঐতিহ্য-বাঙালির কৃষ্টি-বাঙালির সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করতে পারলেই জাতি বেড়ে উঠবে সঠিক দিক নির্দেশনায় এবং আমার বিশ্বাস, যদি কোনো বাঙালি রাষ্ট্রনায়ক এমন সাহসী উদ্যোগ গ্রহণের স্পর্ধা দেখাতে পারেন তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলার প্রতিটি জনপদে যদি সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধন করা যায় তাহলে শুধু মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিতই হবে না যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তারাও নিজেদের নিয়ন্ত্রণের পথ খুঁজে নেবার সুযোগ পাবে। জননেত্রী শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১-এর শাসনামল এবং ২০০৯-২০১২-এর শাসনামলের মৌলিক পার্থক্য নিজের দলের উপর নিয়ন্ত্রণের ফারাক। আমি ধারণা করি জাতিকে সংস্কৃতমান করে তোলা গেলে নিয়ন্ত্রণের কাজটি অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। আর সংস্কৃতিকর্মীরা যখন ছড়িয়ে পড়বে মাঠে-ময়দানে, তারাই নিয়ন্ত্রণ করবেন ষড়যন্ত্রকারীদের; হয়তো অসুস্থ রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে নয়, বাঙালির ঔদার্য- সহমর্মীতা-আতিথেয়তার মন্ত্রে পোষ মানাবেন। আর যারা অসুস্থ রাজনীতির চর্চা করেন, তরুণ সমাজের মধ্যে অসুস্থতা ছড়িয়ে দেন, তাদের মিথ্যা মোহের পেছনে ঘোরার জন্য তরুণ প্রজন্মের কাউকে আর খুঁজে পাবেন না তারা।

বাঙালি জাতির প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে সংস্কৃতজন হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই আমাদের মুক্তি। আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রতিটি কর্মী যদি সংস্কৃতি সচেতন হয়ে ওঠেন-প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মী যদি লোকজীবনের আনন্দ-বেদনার খোঁজ রাখেন- প্রত্যেকেই যদি বঙ্গবন্ধুর মতো অকৃত্রিম ভালোবাসতে পারেন প্রতিটি বঙ্গসন্তানকে, তাহলে প্রত্যেকের মধ্যে জাগ্রত হবে দেশপ্রেম ভ্রাতৃত্ববোধ-পরমতসহিষ্ণুতা-ঔদার্য-সহনশীলতা। আমাদের রাজনৈতিক কর্মীরা যদি অন্তর দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসতে পারেন-বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে

পারেন, তাহলেই বাঙালির জীবনে মুক্তি আসা সম্ভব। আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একজন মানুষের কাছে কখনোই দেশের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে না। এসব আবেগস্পর্শী ভালোবাসার কথা জননেত্রী শেখ হাসিনা বেশ ভালোই জানেন, কেন না আমার ধারণা বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসুরী হিসেবে তিনি পিতার যে গুণগুলোকে উত্তরাধিকার হিসেবে অর্জন করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে আবেগ, দেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ, সাহস, সততা এবং মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। যে কারণে আমি এবং আমরাও তাঁকে ভালোবাসি-শ্রদ্ধা করি। আমরা তাঁর দলের কর্মী না হয়েও তাঁর মঙ্গল ও সাফল্য কামনায় একাত্ম হই। আমাদের বুকে স্বপ্ন জাগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, সেই স্বপ্ন হাতের মুঠোয় পাবার পথে তিনি এগিয়েও যাচ্ছিলেন। সেই স্বপ্নের পথের পদযাত্রায় বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে আমরা দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম; জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার অঙ্গিকার জানিয়ে আমাদের বুকের ভাঙা স্বপ্নকে শুশ্রূষা দিয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন; তাঁর পিতাকে তো আমরা বাঙালি জাতি অন্তর থেকে পিতা বলে স্বীকার করেছি। সঙ্গত কারণেই তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা থেকেই যায়।

সাম্প্রতিক একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে দু'টি কথা নিবেদন করতে চাই। বাংলাদেশের মিডিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে 'পদ্মাসেতু' নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। সে আলোচনার কথা সবই পাঠক জানেন। বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির কথা বলে পদ্মাসেতুর জন্য ঋণবরাদ্দ প্রত্যাহার করেছে। আর বাংলাদেশ সরকার বলছে কোনো দুর্নীতি হয়নি। তারপরও বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপত্র হিসাবে মন্ত্রী এবং আমলা সরানো হয়েছে।

এবং বিশ্বব্যাংককে সন্তুষ্ট করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। রাজনৈতিকভাবে যারা সরকার বিরোধি তারা তো সারাক্ষণ সরকার বিরোধি বক্তব্য দিয়েই যাচ্ছেন; কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী নিয়মিত বিশ্বব্যাংকের পক্ষে কথা বলছেন এবং সরকারের সমালোচনা করে যাচ্ছেন। এর মাঝে জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ হবে'। তাঁর কথাতেও বিরোধিদল এবং বিরোধিরা দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছেন। যে যাই বলুক বঙ্গবন্ধুকন্যা কিন্তু বলেই যাচ্ছেন নিজস্ব অর্থায়নের কথা। কোহিনুর সুলতানা শিউলী নামের জনৈক পাঠক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক 'টক-শো'-এর বিশিষ্ট 'টকার' আসিফ নজরুলের পদ্মাসেতু বিষয়ক সরকার বিরোধি একটি লেখা পড়ে প্রথম আলো পত্রিকায় একটি প্রতিক্রিয়া

জানিয়েছিলেন। যেখানে তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যার প্রশংসা করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করে দেশের সম্মান বাঁচানোর আহবান জানিয়েছেন। শিউলী ১৯৫৬ সালে সুয়েজখাল জাতীয়করণ এবং আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের পিছিয়ে যাবার স্মৃতি বর্ণনা করেছেন এবং মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের-এর জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রশংসা করেছেন। আমি বিশ্বাস করি জননেত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে আমাদের পদ্মাসেতু যদি নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি করা হয় তবে নিশ্চয়ই জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবো এবং শেখ হাসিনার পক্ষেই এ অসাধ্য সাধন সম্ভব। জননেত্রী শেখ হাসিনার ছিষট্টিতম জন্মবার্ষিকীতে বাঙালি জাতি তাঁকে অভিনন্দন জানাতে নিজেদের অর্থে পদ্মাসেতু নির্মাণের অঙ্গিকার করতে পারে এবং আমার বিশ্বাস আমাদের অঙ্গিকারই হতে পারে ছিষট্টিতম জন্মবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুকন্যার জন্য জাতির শ্রেষ্ঠ উপহার। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করে আমরা বিশ্বব্যাংকের আধিপত্যবাদী চারিত্রের বিপক্ষে প্রতিবাদ জানাতে পারি এবং আমরা যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি, আমরা যে বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তর সুরি তা প্রমাণ করতে পারি।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনকে সামনে রেখে আমরা নতুন করে আশায় বুক বাঁধি। আমরা বিশ্বাস করি শেখ হাসিনা সুস্থ-সবল-কর্মক্ষম থাকবেন এবং বাঙালি জাতিকে কেবল মধ্যম আয়ের একটি দেশের নাগরিক নয়, পাশাপাশি সংস্কৃতমান জাতি হিসেবেও গড়ে তোলায় ব্রতী হবেন। আগামী বছর বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে সুস্থ-সংস্কৃতি চর্চার প্রবল প্রবাহ প্রত্যক্ষ করবো আমরা এবং সেই প্রবাহের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকবেন বাঙলার পরীক্ষিত সংস্কৃতি কর্মীরা। বাঙালির নিজস্ব সংগ্রামের অগ্রনায়ক হিসেবে আমাদের মুক্তির আন্দোলন এবং আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা হবেন আমাদের দিশারী।

মমতাজ উদদীন আহমদ

যাঁর কোনো বিকল্প নেই

শেখ হাসিনার জন্মদিন ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু সবদিক যোগ করে ৪৭ বছর পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। বারদুয়েক তাঁকে রাজনীতির অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলানোর আয়োজন হয়েছিল। তেরো বছর কারাগারে ছিলেন। মাত্র সাড়ে তিন বছর বাংলার প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি থাকার পর দেশি-বিদেশি চক্রান্ত তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেছে। '৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে শেখ হাসিনা অন্যতম ছাত্রনেত্রী। আগরতলা মামলার প্রহসন দেখেছেন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে গিয়ে।

১৯৭৫ সালে হাসু আর ওয়াজেদ গেলেন জার্মানিতে। উচ্চশিক্ষার জন্য ওয়াজেদের যাওয়া। তাদের সঙ্গে গেল বোন শেখ রেহানা। এ যাওয়াটা ভালো হলো কি মন্দ হলো! ভবিষ্যৎ জানে না। কিন্তু দরিদ্র দেশের তাঁবেদার বড় শক্তিরা জানে! সেনা কুলাঙ্গাররা জানে, নাকি ক্ষমতালোভীরা জানে, নিয়তি জানে, না কর্মফলে জানে? ১৫ আগস্ট ১৯৭৫। ৩২ নম্বরে, ৬৬৭ নম্বর বাড়িতে তখন মৃত্যুর মহারোল।

বেঁচে রইল জার্মানিতে শেখ হাসিনা, জয়, শেখ রেহানা আর ড. ওয়াজেদ মিয়া।

১৯৮১ সালের ১৭ মে ছয় বছরের অনিচ্ছার নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে শেখ হাসিনা নামলেন ঢাকা বিমানবন্দরে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সর্বজনস্বীকৃত সভাপতি শেখ হাসিনা ফিরে এলেন সব হারানোর মাতৃভূমি প্রিয় বাংলাদেশে। বাংলার দশ লাখ আবেগে উত্তাল মানুষ বাংলার নেত্রী শেখ হাসিনাকে বরণ করার জন্য সারাপথে ভালোবাসা, বিশ্বাস ও মুক্তির স্বপ্ন বিছিয়ে দিল। বাংলাদেশ জিন্দাবাদের জায়গায় আবার একাত্তরের জয় বাংলা আকাশ- প্রকৃতি ভেদ করে প্রকম্পিত উচ্চারিত হলো। মুক্তিযুদ্ধের সরব জীবন পুনরায় ফিরে এলো। '৭২- এ জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু নয় মাস পরে যেমন ফিরে এলেন সবদিক ছিন্নভিন্ন, সবখানে ছাইভস্ম, লুটপাটে শূন্য বাংলাদেশে। ভাঙা, পোড়া, ছেঁড়াফাটা বাংলাদেশকে সাজালেন।

সময় পেলেন না বলে বঙ্গবন্ধু শুরু করা কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। তারই স্নেহে-আবেগে-বিশ্বাসে বাঙালি হৃদয় বেদনা ও যন্ত্রণায় থরথর কন্যা কি তা পারবেন? কিন্তু তার যাত্রাপথে কোনো না নেই। কিছুতে না গণ্য হবে না। হাসিনাকে হ্যাঁ করতেই হবে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে শস্যে, বিদ্যুতে, খাদ্যে, বাণিজ্যে, আইনে, বিচারের সর্বত্র হ্যাঁ হতে হবে। অন্যথা কিছু হওয়ার সুযোগ নেই। কিছুতে পরাজয়ের বিষাদ আর নিজের সীমাহীন বিষাদে মিশিয়ে পিছপা হওয়ার পথ নেই, কেবল অগ্রযাত্রা। এখন আবেগের অবকাশ নেই।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। বিশ্বমান বিচার প্রক্রিয়াকে বানচাল করার জন্য ওরা মাঠে নেমেছে। বিশ্বের নজরে একটা উন্নয়নশীল দেশের অগ্রযাত্রাকে স্থবির করার পুরনো ষড়যন্ত্র। বিদেশি মাতবররা নানা অজুহাতে ছয়-নয় করে বাংলাকে পুনরায় ভাঙা বাস্কেটে চিহ্নিত করতে চায়। বঙ্গোপসাগরে বাংলার অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পর বিশ্বগ্রাসী মহাশক্তি তার মতলবের মোচে তা ঘোরাতে লেগেছে। সময়টা বড় জটিল। দেশের নৈরাজ্য আর অসৎ বণিকের সীমাহীন লোভ ও লুটপাট।

এখন বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন। এখন দুঃখ, অভিমান, বিষাদ ও তৃষ্ণার সময় নয়। এখন ধীরতা, দূরদৃষ্টিসম্পন্নতার প্রয়োজন। রাজনীতির সার্বক্ষণিক আবহ আর মৃত্যুর ধোঁয়ার মধ্যে বারবার বাস করে শেখ হাসিনাকেই অন্ধকার আর বিষের ধোঁয়া অতিক্রম করতে হবে।

এখন বিশ্বসভায় শেখ হাসিনা আর অপরিচিতা নন। দেশের ১৫ কোটি মানব-মানবী যেমন তাঁর সাফল্যের জন্য উদগ্রীব, বিশ্বের বিভিন্ন ফোরামও তেমনি হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বের প্রতি উন্মুখ। হাসিনা এখন কেবল বাংলার নন, তিনি বর্তমান বিশ্বের জন্য আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ।

এবারের প্রধানমন্ত্রিত্ব নেওয়ার পর তিনি তিনবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। এ বছর (২০১২) তিনটি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে একটি মহৎ ইচ্ছা বারবার ফুটে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তিনি। নারীর সমঅধিকারের পক্ষে তিনি। বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষে তিনি। দারিদ্র্য বিমোচন এবং সর্বোপরি 'কালচার অব পিসের ' পক্ষে অগ্রযাত্রায় বাংলার প্রধানমন্ত্রীর অতীব আগ্রহী।

এসব ছাড়াও তিনি জাতিসংঘ সদর দফতরে রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাঙলার অধিকার অর্জনকে আরও উজ্বল করার জন্য দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

মনে পড়ে, ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ ভাষা বাংলায় দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন : আমরা সংগ্রাম ও যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি। আমরা দরিদ্র হতে পারি কিন্তু মরবো না।

এমনি দৃঢ় দিপ্ত কণ্ঠে দক্ষিণ আফ্রিকার মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন-'স্বাধীনতার জন্য আমাদের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য। আমাদের যাত্রাপথে কোনো শঙ্কাকে তোয়াক্কা করি না।'

৬৫ বছরের প্রবীণা অথচ শক্তি ও দীপ্তিতে চির নবীন শেখ হাসিনাও প্রদীপ্ত কণ্ঠে বারবার বলেছেন: 'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমরা জয়ী হবো।'

দেশরত্ন নির্ভীক শেখ হাসিনার যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় । ছিলও না। সবকিছু হারিয়ে তিনি দেশকে পেয়েছেন। বাংলাদেশকে নিজের জননী ভেবেছেন। বারবার বলেন, 'আমার পিতা দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন আমার মা জীবন দিয়েছে, আমার ভাইয়েরা লাশ হয়েছে, প্রয়োজনে আমিও রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। মৃত্যু বারবার আমার দিকে ছুটে এসেছে। আমার মৃত্যুর জন্য যারা সদা তৎপর তাদের আমি চিনি। তাদের কার্যকলাপ আমার জানা আছে। কিন্তু মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত্র করা যাবে না। আমি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর সমান অধিকার অর্জনের জন্য এবং দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য কাজ করে যাব । কেউ আমাকে রোধ করতে পারবে না।'

নিশ্চিত নিরপেক্ষভাবে ভাবনা নিয়ে অবিচল সত্যের জন্য বারবার বলি, বাংলার স্বাধীনতার জন্য, বাংলার উন্নয়নের জন্য এবং বিশ্বের কাছে বাংলাকে স্বরূপে উদ্ভাসিত করার জন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলি, এখন বাংলাতে হাসিনার কোনো বিকল্প নেই।

সমুদ্রের অধিকার সংরক্ষণ, উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন, বিদ্যুৎ শক্তি বৃদ্ধির জন্য, শিক্ষার জন্য, উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য এবং আরও শত প্রয়োজনের জন্য, সর্বোপরি বাংলার স্বাধীনতার গান সমস্বরে গাইবার জন্য শেখ হাসিনার বিকল্প নেই। তাঁর একটা সামান্য ভুল আর বিচলিত হওয়ার কারণে অনেক

বড় ক্ষতি হয়ে যাবে বাংলার। বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে বাংলার যা ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়েও মেলা বেশি সর্বনাশ হবে বাংলার। জাতিসংঘের ৬৭তম সাধারণ অধিবেশনে শেখ হাসিনার আগমনকে সংবর্ধনা জানাই। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংযোগস্থ জাতিসংঘের শান্তির জন্য সংস্কৃতি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জয়জয়কার ঘোষণা করি। আর যুদ্ধ চাই না। বাঁচতে চাই, শান্তির মনোরম বাগিচায় সমঅধিকার ও সম্মান নিয়ে সাতশ' কোটি নরনারীর সঙ্গে আমরাও বেঁচে থাকতে চাই।

মিজানুর রহমান খান
অনন্য সাধারণ সীমান্তজয়ী

ডটার অব দি ইস্ট নামে পাকিস্তানের প্রয়াত নেত্রী বেনজির ভুট্টোর একটি বই আছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য উপযুক্ত বিশ্লেষণ কী হতে পারে? ডটার অব বর্ডারস। কারণ, তিনি নিশ্চিতভাবেই এক অনন্য সাধারণ সীমান্তজয়ী। কারণ, তাঁর প্রথম মেয়াদে মিয়ানমারের সঙ্গে স্থলসীমান্ত চুক্তির পূর্ণতা পায়। ভারতের মতো বর্মি পার্লামেন্টও স্থলসীমান্ত চুক্তি অনুসমর্থন করেছিল।

শেখ হাসিনা এই পর্বে ক্ষমতায় এসে ভারত ও মিয়ানমার উভয়কে বুদ্ধিদীপ্ত কূটনীতিতে বিহ্বল করে দিয়ে জাতির জন্য অবিস্মরণীয় সমুদ্রজয় এনে দিয়েছেন। এরপর ভারতের সঙ্গে স্থলসীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনটাও সম্পন্ন করলেন। তাই আজ গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের ঘাটতি এক পাশে সরিয়ে রেখে কেবল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করব। সহস্র কণ্ঠে তাঁকে অভিবাদন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিবাদন। বিরোধী দলের নেতা সোনিয়া গান্ধীকেও অভিবাদন। অভিবাদন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকেও, রাষ্ট্রের এই গৌরবে অংশগ্রহণের জন্য। ভারতকে ধন্যবাদ জানাতে তিনি বিলম্ব করেননি।

অবশ্য এটাও বলতে হবে, সীমান্ত নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার যে নীতি নিয়েছিল, তা মোটামুটি সবগুলো সরকার সমর্থন করেছে। ভারতীয় বিলের প্রস্তাবনায় চুয়াত্তরের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি ও ২০১১ সালের প্রটোকল ছাড়াও ১৯৮২ ও ১৯৯২ সালের সীমান্ত চুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। জেনারেল এরশাদ ও খালেদা জিয়ার আমলেও স্থলসীমান্তে অগ্রগতি ঘটেছিল। তবে সমুদ্র জয়ে শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শিতা নিরঙ্কুশ, এটা তাঁর অমলিন কীর্তি হয়ে থাকবে।

আশা করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসন্ন সফরটি একটি সর্বদলীয় আবহে সম্পন্ন হবে। সেখানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও ২০-দলীয় মোর্চার নেতারা মোদির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন। এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন দল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারবে। জাতীয় স্বার্থে আমাদের ভারতবিরোধিতার পাকিস্তানি মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

কেবল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের জন্য নয়, নরেন্দ্র মোদি বিশ্ববাসীর কাছে একটি শান্তির বার্তা পৌছে দিয়েছে। দক্ষিণ চীন সমুদ্রকে ঘিরে চীনের সঙ্গে জাপান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনের সম্পর্ক যখন খাবি খাচ্ছে, ভারত নিজেও ভূখণ্ডগত বিরোধে পীড়িত, তখন বাংলাদেশ-বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে ভূখণ্ডগত বিরোধমুক্ত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করল নতুন ইতিহাস। এবং আবারও কী আশ্চর্য সবার অলক্ষ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদনির্ভর দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হলো। কারণ, ভারত তার বৃহৎ প্রতিবেশী চীন ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ছাড়াও নেপালের সঙ্গে ভূখণ্ডগত বিরোধ মেটাতে পারেনি। ইরাক-ইরান সীমান্ত নিয়েই দশক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছে। কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ভূখণ্ডগত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হলো। আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। আসাম ভাগ নিয়ে বাড়তি জটিলতার শিকড় কিন্তু ইতিহাসেই। সিলেট ভাগ নিয়েই গণভোট করতে হয়েছিল। আজ আমরা যে সীমান্ত পেলাম, সেটা ঠিক করার কারিগর ছিলেন স্যার সিরিল রেডক্লিফের নেতৃত্বাধীন বাউন্ডারি কমিশনের পাঁচ সদস্য। পরে সুইডেন সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি অ্যালগট ব্যাগি, মাদ্রাজ ও ঢাকা হাইকোর্টের দুই বিচারকের সমন্বয়ে করা একটি ট্রাইব্যুনালও কঠোর পরিশ্রম করেছে। আমরা কেবল লাল কালিতে দাগ টেনে সীন্তরেখা আঁকিয়ে রেডক্লিফের কথাই জানি, অ্যালগট ব্যাগিও আমাদের সীমান্তরেখা টেনেছিলেন। এটা ব্যাগি লাইন হিসেবে পরিচিত। আমি আজ বাউন্ডারি কমিশন ও ট্রাইবুনালের আট সদস্য, যাঁদের বেশির ভাগই ভারত ও পাকিস্তানের বিচারপতি ছিলেন, তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। আর স্মরণ করি দুই রাষ্ট্রে জন্মলগ্নে (১৩ আগস্ট, ১৯৪৭ করা স্যার রেডক্লিফের একটি উক্তি: 'আসাম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ভূখণ্ডগত কিছু বিনিময় অবশ্যই ঘটাতে হবে, কিছু অমুসলিম ভূখণ্ড পূর্ববঙ্গে, কিছু মুসলিম ভুখণ্ড আসামে যাবে। ৬৮ বছর পরে চাই চূড়ান্তভাবে ফলল।

ঐতিহাসিকভাবে ভূখণ্ডগত বিরোধ বিশ্বশান্তির প্রতি একটি বিরাট হুমকি হিসেবে গণ্য হয়ে আসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন এ ভাসকুইজ ও ম্যারি টি হ্যানেহান দেখিয়েছেন, 'দুই শতাব্দী ধরে

বাণিজ্য ও সরকারের ধরনের মতো বিষয় নিয়ে বিরোধের চেয়ে ভূখণ্ডগত বিরোধ নিয়েই পুর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হয়েছে। ভূমি বিরোধেই অধিকাংশ যুদ্ধের সূচনা ঘটেছে। ' ২০০২ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল কে. হাথ ও টড এল. অ্যালি এক সমীক্ষায় দেখান, ভূখণ্ডগত বিরোধের বিস্তার অতীতের পরিত্যক্ত কোনো বিষয় নয়। ১৯৯৫ সালেও বিশ্বে ৬৭টি ভূখণ্ডগত বিরোধ সক্রিয় ছিল। ১৯৯৯ সালে আরেক গবেষক (অ্যান্ডারসন) দাবি করেছিলেন যে, বিশ্বের এক- চতুর্থাংশ ভূমি এবং দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্রসীমা বর্তমানে স্থিতিহীন। এসব তথ্য উল্লেখ করে কলোরাডো বেল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জারোজাভ তির তাঁর রিড্রয়িং দ্য ম্যাপ টু প্রমোট পিসঃ টেরিটোরিয়াল ডিসপিউট ম্যানেজমেন্ট ভায়া টেরিটোরিয়াল চেঞ্জেস (লেক্সিংটন বুকস, ২০০৬) বইয়ে মন্তব্য করেন যে, 'সুপ্ত অবস্থায় থাকা ভূখণ্ডগত বিরোধের পরিমাণ তর্ক সাপেক্ষে বরং আরও বেশি। ' আমরা কিন্তু আজ একটি নিখুত মানচিত্র পাব।

১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ এবং ভারতের কট্টরপন্থীরা এই সীমান্ত চুক্তি সুনজরে দেখেনি। সেই কট্টর মুসলিম লীগারদের উত্তরসূরিয়া আজ ২০-দলীয় জোটে ভর করেছে। আমি নূন-নেহরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। চুক্তিটা হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। টাইম সাময়িকী ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ লিখেছে, 'এই গ্রীষ্মে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্বলভাবে চিহ্নিত থাকা সীমান্তে গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ল। এবং আবারও পাকিস্তানি মুসলিম লীগাররা (ভারতের বিরুদ্ধে) পবিত্র যুদ্ধে যেতে হাঁক দিলেন। প্রথাগতভাবে পাকিস্তানের যে রাজনীতিকই ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতির সুরে কথা বলবেন, সেটা তাঁর জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যার শামিল বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘদেহী, অক্সফোর্ড শিক্ষিত অভিজাত ফিরোজ খান নূন, যিনি গত শীতে পাকিস্তানের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তিনি মনস্থির করেছেন যে এ ধরনের দায়িত্বহীন চটকদার বাগাম্বরকে বড় বেশি বাড়াবাড়ি রকমের বাড়তে দেওয়া হয়েছে, এটা আর নয়। আমি আজ খালেদা জিয়ার কাছেও একই দৃষ্টিভঙ্গির আরও বেশি জোরালো বহিঃপ্রকাশ আশা করি।

জামায়াতের ভারতকে অভিনন্দন জানানো ইতিবাচক। অন্য ইসলামি দল ও সংগঠনগুলোর ও উচিত এতে শরিক হওয়া। আমাদের উচিত হবে

পাকিস্তানি ধারার ভারত বিরোধিতার বৃত্ত ভেঙে দিয়ে কেবল বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের শর্তে প্রয়োজনে ভারতের বিরোধিতা করার বন্ধুত্বপূর্ণ ও গঠনমুল একটি শক্তি শালী ধারার প্রবর্তন করা। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ কেবল আওয়ামী লীগের হাতেই বেশি নিরাপদ, এই ধারণার ছেদ ঘটাতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষেরই কমবেশি ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। নরেন্দ্র মোদি শেখ হাসিনাকে ফোন করে বলেছেন, "আপনার পিতার হাতে যে চুক্তির সূচনা, আপনার আমলেই তার সার্থক পরিণতি। কথাটি নিপাট সত্য। কিন্তু আরও বড় সত্য হলো, যে রাজনীতি নরেন্দ্র মোদিকে আজ প্রধানমন্ত্রী করেছে, তার মূলে রয়েছে ভারতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ভারতীয় জনসংঘ' যেটি আশির দশকে বিজেপিতে মিশে গেছে। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে ভারতীয় জনসংঘ নূন-নেহরুর মূল চুক্তির প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছি। সংগঠনটি ওই চুক্তি বাতিলে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে জোর আইনি লড়াই চালিয়েছিল। চুয়াত্তরের চুক্তি আটান্নর চুক্তির কার্বন কপি। বাংলাদেশ ১০ হাজার একর বেশি জমি পেয়েছে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যখন শুনানি চলছিল, তখন ভারতের সরকার আদালতকে চলেছে, সংবিধান সংশোধন না করে ১৯৫১ সালের চুক্তির আওতায় আমরা তো ভুটানতে ৩২ বর্গমাইল জায়গা ছেড়ে দিয়েছি, যা ছিল আসাম অংশের।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পই পই করে বলে দিয়েছিলেন, ইন্দরা মুক্তি-চুক্তি বাস্তবায়নে সংবিধানের সংশোধনী আনার দরকার নেই। কিন্তু ভারতের সংসদ সে কথায় কর্ণপাত করেনি, এটা আমার কাছে একটা মস্ত ধাঁধা হয়ে থাকবে। উপরন্তু এত সময় নিয়েও তারা ভুলভাবে পাস করাল। অথচ বিরোধপূর্ণ এসব ছিটমহল এখনো ভারতের অবিচ্ছেদ্য ভুখণ্ড ছিল না। সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে ভারত নবম সংশোধনী আনার পরে একই বিষয়ে আবার ও সংবিধান সংশোধন বিল পাস করে তার লাভটা কী হলো? প্রতিবেশী কোনো দেশ স্বাধীন হলে এবং তার সঙ্গে চুক্তি থাকলে কি আগে থেকে স্বাধীন হওয়া দেশকে তার সংবিধান শোধরাতেই হয়? যে দেশের রাজনীতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনাকে এভাবে অগ্রাহ্য (তিনবিঘা স্মরণযোগ্য) করতে পারে, সেখানে জুডিশিয়াল রিভিউ নিয়ে এতটা অহংকার কীভাবে তৈরি হতে পারল? একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি করার পরে তার বাস্তবায়নে ৪১ বছরের বিলম্ব বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতিকদের জন্য গৌরবজনক নয়।

গঙ্গা নদী নিয়ে ভারতের সঙ্গে ট্রিটি আছে, আরও ট্রিটি লাগবে। তাই আমাদের ধরে নিতে হবে, ভারতের রাজনীতিটাই শেষ কথা। এই সীমান্ত চুক্তি বিষয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বাস্তবসম্মত একটি উক্তি করেছেন: 'ট্রিটি রাজনৈতিক, আদালতের হাতের নাগালের বিষয় এটি নয়।' তালপট্টি নিয়ে রাজনৈতিক, আদালতের হাতের নাগালের বিষয় এটি নয়। তালপট্টি নিয়ে আমরা বিরোধ করেছি। ১৯৭৪ সালেই ইন্দিরা শ্রীলঙ্কার কাছে 'কাছাতিভু দ্বীপের মালিকানার দাবি ত্যাগ করেন। ২০০৮ সালে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জয়ললিতা সংবিধান সংশোধন না করে ওই দ্বীপ হস্তান্তর অবৈধ দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে রিট করেন। মনমোহনসিং সরকার আদালতে সাফ বলেছেন, ওটা সব সময় বিরোধপূর্ণ ছিল। কখনো ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না। একই যুক্তিতে ভারত আমাদের ছিট মহলগুলো অনেক আগেই দিতে পারত।

তবে কথা হলো আজ ৬৮ বছর পরে দুই পারের প্রায় ৮৫ হাজার মানুষ স্বাধীনতা পেল। দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের যে বিরাট ঘাটতি চলছে, তা মানতে পারি না। কিন্তু সম্ববত এটা মানতেই হয় যে শেখ হাসিনার জন্যই আমরা আজ ভূখণ্ডগত বিরোধমুক্ত একটি জাতিরাষ্ট্রে পরিণত হতে পেরেছি। এই সাফল্যের চূড়ান্ত দাবিদার নিশ্চয় আমাদের জনপ্রতিনিধি ও নেতারা কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে সবাইকে ছাপিয়ে যাবেন শেখ হাসিনা। দেশ শাসনে নানা বিপর্যয় চলছে, জনপ্রশাসন যেন ভেঙে পড়ার উপক্রম, বিরোধী দলের প্রতি তাঁর ও তাঁর সরকারের অসূয়াপ্রসূত মনোভাব কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। তদুপরি সীমান্ত জয়ের এই লগ্নে জনগণের নেত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর যে সত্তা মানবিক, রাষ্ট্রনায়কোচিত, সেই সত্তার প্রতি আমাদের অভিবাদন।

মুনতাসীর মামুন
কেন আমি শেখ হাসিনাকে সমর্থন করি

২০১১ সালের ২৭ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন পত্রিকায়। দেশে এত বাদানুবাদ না থাকলে এটি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা বা লেখালেখি হতো। কিন্তু, পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে গত একমাস যে হৈ-হুল্লোড় চলছে তাতে অন্যকোন বিষয়ই কয়েক ঘণ্টার বেশি মানুষের মনে ঠাঁই করে নিতে পারছে না। কিন্তু লেখাটি আলোচনার দাবি রাখে। প্রধানমন্ত্রীর লেখাটির নাম 'ভালোর পসরা'। সাধারণ মানুষের পর্যায়ের কথা জানি না, কিন্তু যারা পত্রপত্রিকা পড়েন ও রাজনৈতিক মনস্ক তাদের মধ্যে লেখাটি পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তাদের 'বিদ্বৎজনরা' পড়েছেন কিনা জানি না। না পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। কাগজ-কলমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে এমন কথা কেউ বলেনি এখনও। খুব ভাল হতো যদি বেগম জিয়া এ লেখাটির উত্তর দিতেন। কিন্তু রাজনীতির আর কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, বেগম জিয়া লিখতে পারবেন না। তার সঙ্গে কাগজ- কলমের সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনা তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাগজ-কলমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আর বিএনপি সমর্থক কোন কলামিস্ট পড়ে থাকলেও উচ্চবাচ্য করবেন না কারণ প্রধানমন্ত্রীর প্রবন্ধের কোন তথ্যই বানানো নয়।

মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কথা বলছিলাম। বদরুদ্দীন উমর তাঁর চিরাচরিত কঠোর ভাষায় শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেছেন, বিএনপির মুখপত্র দৈনিক আমার দেশে। বিএনপির কেউ লিখতে পারলে তাঁর/ তাঁদের লেখাটি হয়ত এই ধাঁচেরই হতো। তবে, জনাব উমরও স্বীকার করেছেন, 'শেখ হাসিনা অবশ্যই একজন সুলেখিকা'। অন্যদিকে, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী অকপটভাবে লেখাটির প্রশংসা করেছেন বিষয়বস্তুরও। এ মন্তব্যও তিনি করেছেন যে, এটি একটি উত্তম উপায়। প্রধানমন্ত্রী নিজের কথা তুলে ধরেছেন সাধারণের কাছে। এখন সাধারণও তাদের কথা তুলে ধরতে পারে তাঁর কাছে (যদি প্রধানমন্ত্রীর সময় হয় তা পড়ে দেখার)

গাফ্ফার চৌধুরীর এই মন্তব্যের কারণে ভাবলাম, আমরা কী ভাবছি তাই বা জানাই না কেন?

শেখ হাসিনার এই লেখাটি অনেকে ভুল ভাবেও নিয়েছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন। স্বৈরশাসন থেকে মৌলবাদী শাসন- সব সময় যিনি ঐ সময় এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে থেকেছেন সেরকম একজন ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, প্রধানমন্ত্রী কি আমাদের উদ্দেশ্যে এ রচনা লিখেছেন? ১৯৭৫ থেকে আমাদের জায়গা থেকে যতটা সম্ভব আমরা বলেছি, করেছি, এমনকি আওয়ামী লীগের নেতারা যখন চুপ ছিলেন তখনও আমরা প্রতিবাদ করেছি। আর তিনি কিনা আমাদের সম্পর্কে এরকম বলতে পারলেন, একটুও দ্বিধা লাগল না। সেই বিজ্ঞজনের কথা বাদ দিই। আমাকেই অনেকে বলেছেন, খুব তো লেখেন, এখন দেখেন প্রধানমন্ত্রী কী লিখেছেন আপনাদের সম্পর্কে, আপনার সম্পর্কে।

আমি বলেছি, না ভুল বললেন, তিনি আমাদের কটাক্ষ করে কিছু লেখেননি, লেখার কোন স্কোপও নেই। কারণ, আমরা সব সময়ই রাস্তায় ছিলাম এবং তিনি, তাঁর ও দলের যেসব সাফল্যের কথা বলেছেন, এগুলোর আমরা প্রশংসা করেছি, লিখেছি, তার ফলে কেউ কেউ এসব সাফল্যের কথা বলেছেন, এগুলোর আমরা প্রশংসা করেছি, লিখেছি, তার ফলে কেউ কেউ এসব সাফল্যের কথা জানে। তাঁর দলের সেই কুটকৌশলটি নেই মানুষজনকে জানানোর যে সরকার/দল কী করেছে। সুতরাং, নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই। আর যদি লক্ষ্য আমরা হয়েও থাকি তাতেই বা কী? আমি যখন লিখি তখন তা আর ব্যক্তিগত বিষয় থাকে না, সেটি হয়ে যায় পাবলিকের এবং পাবলিকের পুরো অধিকার আছে তা নিয়ে কথা বলার। সেই আলোচনা-সমালোচনা আমাকে শুনতে হবে এবং উত্তর দিতে হবে। না হলে তো রাজনীতিবিদ আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। কারণ তারা বলেন, শোনেন না এবং কেউ সমালোচনা করলে ক্ষুব্ধ হন কারণ তারা সবসময় মনে করেন তাঁর বা তাঁদের বক্তব্যটিই সঠিক।

আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর একটি গুণ আছে যা আমাদের কোন সরকার প্রধানের ছিল না। সেটি হচ্ছে প্রাঞ্জল গদ্য লেখার। অনেক কিছু

পাওয়ার পরও বিভিন্ন দেশে তো বটেই, আমাদের দেশেও দেখেছি, রাজনীতিবিদদের একটি আকুতি থাকে বই প্রকাশের বা সৃজনশীল কর্মকাণ্ড প্রকাশের। পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিও লেখেন, ছবি আঁকেন এর একটি কারণ বোধ হয়, সবাই মেনে নেন, যতদিন ক্ষমতায় বা ক্ষমতার কাছাকাছি আছেন ততদিন আছেন। তারপর নেই। লেখক হয়ত থেকে যেতে পারেন। আর সৃষ্টির একটি অপার আনন্দ আছে। সন্তান হলে পিতা-মাতার আনন্দের মতো। যে কারণে দেখেছি, স্বৈরশাসক এবং বিশ্ববেহায়া হিসেবে পরিচিত হওয়ার পরও একজনের আকুতি ছিল কবি হওয়ার। কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছিল। বেগম জিয়া যেহেতু লিখতে পারবেন না সেহেতু তাঁর বক্তৃতাবলী তাঁর নামে ছেপেছেন। আলহাজ মোসাদ্দেক আলী ফালু বাদ যান কেন? নামাজ শিক্ষার ওপরও তার চটি বই বেরিয়েছে। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের লেখালেখি বন্ধ। কারণ, এখনতো আর লিখে দেয়ার তেমন কেউ নেই। কিন্তু শেখ হাসিনার বেলায় সেটি খাটে না। ক্ষমতায় না থেকেও লিখেছেন, ক্ষমতায় থেকেও লিখেছেন। অবশ্য, এক হিসেবে তিনি সব সময়ই ক্ষমতায় আছেন এবং থাকবেন, প্রধানমন্ত্রী না থাকলেও। আমি নিজে দেখেছি, ফাঁক পেলে কম্পিউটারে তিনি নিজেই লেখেন। ইতোমধ্যে দু'খণ্ডে তাঁর রচনাবলীও বেরিয়েছে। বিক্রিও হয়েছে। একজন সামান্য লেখক হিসেবে আশা করব, তাঁর চর্চা যেন অব্যাহত থাকে। তাঁর মতো প্রাঞ্জল গদ্য আমাদের মধ্যে খুব কম গদ্য লেখকই লেখেন, বর্তমান রচনাটিও তার উদাহরণ। [পাঠক, মনে হতে পারে এটি স্তুতি এবং তাতে আমার কিছু প্রাপ্তি যোগ হবে। নিশ্চিত থাকুন। তিনি আমাকে উপদেষ্টা বা মন্ত্রী বানাবেন না]।

২. 'ভালোর পসরা' হাল্কা চালে শুরু করেছেন শেখ হাসিনা। তারপর ধীরে ধীরে মূল বিষয়বস্তুতে এসেছেন এবং প্রতিপক্ষকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে নাস্তানাবুদ করেছেন। আমাদের রাজনীতিবিদদের উইট কম। উইট আছে আমাদের সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের ব্যক্তিগতভাবেও শেখ হাসিনা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় উইটি যেভাবে বলেন, সেভাবেই লিখেছেন। যেমন লিখেছেন" সামরিক সরকারগুলো সময় তাদের কলমের কালি বা রিফিল থাকে না। কলম চলে না। মুখে কথা থাকে না, তখন বাঘের গর্জন

বিড়ালের মিউ মিউতে পরিণত হয়।" তাঁর এই বিদ্রূপ ধরে নিচ্ছি সুশীল সমাজের প্রতি। এখানে বলে রাখা ভাল। আমরা সুশীল সমাজের বাইরে। সুশীল সমাজ প্রধান কেবল টিভি এবং দু'একটি পত্রিকার সৃষ্ট। এদের সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে তাদেরই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এবং তাঁরা বিএনপির জন্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে কাজ করে যান এবং এটাতো ঠিক এই সুশীল সমাজ ভালবাসে বেগম জিয়াকে। কারণ, তিনি খুবই পরিপাটি, কোন সমালোচনার জবাব দিতে পারেন না। যা বলেন, তাতে যুক্তি থাকে না। সুশীল সমাজ ভালবাসে আমলাদের তা সে সামরিক বেসামরিক যে আমলাই হোক না কেন । কারণ, তাঁরা জানে, বাংলাদেশ আরও কিছুদিন আমলারা শক্তিশালী থাকবে। তাঁরা যদি জাতিসংঘ ব্যবস্থার কিছু প্রকল্প দেয়, ক্ষমতার কিছু ভাগ দেয় মন্দ কী? সুশীলরাষ্ট্র কখনও রাস্তায় নামে না। পরামর্শ দেয় অজস্র। কিন্তু, ভাগ্যের পরিহাস এই যে, পার্থিব বিষয়ে আমরা কখনও ভাগ পাই না, কারণ আমরা রাস্তায় থাকি, কিন্তু সুশীল সমাজ বা তাদের অনুরাগীরা পায়। হ্যাঁ, আওয়ামী লীগও সুশীলদের চরিত্র যারা ধারণ করে পার্থিব সুবিধাটা তাদের বেশি দেয়। প্রধানমন্ত্রী এটি মানতে চাইবেন না। কিন্তু, আমরাতো জানি, যেসব আমলা তত্ত্বাবধায়ক সামরিক আমলে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিল এবং যাদের হাতে আমরা মার খেয়েছি শেখ হাসিনার পক্ষ সমর্থন করে ও গ্রেফতার আতঙ্কে দিন কাটিয়েছি এবং যেসব আমলা লিপ সার্ভিস দিয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু যেসব আমলা তত্ত্বাবধায়ক আমলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছে তাঁদের সঙ্গে থাকেনি, তারাই কি উচ্চপদে আসীন হয়নি? এমনকি পার্টি বা মন্ত্রিসভায় যায়নি? যারা নির্যাতিত হয়েছেন তাঁরা কি মন্ত্রিসভায় এসছেন? ধরে নিলাম সেগুলো আমাদের বিষয় নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে যদি আমার বিষয় হয় তাহলে বলব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে [ঢাকা এবং রাজশাহী ছাড়া] তাদেরই উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে [শিক্ষকদের কাছে কাঙ্খিত পদ] যারা প্রায় কখনও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে কিছু করা দূরে থাকুক একটা বক্তৃতা-বিবৃতিও দেননি। আর তিন উদ্দিনের আমলে তারা কেঁদে কেটেই সারা।

শেখ হাসিনা যখন জেলে তখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক তাঁর পক্ষে একটি বিবৃতি দেয়ার জন্য শিক্ষকদের স্বাক্ষর যোগাড়ের চেষ্টা

করেন। ডিজিএফআই/র‍্যাব এ কারণে তাঁদের ধরে নিয়ে যায়। তাদের গ্রেফতার করেনি ঠিকই কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখে ও জেরা করে। যে শিক্ষকটি তাঁদের সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা দূরে থাকুক, বাজে কথা বলে কাগজ ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তাঁকেই কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদে বসান হয়নি? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্জন কারাবাসে রেখেছে। কিন্তু আমাদের অনেককে চোখ বেঁধে রেখেছে, বুটের লাথি খেতে হয়েছে বিএনপি এবং তিন উদ্দিনের আমলে, জিজ্ঞেস করেছে তোম আওয়ামী হ্যায়? যেমন ১৯৭১- এ জিজ্ঞেস করত পাকিরা তোম মুক্তি হ্যায়, আওয়ামী ? হ্যায়? না তারা ঘিরে ধরেনি আপনাকে বা শিক্ষামন্ত্রীকে বা আপনার কাছাকাছি ক্ষমতাবান নেতাদের। তাই তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। যারা ছিল না তারা লাভবান হয়েছে। আর যাদের পদায়ন হয়েছে তারা ব্যস্ত কীভাবে প্রতিপক্ষদের তুষ্ঠ রাখবে সে চেষ্টায়। যারা এখন ক্ষমতাবান তাদেরও দেখেছি কে কি করেছেন। ফিরিস্তি দেব না। কারণ আপনি তা পছন্দ করবেন না। আর আমাকে তো দেশে থাকতে হবে, ক্ষমতাবানদের চটিয়ে লাভ কী? বিএনপি বা জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রেও এরকমটি হয়। কিন্তু খুব কম হয়। তাহলে মেসেজ'টা কী দেয়া হয়? স্বৈরাচারী শাসক এলে প্রতিবাদ করবেন না বা লিখবেন না, পুরস্কৃত হবেন। মিউ মিউ করলে মালিক দুধ খেতে দেয়। বাঘের গর্জন কি কেউ পছন্দ করেন?

প্রধানমন্ত্রী তাঁর লেখায় অনেক উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, ১৯৭৫ সালের পর বা স্বৈরশাসকদের সময় বুদ্ধিজীবী [বা নির্দিষ্টভাবে সুশীল সমাজ] চুপ থেকেছেন। তাঁর ভাষায়, 'তাদের বিবেক জাগ্রত হয়নি ভাল না মন্দ তা দেখার জন্য। বরং ঘাপটি মেরে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বাতাস কোন দিকে যায় সেটা বুঝে নিয়ে সময়ের সুযোগে উদয় হবার জন্য। ...যারা নিজেদের উচ্চ দরে বিক্রি করতে পারলেন তাদের এক ধরনের সুর, আর যাঁরা কপালে কিছু জোটাতে পারলেন না তাদের সুর হলো দৃষ্টি আকর্ষণীয়- অর্থাৎ "আমরাও আছি, ক্রয় করুন, সেল-এ পাবেন।... এরপর যারা অবশিষ্ট থেকে গেলেন তারা তখন বাতাস ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টিয়ে বিপ্লবী হয়ে গেলেন।" তিনি এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর কালের উদাহরণও দিয়েছেন।

এটা মিথ্যা তা বলি কীভাবে? কিন্তু এ বুদ্ধিজীবী [যাঁদের লক্ষ্য করে তাঁর লেখা] তাদের সংখ্যা এমনিই কম। সংখ্যাতত্ত্ব নিলে দেখা যাবে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধিজীবীদের ভগ্নাংশ মাত্র এ দোষে দোষী, কিন্তু, যারা এ ধরণের কাণ্ড করেন তাদের বেশিরভাগই রাজনীতিবিদ। এই ট্রাজেডি কি ভুলবার যে, বঙ্গবন্ধুর পুরনো সাথী যাকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন অথচ বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখায় আলোচনায়। সবসময় যার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলো তিনিই বঙ্গবন্ধুর বুকে ছুরিটি বসিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর শেখ হাসিনা তাঁর ক্ষোভের কথা বলেছেন। এই ক্ষোভের দু'টি দিক আছে একটি হলো, ১৯৯৬-২০০১ সালে এবং বর্তমানে তিনি ও তাঁর সরকার যা করেছেন তা অন্যান্য আমলের চেয়ে কম তো না, বেশিই। কিন্তু তারপরও বলা হয় কিছু করা হয়নি, তাঁর ভাষায় "এই সরকার কিছুই করছে না, মানুষের অনেক আশা ছিল কিন্তু তা পূরণ হচ্ছে না, মানুষ হতাশ হয়ে যাচ্ছে, দেশ একদম ভাল চলছে না। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ।" দুই, তারা আর ভাল চান, যা করা হচ্ছে তাতে তাদের মন ভরছে না।

তারপর তিনি সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন বিএনপি আমল থেকে আওয়ামী লীগ আমলে অবস্থার কত উন্নতি হয়েছিল। এসব তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ না করে ঢালাওভাবে তাঁর বা তাঁর সরকারের প্রশংসা করেন কট্টর আওয়ামী লীগ বিরোধী বা বিএনপি-জামায়তপন্থী কিছু বুদ্ধিজীবী বা পত্রিকা, বা সুশীল সমাজের কেউ কেউ, সবাই নয়। অনেকে স্বীকার করেন যে, কষ্ট হলেও, না, শেখ হাসিনা বিএনপির থেকে ভাল করছেন। সাধারণ মানুষও কী তা একেবারে বোঝে না? আওয়ামী লীগ এবার এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল কীভাবে? পাওয়ার একটি কারণ বিএনপি জামায়তের নির্মম নিপীড়ন লুট, হত্যা। আওয়ামী লীগের ভোট কয় ভাগ? এবার পাওয়া গেছে কত ভাগ? যেটি বেশি পাওয়া গেছে এবং যার কারণে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা তার কারণ এই টকশো, গোলটেবিল, লম্বা টেবিল এবং সব ধরনের কাগজে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমর্থক-কলাম লেখকের যুক্তিতর্ক। এটি রাজনীতিবিদরা স্বীকার না করলেও সেই সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। বস্তুত তত্ত্বাধায়ক আমলে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরাই তিন উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহটি প্রথম করে। পরে যোগ দেয় রাজনীতিবিদরা।

এ প্রসঙ্গে একটু পুরনো কথা বলি। নিজেদের কথাই, একটা উদাহরণ হিসেবে। প্রধানমন্ত্রীও তো নিজের কথাই বলেছেন। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ পরাজিত হলো এবং সেটি যে হতে যাচ্ছে নানা কারণে সেগুলো আমাদের অনেকেই লিখেছি, সেই সময়ের দৈনিক জনকণ্ঠ খুঁজলে তা পাওয়া যাবে। আওয়ামী লীগ পরাজিত হলে, তারপর দিন আমি, শাহরিয়ার কবির ও হাশেম খান উদ্যোগ নিয়ে একটি বিবৃতি তৈরি করি যার মূল বক্তব্য ছিল সেনাবাহিনীর কারণে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়েছে। দ্বারে দ্বারে ঘুরে আমরা কবীর চৌধুরী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শামসুর রাহমান, হেনা দাস সব মিলিয়ে ডজন খানেকের স্বাক্ষর নিয়ে বিবৃতিটি কাগজে পাঠাই, আজকের কাগজ আর জনকণ্ঠ এবং ভোরের কাগজ বোধ হয় বিবৃতিটি ছেপেছিল। আপনি কি বিশ্বাস করবেন আওয়ামী লীগ বামপন্থী দলগুলো কাউকে পাইনি স্বাক্ষরের জন্য। কবি শামসুর রাহমান ও হেনাদি পরে স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নেন। কবির জামাই সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। তাকে বলা হয়, যদি তার শ্বশুরের স্বাক্ষর প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে তার চাকরি যাবে। কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সঙ্গে একমত না হওয়ায় হেনাদি তাঁর স্বাক্ষর প্রত্যাহার করেন। এ কারণে পরে শাহরিয়ার এবং আমাকে কী হেনস্থা করা হয়েছিল তা তো জানেন। কারণ, তখন আওয়ামী লীগ থেকে আপনিই কয়েকবার এর প্রতিবাদ করেছেন, পোস্টার ছাপিয়েছেন। ঐ সময়টা নির্মূল কমিটির ব্যানারে আমাদের সমমনা বুদ্ধিজীবীরা যত সেমিনার ও লেখালেখি করেছে আপনার ও আপনার দলের পক্ষে তা আপনার দলও করতে পারেনি। মূল বক্তব্য হচ্ছে, বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ যেমন সুবিধাবাদী, রাজনীতিবিদসহ আমাদের অন্যান্য অংশও সুবিধাবাদী, না হলে স্বৈরশাসকরা, খালেদা জিয়ারা, মতিউর রহমান নিজামীরা ক্ষমতায় আছে কীভাবে? সুতরাং আপনি করবেনটা কী? আপনার প্রথম আমলের কথা ধরা যাক, জাতীয় মুচি বা সুমেকার বলে পরিচিত, যিনি বঙ্গবন্ধুর চামড়া দিয়ে জুতো বানাবেন বলেছিলেন এবং জাতীয় পার্টির নেতা যাদের বিরুদ্ধে দশটা বছর লড়লাম তাদের মন্ত্রী করতে কি বাধ্য হননি? কিন্তু, আপনার খাতিরে তা সবাই মেনে নিয়েছিল কারণ সবাই চেয়েছিল আপনি ক্ষমতায় এলে দেশের মঙ্গল হবে। আপনি যে তাদের নিতে চাননি

তা স্পষ্ট, বলেছিলেন ও আলাপচারিতায়, কিন্তু নিতে হয়েছিল, বিএনপি আমল থেকে ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ অনেক করেছিল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি, দলীয় অনেক কর্মকাণ্ডের জন্য।

মধ্য ও মৃদু বাম মিলিতভাবে ক্ষমতায় এলে সবসময় দেশের উপকার হয়। এ কথা আমরা অনেক লিখেছি,'ভালর পরসা'য় তা আপনি আরও ভালভাবে উল্লেখ করতে পারতেন। আমি বরং আপনার জ্ঞাতার্থে দুটি উদাহরণ দিই- স্বাধীনতার পর থেকে দুর্নীতি হয়ে উঠেছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। দুর্নীতি প্রত্যয়টি ব্যাপক অর্থে দেখলে দেখা যাবে, ধারাবাহিকভাবে তা সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার একটি কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে দুর্নীতি, বিএনপিকে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত করার সময় প্রধান অভিযোগ হিসাবে উত্থাপন করা হয়েছিল দুর্নীতি। এরশাদ দুর্নীতির কারণে শুধু উৎখাত হননি, জেল খেটেছেন। বেগম জিয়ার পরিবার দুর্নীতিতে ছিল নিমজ্জিত। তাঁর ছেলেরা এ কারণে এখন বিদেশে। তিন উদ্দিনের সরকার কিছুদিন আগে তিন মাসের জায়গায় যে দুইবছর থাকল তাও দুর্নীতি দূরীকরণের প্রকল্প শেষ করার অজুহাতে।

বাংলাদেশে প্রথম ২৩ বছরে শুধু সরকারি খাতে চুরির পরিমাণ ধরা হয়েছিল ১৭৮৭৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। দুর্নীতির কারণে (১৯৯৪ পর্যন্ত চার্জশীট বেশি দেয়া হয়েছিল বেগম জিয়ার আমলে, ৯২.৪৭ শতাংশ। দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু আমলে ৬৮.৫০ শতাংশ। তবে বেগম জিয়ার আরও দু'বছর যোগ করলে মুজিব আমলের পরিমাণ বেগম জিয়ার আমলের পরিমাণের সমান। কারণ বঙ্গবন্ধুর শাসনকাল ধরা হয়েছে আড়াই বছরের। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, বেগম জিয়ার আমলের চার্জশীটের বৃহদাংশ ছিল এরশাদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। নিজ দলের বিরুদ্ধে নয়। বঙ্গবন্ধুর সেই রাজনৈতিক সুবিধা ছিল না।

কারও বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করাটাই বড় কথা নয়, চার্জশীটই আঁটোসাটো কিনা অর্থাৎ মামলায় টিকবে কিনা বা চার্জশীটের ফলে শাস্তি হবে কিনা সেটাও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কারণ চার্জশীটের কারণে যদি শাস্তি না হয় বা মামলাই না টেকে তাহলে চার্জশীট করে কী লাভ? এবার তাহলে হিসাব দেখা যাক। চার্জশীটের পর সবচেয়ে বেশি শাস্তি হয়েছে মুজিব

আমলে ৪৭.৯৩ শতাংশ। সবচেয়ে কম জেনারেল আমলে ১৬.৮২ শতাংশ। বেগম জিয়ার স্থান তার ওপরে ২২.৪৬ শতাংশ। এ হার জেনারেল এরশাদের শাসনামলের চেয়েও কম।

চার্জশীটের ফলে যে মামলা হয়েছে তাতেও দেখা যায় মুজিব আমলে শাস্তির পরিমাণ (অর্থাৎ হার) সবচেয়ে বেশি ৩২.৮৩ শতাংশ, বেগম জিয়ার স্থান জেনারেল এরশাদেরও নিচে তার স্বামীর ওপরে ১০.৮২ শতাংশ, বেগম জিয়ার দ্বিতীয় আমল, তিন উদ্দিনের আমল পূর্ববর্তী সব আমলকে টপকে যাবে। এই উপাত্ত কয়েকটি দিক তুলে ধরে ১. প্রত্যেক সামরিক শাসক বা ক্যান্টনমেন্টজাত রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকার সময় দুর্নীতির সবচেয়ে বেশি প্রশ্রয় দিয়েছে। ২. তাদের দুর্নীতির মামলার অনেক ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। না হলে চার্জশীট ও শাস্তি হার এত কম কেন? বা মামলাও টেকেনি কেন?

৩. দুর্নীতি সবচেয়ে বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে এবং আশচর্যজনক হলেও সত্য জেনারেল জিয়া ও বেগম জিয়ার আমলে। এটি আমাদের মনগড়া কথা নয়। সংখ্যাতত্ত্বের কথা সুতরাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমার বা আমাদের বক্তব্যের অমিল নেই, সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব আপনার বক্তব্যকে জোরালো করবে মাত্র, কিন্তু, তারপরও কথা থাকে, আপনি বার বার বলেছেন, আপনার মন্ত্রিসভা দুর্নীতিমুক্ত, হ্যাঁ, বড় রকমের স্ক্যান্ডালের খবর বের হয়নি সত্যি, তবে বাজারে এ সম্পর্কিত গুজব যে নেই তা নয়। তবে, যা জানি না তা নিয়ে মন্তব্য করব না। তাছাড়া, মাত্র কটিদিন আগে এ বিষয়ে আপনি কঠোর মনোভাব নিয়েছেন, বলেছেন,। মন্ত্রীদের হিসাব দাখিল করতে হবে। এ বিষয়ে আপনার আন্তরিকতা প্রশ্নের অতীত, কিন্তু যদি বলেন, অন্যান্য পর্যায়ের দুর্নীতি কমেছে, তা মানা আমাদের জন্য কষ্টকর তা হলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার ভাষায় স্পিডমানি দিতে হয় এবং এ পর্যায়ের স্পিডমানি দেয়ার ব্যাপারটা আমাদের ওপর অভিঘাত হানে, যেমন, জমি মিউটেশনে লাগার কথা ২৫০ টাকা, দিতে হয় আট হাজার টাকা। আমি এবং আমার বেশ কয়েকজন লেখক/ অধ্যাপক বন্ধু বেশ আগে ছোট এক টুকরো জমি রেখেছিলাম কক্সবাজারের উখিয়ায়। নিজেরা চাঁদা তুলে ৪০ হাজার টাকার ওপর দিয়েছি তারপরও মিউটেশন হয়নি। কানুনগো আটকে রেখেছে। সব পর্যায়ে গেছি, ফল লবডঙ্কা।

বিআরটিএতে গাড়ির সেফটি টেস্ট করতে গেলে, প্রতিবছর বলা হয় আমার গাড়ির চাকার মাপ ঠিক নেই, অথচ মান ঠিকই আছে। কোন যুক্তি দিলেই ৫/৬ হাজার টাকা দণ্ড। সুতরাং বাড়তি দেড় থেকে দু'হাজার টাকা দিয়ে ছাড়া পেতে হয়। না কোন অভিযোগ নয়, আমাদের পর্যায়ে ব্যাপারগুলো কীভাবে হয় উদাহরণ দিলাম। তবে, এগুলো নতুন কোন তথ্য নয়, আবহমান কাল ধরে তা চলছে সিস্টেমের কারণে কিন্তু কোন সরকার তো ব্যবস্থাটা পাল্টাচ্ছে না, যাতে আমরা হতবাগারা মুক্তি পাই। যে বিষয় যে মন্ত্রীর অধীন তিনি যে এসব জানেনন না তা নয় কিন্তু তাঁরা এ সব ব্যবস্থা বদলাতে উৎসাহী নন। আপনার কোনো মন্ত্রী কি এমন কিছু করেছেন [দু'একজন ব্যতিক্রম থাকতে পারে] যার ফলে আমাদের জীবনযাত্রায় খানিকটা স্বস্তি পেয়েছি, এ ধরণের মন্তব্যে বিরূপ হন, কিন্তু এটি রাস্তার মানুষজনের অনুভূতি। হয়ত দু'একজন ভাল করেছেন। হ্যাঁ, অনলাইনে সব করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা যদি চালু করা যায় অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে তা হলে হয়ত ভোগান্তি কমবে। কিন্তু মূল কথা, বিদ্যমান ব্যবস্থা পাল্টানোর তেমন উদ্যোগ নেই।

সুশীল সমাজ বাদ দিই, সবাই যদি এর চেয়ে ভাল আশা করে আপনি কি ক্ষুব্ধ হবেন? আরও আছে, দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনের খসড়ায় নাকি আছে যে, সরকারি কর্মচারিদের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য অনুমতি লাগবে এবং মন্ত্রিসভার একাংশ তাদের পক্ষে। কেন, আমলারা এখন জি-হুজার জি-হুজার করে বলেই'। আমাদের ক্ষেত্রেও তাহলে একই আইন প্রযোজ্য হবে না কেন। এই শর্তটি [খসড়ায়] বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। কালো টাকার মালিকদের প্রতিবছর তোয়াজ করতে হবে অর্থনীতির স্বার্থে, আর আমরা যারা নিয়মিত কর দেব তারা কোন ছাড় পাব না-এগুলো কি বৈষম বলে মনে হয় না? এগুলো কি আমাদের অসন্তুষ্টির কারণ হয় না? এসব কথা তুললেই কি প্রতিবাদ হয়ে যায় সরকারের বিরুদ্ধে? এসব বিষয় কিন্তু বিবেচনা করার সময় এসছে। এবার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি উদাহরণ দিই।

এ জেড এম আবদুল আলী ২০০৫ সালে একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন, ১৯৫৮ সাল থেকে বাংলাদেশ কতটা এগিয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের মূল ভিত্তি ইউএনডিপির বার্ষিক মানব উন্নয়ন সূচক। যেখানে মানব উন্নয়নের সূচকের

ধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সূচকটি হচ্ছে এক কিলোমিটার। এই এক হাজার মিটার দৌড়ে অংশ নিয়েছে ১৭৭টি দেশ। ৩০ বছরে (২০০৫) কোন দেশ যত মিটার অতিক্রম করেছে সে হিসাবই তুলে ধরা হয়েছে, দৌড়ে এগিয়েছিল নরওয়ে, ৯৬৩ মিটার তারা পেরিয়েছে এখন বোধ হয় তারা পৌছে গেছে ফিনিশিং লাইনে। সবশেষে নাইজার, তারা পেরিয়েছিল ২৮১ মিটার। জিয়াউর ক্ষমতায় আসেন তখন বাংলাদেশ ৩৪৫ মিটারে এরশাদ ৫ বছরে ২৫ ও দ্বিতীয় ৫ বছরে ৩০ মিটার। খালেদা যখন ক্ষমতায় আসেন তখন বাংলাদেশ ৪১৯ মিটার। যখন ক্ষমতাচ্যুত হন তখন এগিয়েছিলেন ৩৩ মিটার। ১৯৯৫-২০০০ পর্যন্ত ৪ বছরে ৪৫২ থেকে নিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে ৫০৬ মিটারে। বেগম জিয়ার জোট আমলের পৌছেছিল ৫২০ মিটারে সুতরাং শেখ হাসিনা আসামাত্র বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ায় এটাই সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব। এরপর আসা যাক আরও ভাল চাওয়ার ব্যাপারে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, "এই সব প্রশ্নের উত্তরের পরও আরও ভালর দল বলবে তারপরও দেশের অবস্থা ভাল নেই। এর কারণ কী? কারণ একটাই অগণতান্ত্রিক বা অসাংবিধানিক সরকার থাকলে এদের দাম থাকে। এই শ্রেণিটা জীবনে জনগণের মুখোমুখি হতে পারে না। ভোটে জিততে পারে না। কিন্তু ক্ষমতার লোভ ছাড়তে পারে না। তাই মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু অগণতান্ত্রিক বা অসাংবিধানিক সরকারের যে খোশামোদি -তোষামোদি ও চাটুকারের দলও প্রয়োজন হয়- এরা সেই দল।"

বিষয়টি সত্য নয়। কারণ, যারা এ কথা বলছে, তাদের দেখেছি আমরাও, অন্য আমলে অনেক কিছু সহ্য করে যায়। যেমন হরতাল টাকা এই হরতালের বিরুদ্ধে সুশীল সমাজ, ড. ইউনূস এবং অন্যরা কিন্তু যৌথভাবে একটি বিবৃতি দিতে পারতেন। দেননি। আওয়ামী লীগের হরতালের সময় টকশোতেও এর বিরুদ্ধে বলা হয়েছে, বক্তৃতা বিবৃতিতেও। সম্প্রতি ফাঁস হয়ে যাওয়া ইউকিলিকসের তথ্যেও দেখা যায়, ২০০৫ সালে শেষের দিকে সুশীলসমাজ বিভিন্ন জায়গায় তদবির করছিল সামরিক শাসনের জন্য। তবে, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ৫৪ হাজার বর্গমাইলে প্রায় ১৬ কোটি লোক যেখানে বসবাস করে সেখানে কোন উন্নয়নই পর্যাপ্ত নয়।

বিষয়টি অন্যভাবেও বিবেচনা করা যায়। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'মানুষের অনেক আশা ছিল কিন্তু পুরণ হচ্ছে না'- এ ধরনের খেদোক্তি করেন অনেকে এবং অনেকে আরও ভাল চান। দু'পক্ষের বক্তব্যই ইতিবাচক। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মানুষ আশা করে, অন্যরা এলে আশা করে না এবং আওয়ামী লীগ সরকার যা করে তারপরও মানুষ চায় আরও কিছু হলো না কেন? এটি যে কোন দলের জন্য ভাগ্যের কথা। সংখ্যাতত্ত্ব সব সময় আওয়ামীজোটের পক্ষেই থাকবে, এখন পর্যন্ত আছে। যে যত কথাই বলুক না কেন। আমাকেই যেমন অনেকে বলেন, বিএনপির কাছে মানুষ আশা করে না, সুতরাং বিএনপি আওয়ামী লীগের তুলনা করে লাভ কী?

তারপর প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে বিএনপি জোট ভোট পায় কেন? এর একটি কারণ আদর্শগত। অস্বীকার করার উপায় তো নেই যে, সামরিক বাহিনী ও তাদের ছত্রছায়ায় যে সব দল আছে তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে সমাজে স্থান করে নিয়েছে এবং এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ দেশের মানুষের মধ্যে রক্ষণশীলতা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। অর্থাৎ ডানের দিকে ঝোঁক বেশি। যেমন, আমরা অনেক সময় ঠাট্টা করে বলি, আওয়ামী লীগেও বিএনপি-জামায়াত কম নেই। তাছাড়া প্রাত্যহিক জীবনে রাষ্ট্রীয় নীতি অভিঘাত হানলে তখন আদর্শ গৌণ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ লাভ লোকসান ভোটের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। চালের দাম বাড়লে মুক্তিযুদ্ধ ও তার বিপক্ষ সব এক হয়ে যায়।

আরও আছে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রমাণ করে, আওয়ামী জোট আমলে দেশে গণতান্ত্রিক আবহ বেশি থাকে। [পুলিশী বাড়াবাড়ি ছাড়া]। সে জন্যই অনেকে গ্রেফতার বা ঝুট ঝামেলার ভয় ছাড়া বক্তব্য দিতে পারে। বিএনপি- জামায়াত আমলে সেটি সম্ভব নয়। এমনকি মিডিয়ার ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য। এটিতো সরকারের জন্য প্লাস পয়েন্ট। আর চর্মচক্ষেও তো দেখা যায় ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি। জামায়াত জোট কী ধরনের প্রতিশোধমূলক আচরণ করেছিল। আওয়ামী লীগ এসে তার এক দশমাংশ প্রতিশোধও নেয়নি।

এখন 'ভালর পসরা'য় যে সব ভাল ভাল উদাহরণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তার আলোকে কিছু বলতে চাই। প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কথা

তুলেছেন। সেই সময় আমরা বলেছিলাম, দক্ষিণ এশিয়ায় এটি শান্তি চুক্তির একটি মডেল হতে পারে। বেগম জিয়া তারস্বরে বলেছিলেন, ফেনী থেকে খাগড়াছড়ি-পুরো এলাকাটি ভারতের হয়ে গেছে। বিএনপির বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন করার মুরোদ ছিল না, তাহলে প্রশ্ন করা উচিত ছিল নির্বাচনে বেগম জিয়া বা তার ভাই নির্বাচিত হলো কিভাবে? ইন্ডিয়ান এজেন্ট হিসেবে? মিথ্যা বলা নাকি রাজনীতি। এসব অবাস্তব উক্তি মুজাহিদের উক্তি]। এবং যারা এসব দল করে তারা এসব মিথ্যা বিশ্বাস করে। তাদের হাতে কোরান দিয়ে জিজ্ঞেস করুন, বেগম জিয়া যা বলছেন তা কি সত্যি? তারা বলবে হ্যাঁ সত্যি। এবং যুক্তি দেবে, মিথ্যা যদি বলে থাকেন তবে বলছেন, আল্লাহর ইচ্ছায়। সুতরাং কি করবেন?

শুধু বলতে পারি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য যারা করেন তারা বিএনপি-জামায়াত ঘরানার বা ভালবাসার বা প্রভাবিত লোক। আমরা এ প্রশ্নে আর আলোচনা করব না। কিন্তু প্রশ্ন তো করতে পারি, চুক্তির অধিকাংশ শর্ত কেন কার্যকর হলো না? বিএনপি এ চুক্তি করেনি, তারা এর বিরোধী সুতরাং তারা কার্যকর করবে কেন? সামরিক বাহিনীও এর বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা পরবর্তী তাদের সব উপাধি এসেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করে। এ ক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন করা যায়, মুক্তিযুদ্ধের উপাধি বীর বিক্রম, বীর প্রতীক কেন এখন দেয়া হবে? দরকার হলে অন্য নামে দিন। এগুলো মুক্তিযুদ্ধের উপাধি। এভাবে এর ব্যবহার অবমাননাকর। [মাত্র জানা গেছে, এ উপাধি আর দেয়া হবে না] যাক, যা বলছিলাম, যদি চুক্তি কার্যকর হতো সম্পূর্ণভাবে তা'হলে আরও ভাল হতো। বা এখন যখন সংবিধান। সংশোধন করা হলো তখন বাঙালি ছাড়া অন্যদের জাতিসত্তার বিষয়টি উল্লেখ করলে কি এমন ক্ষতি হতো? একই দেশের অধিবাসীদের একাংশের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করা কি ভাল? এর কি কোন সমাধান নেই। সমাধানের জন্য আলোচনা করা আর উপেক্ষা করা দু'টি আলাদা বিষয়। উপেক্ষা মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। বর্তমান সরকার তারেক জিয়ার আমলের মতো বিদ্যুতের শুধু খাম্বা নয়, খাম্বার তার বসিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও উৎপাদন করার প্রচেষ্টা নিয়েছে, উৎপাদন বেড়েছে, গ্যাসের সন্ধান করছে এবং এ বিষয়ে সরকার যে আন্তরিক তাতে সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ

করেছেন, প্রথম আমলে ৩১০০ এবং এই আমলে এখন পর্যন্ত ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। আমি এসব টেকনিক্যাল বিষয়ে আলোচনায় যাব না। তবে, এটুকু বুঝি যে, লোডশেডিং ঢাকায় কমেছে, বাইরেও হয়ত কিছু উৎপাদনকারীরা সমস্যায় ভুগছেন।

চাহিদার সঙ্গে সরবরাহ মিলছে না। অনেক দেশ এখন আণবিক শক্তি বাদ দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের বোধ হয় সেদিকে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল জানি, কিন্তু তারপর কি হয়েছে জানা নেই। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবৃদ্ধি-৭ এর ওপর নিয়ে যাবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এখন আশীর্বাদ নয় অভিশাপ। আগে জন্মহার হ্রাসের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল এখন আর তা চোখে পড়ে না। প্রচলিত পদ্ধতিতে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে বিদ্যুৎ যোগান যাবে না। এ কথা আমরা বুঝব না। কারণ আমরা বিদ্যুৎ চাই। ফলে, সব সরকারই হয়ত এ সঙ্কটে থাকবে।

এবার আসি গ্যাসের কথায়। ২০০০ সালের নির্বাচনে এই গ্যাস বিক্রি নিয়ে হৈচৈ হয়েছে। বিএনপি সরকার এসেও সে সমাধান করতে পারেনি। ফুলবাড়ি কাণ্ড হয়েছে। আওয়ামী লীগ তাতে সমর্থন দিয়েছিল। তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষা কর্মসূচি তখনও ছিল। এখনও আছে। আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের সখ্য ছিল। এখন নেই। কিন্তু তারা দেশপ্রেমিক নয়, সংসদে যাঁরা আছেন তাঁরাই দেশপ্রেমিক এটি আত্মঘাতি উক্তি। নিজের সামর্থ্য কি তা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় অন্যকে ছোট করার প্রয়াস যখন নেয়া হয় তখন সে জানে না সমাজে সে ভাঁড় হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চয় মনে আছে, বিএনপির জাঁদরেল নেতা সাইফুর রহমানের কথা। এই সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, কোথাকার কোন নজরুল ইসলাম। এই একটি বাক্যই তাঁর যাবতীয় 'সুনাম' নষ্ট করে দিয়েছিল। আপনি যাদের উদ্দেশ্যে রিখেছেন প্রধানমন্ত্রী, তারাও কিন্তু তখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

যাক, এটি আলোচ্য প্রসঙ্গ নয়। তেল-গ্যাস যারা রক্ষা করতে চায় তারাও রেটরিকের আশ্রয় নিচ্ছে, সরকারও। আমরা বিভ্রান্ত। তেল-গ্যাস রক্ষাকারীরা খালি সাম্রাজ্রবাদের কাছে দেশ বিক্রি হয়ে গেছে বলে উল্লেখ

করছে, কিন্তু কিভাবে বিক্রি হলো সেটি পরিস্কারভাবে বলতে পারছে না। সাম্রাজ্যবাদের কাছে আমরা সবাই বিক্রি হয়ে গেছি। আজ যদি আমেরিকা রাজি হয় বাংলাদেশকে আমেরিকার ৫১তম রাজ্য করতে তাহলে দেখা যাবে, কয়েক লাখ বাঙালি ছাড়া আর কেউ অরাজি নয়। সাম্রাজ্যবাদের শক্তি এখন এমনিই। সরকারও বলতে পারছে না সুস্পষ্টভাবে কেন তেল-গ্যাস রক্ষাকারীদের যুক্তি অগ্রাহ্য করতে হবে। তেল-গ্যাস রক্ষাকারীদের হরতাল যেমন যুক্তিগ্রাহ্য নয় তাই শ'খানেক লোকের ওপর পুলিশদের ঝাঁপিয়ে পড়াও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কেউ তা পছন্দ করেনি। যদি মডেল পিএসসি এখন ক্রটিযুক্ত মনে হয় তাহলে তা সংশোধন করা যেতে পারে। সবক্ষেত্রে বাপেক্সকে। সংশ্লিষ্ট রাখা আমরা মনে করি উচিত। সরকারের উদ্যোগ ভাল, কিন্তু অন্যরা কি বলে তা শোনা কি খারাপ? তাদের বলায় গ্রহণযোগ্য কিছু থাকলে তা নির্দ্বিধায় নেয়া আরও ভাল।

ব্যবসায়ীদের উল্লেখ করে লিখেছেন, 'ব্যবসায়ীরা এত শান্তিতে কোনদিন ব্যবসা করতে পারেননি।' ব্যবসায়ীরা একমাত্র তিন উদ্দিন ছাড়া সব সময় সরকারের পক্ষে কেননা, সরকারগুলি ব্যবসায়ীদেরই। সরকার ব্যবসায়ীদের যত ভালবাসে অন্য কারো প্রতি তাদের এত ভালবাসা আছে কিনা সন্দেহ। কারণ অর্থ, এবং তা লেনদেন। আমিওতো হাতে কিছু নগদ পেলে এখন ব্যবসা করব। কারণ, পৃথিবীতে বাংলাদেশের মতো এত সুবিধা ব্যবসায়ীদের আর কেউ দেয় না। তারা যে কতো শক্তিশালী তার প্রমাণ দু'টি। এক. সব সরকারই না না করে শেষ দিন তাদের কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয় এবং দুই, প্রায় সবাই এখন ব্যবসায়ী হতে চায়।

ব্যবসায়ীরা পলিসি নিয়ন্ত্রণ করুক তা আমরা চাই না। তবে বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার ব্যবসায়ীদের অনিয়ন্ত্রিত লোভ দমনের চেষ্টা করছে, যা প্রশংসাযোগ্য এবং যা প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেননি। সেটি হলো ডেভেলপারদের লোভ। তাদের বেআইনী অনেক কিছুর বিরুদ্ধে সরকার আইন করেছে হয়ত কার্যকর করতে পারেনি। হয়ত পারবে না। কিন্তু ব্যবস্থাগুলো ভাল।

ভাল নয় কর্মজীবী শ্রমিকদের অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ১৫০০ টাকা যারা শ্রমের মূল্য পেত তারা ৩০০০ টাকা পায়।' ১০০ গুণ

বৃদ্ধি। হ্যাঁ, কেউ যা করেনি, এ সরকার তা করেছে। ভাল, তবে যথেষ্ট নয়। আমার ধারণা, আরও বেশি মজুরি প্রয়োজন-তা প্রধানমন্ত্রী অনুভব করেন কিন্তু গার্মেন্টস সেক্টরের মালিকদের জন্য তা পারেননি। বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও রফতানির নামে তারা যা করছে এবং যে ভাষায় কথা বলে, তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিগত কয়েক বছরে গার্মেন্ট মালিকদের লাখ কোটি টাকারও বেশি শুল্ক ছাড় (কালের কণ্ঠ ২২.৬.১১) দিয়েছে সরকার। এটি কি খুব ভাল? এবং এরা মাত্র ৩ হাজার টাকা মজুরি দিয়ে তড়পায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মজুরি বৃদ্ধি দরকার।

যদি রফতানি কমে তাতে ক্ষতি নেই। আপনি কৃষি শ্রমিকদের মজুরির যে হার উল্লেখ করেছেন ,তাতে তাদের মাসিক আয় দাড়ায় ৯ থেকে ১২ হাজার টাকা। একজন গার্মেন্টস শ্রমিক তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে পায় ৩ হাজার টাকা। অন্যায় আচরণ গার্মেন্টস সেক্টরে হঠাৎ বিপর্যয় ডেকে আনবে। সে কারণে মনে করি মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে সরকার ও মালিকদের এখনই বসা উচিত। আর আমার ধারণার সঙ্গে অনেকে একমত হবেন না যে, বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গরিবদের জন্য যদি কেউ ভাবেন বা করতে চান তিনি হলেন শেখ হাসিনা। এবং সে কারণেই এ অনুরোধ।

আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তিনি। সে সব বিষয়ে আলোচনায় না গিয়ে সাম্প্রতিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে এখন বিতর্ক চলছে। হরতালের মরসুম শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে অস্থিতিশীলতার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়গুলো আপনি আলোচনায় আনেননি। কিন্তু দেখুন, এগুলোই আলোচনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং আমাদের রাজনীতিবিদরা কী বলেন আর কী করেন এবং রাজনীতির প্রকৃতি কী তা যে আলোচনা করছি তাতে বোঝা যাবে।

আমরা বলেছিলাম, সরকার গঠনের প্রথম পর্যায়ে এসব সংশোধনীর উদ্যোগ নেয়া দরকার ছিল। এটা স্বাভাবিক যে, সরকার গঠনের সময় যে জনপ্রিয়তা থাকে তা প্রতিমাসেই কমতে থাকে। কারণ সমাজের সবস্তরকে খুশি করা যায় না। এখন অস্বীকার করার উপায় তো নেই যে, বিএনপি আগের থেকে অনেক সংহত এবং আগামী সরকার গঠনের সম্ভাবনা তাদের

আছে বলে তারা মনে করছে এবং এ ভাবনা তাদের উজ্জীবিত করছে। আদালত যখন পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী এবং অষ্টম সংশোধনীর রায় দিয়েছিল, তখন কিছু বিষয় অস্পষ্ট রাখায় আজ রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। ত্রয়োদশ সংশোধনীর ক্ষেত্রেও আদালত একই কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবে অবশ্যই বিএনপিকে পর্যুদস্ত করতে চাইবেন। তিনি তাঁর কৌশল মতো কাজ করবেন। সফল হলে বাহবা পাবেন। অসফল হলে সব দায় তাঁর উপর বর্তাবে। আমরা চাইব তিনি সফল হোন, কিন্তু এই দল নিয়ে কতটা সফল হবেন সে বিষয়ে সবার শঙ্কা আছে। কিন্তু মূল বিষয় হলো পঞ্চদশ সংশোধনী আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের খুশি করতে পেরেছে কিনা।

ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক কারণে আমরা নৈরাজ্যবাদী এবং পরস্পর বিরোধিতা আমাদের চরম। এই পরস্পর বিরোধিতা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এত চরম যে, তা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে সমর্থকদের বিপাকে ফেলে। আমি এখানে শুধু রাষ্ট্রধর্ম, বিসমিল্লাহ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আলোকপাত করব।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বৈরাচারী শাসক এবং বাংলাদেশের যারা ক্ষতি করেছেন তাদের মধ্যে দুই নম্বর, মহাজোটের অন্যতম খেলোয়াড় জনাব এরশাদ যখন অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেন তখন শেখ হাসিনা বলেছিলেন- অষ্টম সংশোধনী বিল এ দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্যই আসিয়াছে। ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে আমরা এই বিল বাতিল করিয়া দিব।'[ইত্তেফাক ১০.৬১৯৮৮] যারা রাষ্ট্রধর্ম বিল পাস করেছে তাদের তিনি বলেছিলেন জাতীয় শত্রু। শুধু তাই নয়, তিনি আরও জানিয়েছিলেন, 'ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে লইয়া যাহারা গদি রক্ষা করিতে চাহে, ধর্মকে যাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চাহে, তাহাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। [উদ্ধৃত, প্রথম আলো, ২৯.০৬.১১] সেই শত্রু এখন মহাজোটের পার্টনার। আরও বলি। জেনারেল মহাজোটের পার্টনার হলেও এবং আমরা জোটের সমর্থক হলেও সব সময়ই জেনারেলের বিরুদ্ধে থাকব। উল্লেখ্য জেনারেল এরশাদের পতনের পর তিনজোটের রূপরেখায় এরশাদের বিরুদ্ধে যারা স্বাক্ষর ছিলেন তাদের মধ্যে জনাব মেননও

ছিলেন। তিনিও এখন মহাজোটের পক্ষ। সময় সবই বদলে দেয়। বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন স্বৈরাচারী সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বিএনপির মহাসচিব ওবায়দুর রহমান বামপন্থীদের ভাষায় বলেছিলেন, 'ইসলাম কোন শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয় যে একে রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে।' আর জামায়াতের আমির আব্বাস আলী খান বলেছিলেন, 'গদি রক্ষার স্বার্থেই আইন সংশোধনী আনা হয়েছে।" না এখানেই শেষ নয়, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করার কারণে আওয়ামী লীগ, বিএনপি জামায়াত হরতাল ডেকেছিল। হ্যাঁ, একটা পার্থক্য ছিল। আওয়ামী লীগ ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনপ্রবর্তন চেয়েছিল। অন্য দলগুলো চায়নি, কারণ 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' ব্যাপারটিকে তারা গ্রহণ করতে চায়নি। বাংলাদেশে একমাত্র ব্যক্তি যিনি সব দল করেছেন এবং রাষ্ট্রধর্ম করার সময় এরশাদের মন্ত্রী ছিলেন এবং যার বই ও রাজনৈতিক নীতিতে কোন মিল নেই সেই মওদুদ আহমদ লিখেছিলেন, 'ধর্ম নিরপেক্ষতা ও কোন ধর্মের প্রতি রাষ্ট্র কর্তৃক রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান না করার মূলনীতি বাংলাদেশ সংবিধানের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ এবং তা সমধিক প্রগতিশীল এবং আদর্শমণ্ডিত। [ঐ]

বাংলাদেশের তিনটি প্রধান দল ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম চায়নি। আজ ২৩ বছর পর তিনটি দলই চাইছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকুক। তিনটি দলের সমর্থকরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং আমরা তা না চাইলেও কারও কিছু আসে যায় না। সিভিল সমাজের একটি বড় অংশ এবং সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে। আমরা সব সময় ১৯৭২ সালের সংবিধান বা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র চেয়েছি। আওয়ামী লীগকে সমর্থনের বড় কারণই তা। আমরা আরও মনে করি, রাষ্ট্রের ধর্ম মানুষের সেবা করা, ধর্ম পালন করা নয়। রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক হলে কী হয় তা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বিএনপি-জামায়াত আমলে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে। সেজন্য পুরনো আমলা ও নতুন ভোটাররা রাষ্ট্রধর্মের বিরোধী । এছাড়া ১৯৭২ সালের সংবিধানের সঙ্গেও তা সাংঘর্ষিক। এ দেশের ক্ষতি যিনি প্রথম শুরু করেছিলেন সেই জেনারেল জিয়ার পাকি সৈন্যদের মতো ধারণা ছিল আমরা যথেষ্ট মুসলমান নই। পাকিরা ১৯৭১ সালে কাপড় খুলে পরীক্ষা করত খৎনা হয়েছে কী হয়নি।

জেনারেল জিয়া জাতির খৎনা করবার জন্য সংবিধানের ওপর বিসমিল্লাহ বসিয়ে দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অনেকেই শ্মশ্রুমণ্ডিত, মাথায় টুপি পড়তে ভালবাসেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। পারলেই হজ্ব করেন। শেখ হাসিনার মতো ধর্মপ্রাণ সরকার প্রধান বাংলাদেশে আগে আসেনি। কিন্তু বাইরে, জনমনে আওয়ামী লীগের ইমেজ সেক্যুলার। এর কারণ ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সংগ্রামের ঐতিহ্য যার চরিত্র ছিল গণতন্ত্রী ও অসাম্প্রদায়িক এবং ১৯৭২ সালের সংবিধান।

বিএনপির নেতাকর্মীদের অধিকাংশই শ্মশ্রুহীন, টুপিহীন, পশ্চিমা পোশাকে সজ্জিত, ধর্ম থেকে হয়ত হুইস্কিতে, অর্থতে আসক্তি বেশি, ধর্মপ্রাণতা থেকে ধর্ম ব্যবহারে উৎসাহী, কিন্তু বাইরে এবং দেশে তারা পারিচিত 'ইসলামী মূল্যবোধ' জঙ্গীবাদ এবং মৌলবাদী হিসেবে। এর কারণ, এরা সব সময় সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে থেকেছে এবং এ দলটি গড়েও উঠেছে পরাজিত শক্তির আত্মীয়স্বজন, বংশধরদের দিয়ে। তাহলে রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক শক্তি ও নেতাদের প্রকৃতি দেখুন। সব সম্ভবের দেশ না হলে এ রকম অবাস্তব চিত্র দেখা যাবে? এখানেই শেষ নয়, এ দেশে স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের একটি দলও আছে যারা বিএনপির মতো ধর্মব্যবসায়ী।

এবার আসি সংখ্যালঘুদের প্রশ্নে। তারা খুবই ক্ষুব্ধ। আমার অনেক বন্ধু বলেছেন, আমার সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন বানিয়ে দিলেন। আমি বলেছি, আপনারা ১৯৪৭ সালের পর ফাষ্ট ক্লাস সিটিজেন ছিলেন কবে? ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত। ১৯৪৭ থেকে এখন পর্যন্ত তো সেকেন্ড ক্লাসেই। শুধু আওয়ামী লীগ এলে একটি স্বস্তিতে থাকেন। আর এতদিন ক্লাসের কথা মনে হয়নি। এখন হচ্ছে কেন? ড. রমনীমোহন দেবনাথ থেকে ধার করা একটি গল্প অতি অন্তরঙ্গ কয়েকজনকে ঠাট্টা করে বলেছি [অন্যরা এতে আহত হতে পারেন] যে সাতশ বছর সালাম দিয়েছেন আর না হয় ক'টা বলে দিলেন। আমাদের সবারই তো যাবার বয়স হয়ে এলো। প্রাক্তন কমিউনিস্ট নেতা অজয় রায় আমাকে বলছিলেন, আগে তো ভাই বেরাদরদের মানান যেত, এবার তো কাউকে মানান যাচ্ছে না। আমি বললাম, সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ বিএনপিও করে। তিনি আর কিছু

বলেননি। অন্যদিকে সিভিল সমাজের সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত তারা সব সময় রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহ বাদ দেয়ার পক্ষে। শেখ হাসিনার সমর্থক হলেও বলব, এ দুটির পক্ষে আমরা নই।

সংসদীয় কমিটিতে সিভিল সমাজ, সুশীল সমাজ, বিএনপিমনা যে ক'জন পেশাজীবী গিয়েছিলেন তাদের একজন ছাড়া সবাই ছিলেন রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহ সংযোজনের বিপক্ষে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না আমরা ক্ষুব্ধ। সংখ্যালঘুরা ক্ষুব্ধ এ কারণে যে, তারা মনে করে তাদের ভরসা শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রধর্ম তাদের আঘাত করে। আর শেখ হাসিনা তো সব সময় বলেছেন, তিনি ধর্ম ব্যবহারের বিপক্ষে। তাহলে কেন তিনি এমন করলেন? আমরা ক্ষুব্ধ এ কারণে যে, আমরা অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক মনে করি না রাষ্ট্রধর্মকে এবং বিসমিল্লাহর সংযোজনকে। আমরা আমাদের সংগ্রামের সাথী ও নেতা মানি শেখ হাসিনাকে। তাহলে তিনি এমন করবেন কেন? তাছাড়া এ দু'টি কাজ করেছিলেন পাকিপ্রেমী জিয়া ও এরশাদ। তাদের সবকিছুই যদি বাদ দিতে হয় তাহলে এটি হবে না কেন?।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না, রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহর পক্ষে থেকে শেখ হাসিনা সাম্প্রদায়িক হয়ে গেলেন। ইংল্যান্ডে বস্ন্যাসফেমি আইন চালু, কিন্তু ইংল্যান্ডকে কেউ মৌলবাদী দেশ বলবে না। পাকিস্তানে বস্ন্যাসফেমি আইন চালু এবং পাকিস্তানকে সবাই চরম মৌলবাদী দেশ মনে করে। রাষ্ট্রের আচরণটা বড়। আমেরিকার মতো চার্চের সংখ্যা আর কোন দেশে এত বেশি? এবং এক জরিপে দেখা গেছে, সেখানে ৯৮ ভাগ ঈশ্বরে বিশ্বাসী। অথচ সেখানকার আচার-আচরণ দেখুন। অথচ দেখুন, রাষ্ট্রধর্ম ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার আমলে জঙ্গী মৌলবাদীরা সবচেয়ে কোণঠাসা অবস্থায় আছে। তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। এটিও বিবেচনার বিষয় এবং এ আমলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব জঙ্গী মৌলবাদীদের গ্রেফতার ও বিচার। খুব সম্ভব, বিএনপি-জামায়াতকে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে দেবে না বলেই এ দু'টি বিষয় মেনে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে বলা হচ্ছিল আওয়ামী লীগ 'দ্বীন বদল করতে চাচ্ছে।' বিএনপি এখন কিছুই বলতে পারছে না। এ দু'টি বিষয় নিয়ে রাজনীতি করতে পারছে না দেখেই তাদের ল্যাঙ্গ এক ডজন গ্রুপ যাতের 'ইসলামী বলা হয় তাদের পথে

নামিয়েছে, হরতাল ডাকাচ্ছে। জামায়াতও । আর বাস্তবতা হলো বিএনপির এই অপপ্রচার ভোটে অভিঘাত হানত। এর ঐতিহাসিক কারণ আগেই বলেছি। আর এ ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবাদও হয়নি।

সব বলার পরও বলব, এর অন্যদিকও আছে। আমাদেরও একটি কনস্টিটিউন্সি আছে, সেটি অস্বীকার করা ঠিক না। এই এলাকাটিও আওয়ামী লীগের দরকার। এটিকে ক্ষুব্ধ করা উচিত নয়। রাজনৈতিকভাবে সব বিষয়ে এত কনফিডেন্স ভাল না। সরকার যে সংশোধনী এনেছে তাতে অন্য ধর্মেও সমগুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এবং সান্ত্বনা পেতে পারেন চার মূলনীতিও রাখা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও ঝামেলা আছে। সরকার ও বিরোধী দল পুঁজিবাদ ও গোলকায়নের সমর্থক কিন্তু রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সমাজতন্ত্র।

এ বিষয়ে আমি অনেককে বলেছি, শেখ হাসিনা দয়ালু তিনি কাউকে ফেরাননি। বিএনপি 'বিসমিল্লাহ' আর এরশাদ 'রাষ্ট্রধর্ম' চেয়েছেন, আমরা চেয়েছি ৭২-এর চার মুলনীতি। সবার ইচ্ছাই তিনি রেখেছেন।

পুরো বিষয়টি জগাখিচুড়ি হলেও ব্যক্তিগতভাবে সংসদীয় কমিটিতে প্রস্তাব করেছিল চারটি ধর্মকেই রাষ্ট্রধর্ম করে দেয়া হোক এবং চারটি ধর্মের বিসমিল্লাহকেই সংযোজন করা হোক। কারও কোন প্রস্তাবই আমলে পায়নি। রাজনৈতিক দল হিসেবে ভোটের বাস্তবতা বিচার করেছে আওয়ামী লীগ, যে কারণে অনেকে ক্ষুব্ধ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা যারা এর বিরোধী তারাও ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারিনি। আরও মনে হয়েছে, আওয়ামী লীগ একদিকের বাস্তবতা দেখেছে, অন্যদিকের নয়। নতুন ভোটার ও আমরাও একটি কনস্টিটিউন্সি। সেটি উপেক্ষা করবেন? ঠিক আছে। কিন্তু এ প্রশ্নে জবাব কী? আওয়ামী লীগ ১৯৭০, ১৯৭৩, এবং ২০০৮ সালে নির্বাচন করেছে ধর্মের প্রশ্ন বাদ দিয়ে। তিনবারই দু-তৃতীয়াংশের ভোট পেয়েছে। যখনই ধর্মকে পুঁজি করেছে বা প্রশ্রয় দিয়েছে তখনই হেরেছে বা সামান্য ভোটে জিতেছে। অর্থাৎ মানুষ আওয়ামী লীগকে এমন দল হিসেবে দেখতে চায় যে ধর্ম ব্যবসা করবে না। তবে সান্ত্বনা, অন্যান্য ধর্মকেও সমমর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা মন্দের ভাল। তবে এটি আমার বিশ্বাস, সংবিধানে যাই থাকুক শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে [

আওয়ামীলীগ নয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবে না, জঙ্গীবাদ বা মৌলবাদের বিকাশ হবে না এবং সংখ্যালঘুদেরও সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। শুধু তাই নয়, উপযুক্ত সময় এলে সম্পূর্ণ বিষয়টিকেই খতিয়ে দেখা হবে এবং রাষ্ট্রীয় ধর্ম বাদ যাবে।

এতসব বলার পরও বলব, আমাদের জেনারেশন সংবিধানের প্রশ্নে রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহ সংযোজনের বিরোধী। সেজন্য আমরা প্রতিবাদ করেই যাব। এবং মনে করি, বিষয়টি আমাদের অনুকূলে সূরাহা হলে আরও ভাল হতো!

তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্নে আমরা সরকারের পদক্ষেপের সমর্থন করি। সংসদীয় কমিটিতেও আমাদের অনেকে তাই বলেছি। এটা কি ন্যায্য কথা যে, যারা রাজনীতি করেন তাদের বিশ্বাস করা যাবে না, বিশ্বাস করা যাবে শুধু গুটিকয় আমলা, পেশাজীবী আর প্রধান বিচারপতিকে! এত রাজনৈতিক নেতা যারা দেশ চালান তাদের অবস্থান তাহলে কোথায়? আর গত কয়েকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রমাণ করেছে ঐ সরকার নিরপেক্ষ নয়। এ ব্যাপারে বেগম জিয়া ঠিকই বলেছিলেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন হয়েছিল বিএনপির ভোট কারচুপির কারণে। আওয়ামী লীগ যখন এ আন্দোলন করে তখন বেগম জিয়া ও বিএনপি তা প্রত্যাখ্যান করে। বেগম জিয়া ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে বলেছিলেন, কিসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার? আমি সেটা বুঝি না, জানি না। আরও বলেছিলেন, শিশু ও পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়। শেখ হাসিনা তখন ছিলেন এর পক্ষে। এখন তিনি বিপক্ষে, বেগম জিয়া পক্ষে। তা আমরা যাই কোথায়?

তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্নে বিএনপির আন্দোলন তাই জোরালো হওয়ার কথা নয়। কারণ, শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ বা জোটের নেতৃবৃন্দ বার বার বেগম জিয়া ও তাঁর দলকে আহ্বান করেছেন, সংসদে এসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে, কোন বিকল্প প্রস্তাব থাকলে দিতে। তাঁরা আসেনসি, খালি বলেছেন মানি না। তাঁরা সংসদে আসেন না কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রী আছে, চীফ হুইপ আছে, কত কি! যদি তাঁরা সংসদে আসতেন, আলোচনা করতেন এবং বলতেন, সরকার আমাদের কথার গুরুত্ব দেয়নি।

তা হলে না- হয় হতো। এতসব কাণ্ডের পরও যখন কেউ কেউ লেখেন বা টিভিতে বলেন, বিরোধী দলকে আনা সরকারের দায়িত্ব ইত্যাদি তখন তাদের নিয়েও সন্দেহ জাগে। তাঁরা বোধ হয় বলতে চান, বিরোধী দলকে সরকারে নিয়ে আসতে। বিএনপি কি আওয়ামী লীগের প্রেমিকা নাকি যে আওয়ামী লীগকে উপহার নিয়ে গিয়ে তার মান ভাঙ্গাতে হবে। তবে আমরা মনে করি, এ পরিপ্রেক্ষিতে যদি নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট স্বাধীনতা না দেয়া হয় এবং তা প্রতীয়মান না হয় তাহলে কিন্তু সরকারের অবস্থান দূর্বল হয়ে পড়বে। এ বিশ্বাস সবার আসতে হবে যে, এ দেশের নির্বাচন কমিশন অন্যান্য দেশের নির্বাচন কমিশনের মতন স্বাধীন এবং তার অধীনেই নির্বাচন হতে পারে। আর একটি বিষয় বুঝতে আমরা অক্ষম, তা হলো বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে যদি সব নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে থাকে তাহলে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা কোথায়? আমরা মনে করি, খুবই ভাল হয় যদি সরকার এ ক্ষেত্রে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে সমস্ত আন্দোলনের মূল ইস্যু ছিল সুষ্ঠু নির্বাচন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। ক্রমাগত মূল্য বাড়ছে। আমরা জানি বিশ্ববাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়ছে। আগের দামে আর খাদ্য পাওয়া যাবে না। কলকাতায় গিয়ে দেখেছি তিন চার বছর আগে যে দাম ছিল এখন তা অনেক বেশি। না, অন্য দেশের তুলনা দেব না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে বিশ্বব্যাপী ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশে যে হারে বেড়েছে তার কোন যৌক্তিকতা নেই । মানুষের বিশ্বাস, সরকারের প্রভাবশালীদের আনুকূল্যে একটি সিন্ডিকেট এর সঙ্গে যুক্ত। এটি ঠিক না হতে পারে । কিন্তু বিভিন্ন কার্যকারণে বিশেষ করে শেয়ারবাজারের কারণে মানুষ তা মনে করে। ঠাট্টা করে সবাই বলেন, ভাগ্যিস বাণিজ্যমন্ত্রী আর কথা বলেন না, তা হলে দাম যে কোথায় চড়ত কে জানে। কোথাও একটা ফাঁক আছে। সরকার টিসিবিকে কেন শক্তিশালী করল না বা করছে না, এটি কি ব্যবসায়ীদের চাপে! সরকার হ্রাসকৃত মূল্যে চাল বিক্রি করছে। কিন্তু শুধু কাঁচা চাল চিবিয়ে তো আর জীবন চলবে না। সরকার কীভাবে বিষয়টি দেখছে জানি না, কিন্তু সাধারণর ধারণা সরকার এ ব্যাপারে সিরিয়াস নয়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়ার দুটি দিক আছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এতে খুশি। তারা লাভবান হচ্ছে।

তারা টাকার মুখ দেখছে, আয় বাড়ছে । ফসল কাটার সময় কোন কোন অঞ্চলে কৃষিমজুর পাওয়া মুশকিল ১৬ কোটির দেশে। অর্থনৈতিক একটা প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এটা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দেবনাথদা মানে ড. রমণী মোহন দেবনাথ কয়েকদিন আগে এ বিষয়ে চমৎকার একটি নিবন্ধ লিখেছেন (জনকণ্ঠ, ৮-৬-১১)। ভৈরবে ঢোকার আগে চা খেতে ঢুকেছেন এক রাস্তার পাশে দোকানে। চায়ের দোকান কিন্তু চা বিক্রি হচ্ছে না, বিক্রি হচ্ছে কফি এবং স্যান্ডউইচ। একজন মাছ বিক্রেতা ও অটোরিক্সাচালক কফি-স্যান্ডউইচ খাচ্ছে। লিখেছেন তিনি, "ভীষণ ব্যাপার মনে হলো আমার কাছে। অটোচালক ও মাছ বিক্রেতারা কফি খায় ২০ টাকা কাপ আর স্যান্ডউইচ খায় ৪০ টাকা দিয়ে" তাদের আয় কত? "দু'জনেরই মাসিক রোজগার ১৫ থেকে ২০-২২ হাজার টাকায় ওঠানামা করে।" তিনি একটি হিসাব দিয়েছে, "২০০৫ সালে প্রতি মাসিক আয় ছিল ৭২০৯ টাকা। ২০১০ সালে তা হয়েছে ১১,৪৮০ টাকা । বৃদ্ধির পরিমাণ ৫৯ শতাংশ। এ সময়ের মধ্যে খরচ বেড়েছে অনেক বেশি হারে। বৃদ্ধির হার ৮৩ শতাংশ। এর ফল কি? মানুষের সঞ্চয় হ্রাস পাচ্ছে। আগে খানাপ্রতি মাসিক সঞ্চয় ছিল ১০৬৯ টাকা। এখন তা মাত্র ২৮০ টাকা। এর অর্থ কি? এর অর্থ বেশি বেশি ভোগ এবং প্রয়োজনীয় ভোগই মানুষের খরচ বাড়াচ্ছে। কিন্তু সেই অনুপাতে আয় বাড়ছে না।

গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরের মানুষের কষ্টটা বেশি। আমার থাকার একটা জায়গা আছে। আমার রোজগার, পুত্রদের কিঞ্চিৎ সহায়তা, তারপরও প্রতিদিন সকালে বাজার করার আগে ও পরে স্ত্রীর ঝঙ্কারে বাসায় টেকা দায়। অন্যদের তা হলে কী অবস্থা! পেটে ভাত থাকলে বিএনপি রাস্তায় লোক নামাতে পারবে না। এ বিষয়টিতে গা ছাড়া ভাব নয়। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া বাঞ্চনীয়। এ বোধ আরও প্রবল হয়ে উঠছে শেয়ারবাজারের পতনের কারণে। এ প্রশ্নের উত্তর কী হবে যে, আওয়ামী লীগ এলেই শেয়ারবাজারের পতন হয়? গতবার যারা দায়ী ছিল। এবার তার সঙ্গে তারাসহ আরও কয়েকজন এই পতনের জন্য মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন বলে সবাই মনে করেন এবং যেহেতু তারা ব্যবসায়ী এবং সরকারপক্ষের সেহেতু তাদের ধারেকাছে কেউ যেতে পারবে না এ

ধারণাটিও মানুষের মনে গেঁথে গেছে। একটা ধারণা জন্মেছে যে, সরকারের ভেতরও একটা সিণ্ডিকেট হয়ে গেছে তদন্ত কমিটি হয়েছে ভাল, কিন্তু যারা এই জোচ্চুরির জন্য দায়ী তাদের কিছু হলে আরও ভাল হতো। সরকারের প্রতি লোকের আস্তা বাড়ত। এখন বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ভোটের বাজারে শেয়ারবাজারের বিপর্যয় সুনিশ্চিতভাবে অভিঘাত হানবে।

প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছেন সরকারের ভাল কাজের। সেটি অস্বীকারের উপায় নেই। এ দেশটি গরিবের, গরিবরা ভাল থাকলে দেশ ভাল থাকবে এবং আমরা মনে করি শেখ হাসিনা গরিববান্ধব। শহরাঞ্চলে আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি তাতে আমরা ক্ষুব্ধ। গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাতে ক্ষুব্ধ নয় সে কথা আগেও উল্লেখ করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউনিয়ন কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ যেমন ফল করা উচিত ছিল এ পরিপ্রেক্ষিতে তেমন করতে পারেনি। কেন? গ্রামাঞ্চলেও? কারণ, দল। ১৯৯৬ সালের কথা ধরুন। প্রথম দু'তিন বছর আওয়ামী লীগ যেভাবে কাজ করেছিল তাতে বিরুদ্ধবাদীদেরও থমকে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তারপর স্বীয় লোকদের আত্মম্ভরিতা, টেন্ডার নিয়ে হামলে পড়া, অন্তর্দ্বন্দ্ব সবকিছু আওয়ামী লীগকে নিয়ে গিয়েছিল সজনপ্রিয়তার। তারপরও আওয়ামী লীগ যে কম ভোট পায়নি তার কারণ গরিবদের জন্য কিছু করা হয়েছিল। এটা কি খতিয়ে দেখার বিষয় নয়? কোন কোন মন্ত্রী/এমপিদের এলাকায় সবাই ফেল করেছে। যদি তারা আপনাদের প্রিয়পাত্র হয়, তাও।

এখন রাজনীতির যে পরিস্থিতি তা খুব সুখকর এমন তো বলা যাবে না। গ্রেনেড হামলা, দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়েছে। এসব মামলা আদালতে নিয়ে যেতে পারা মাইল ফলক ঘটনা। অন্যদিকে এ তিনটির সঙ্গেই বিএনপি-জামায়াত জড়িত। তারা হরতাল ডাকছে নিয়মিত। গাড়ি পোড়ানোর উৎসব শুরু হয়েছে। জয়নুল আবেদিন ফারুকের ঘটনা অনেককে আহত করেছে, যদিও তারা ভুলে গেছে একই কায়দায় মতিয়া চৌধুরী থেকে আমাদের পর্যায়ে চরম অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তফাতটা হলো সরকার দুঃখ প্রকাশ করেছে। সেই সময় বিএনপি নেতাদের এই দুঃখবোধ অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু তবুও আমরা মনে করি এ ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। এ ধরনের ঘটনা অনেক ভালোর পসরা' নষ্ট করে দেয়।

বিরোধী দল ছাড়া সিভিল সমাজের বিভিন্ন অংশও ক্ষুব্ধ বিভিন্ন কারণে, যা আগে কিছুটা উল্লেখ করেছি। এসব কিছু মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন সজীব দলের, যা এখন নেই। আরেকটি বিষয় মনে হয়েছে আমার। মানুষ কিন্তু এখন সরকারের প্রতি তেমন নির্ভরশীল নয়। এটি গণতন্ত্রের জন্য ভাল লক্ষণ। সরকারি হস্তক্ষেপ যত কমে গণতন্ত্র তত সফল হবে। এর অর্থ দল/সরকারকে এখন মানুষকে তুষ্ট করতে হবে ক্ষমতায় থাকতে হলে। মানুষ এখন চায়-সেবা বা সার্ভিস, জীবনযাপনের সুবিধা দলীয় ও সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি যদি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে তবে লাভবান হবে। এ্যারোগ্যান্স বা মেজাজ দেখালে মানুষের কিছু হবে না, সরকার বা দলেরই ক্ষতি হবে। সেজন্যই বলছি, ১৯৯৬-৯৮ সালে সরকারের কর্মকাণ্ডের যে গতি দেখেছি, এখন তা অনুপস্থিত। আমরা যেহেতু আরও ভাল চাই সে জন্য বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা উচিত।

আরও লেখা যেত। কিন্তু কাগজ তো আর ছাপবে না, মূলকথা তো বলাই হয়েছে। সবশেষে দুটি কথা বলতে চাই। আজকাল দেখি সরকারি দলের অনেক নেতা/মন্ত্রী পত্রপত্রিকায় তাদের বা সরকার সম্পর্কে আলোচনা- সমালোচনা হলে ক্ষুব্ধ হন;

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। হয়ত কখনও কখনও আপনিও। সেটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, পত্রপত্রিকায় অতিরঞ্জনও হয়। বিভিন্ন চাপের মধ্যেও থাকেন। দল, রাষ্ট্র, পরিবার, আত্মীয়স্বজন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে বঙ্গবন্ধু খুব শ্রদ্ধা করতেন। ১৯৭৪ সালের কোন এক সময় বোধ হয় অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, আপনাদের লাউঞ্জে নাকি আজকাল আমাকে নিয়ে খুব সমালোচনা হয়? অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গিতে হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'আপনি বঙ্গবন্ধু আপনারে নিয়া আলোচনা হইব না তো কি আবদুর রাজ্জাককে নিয়া হইব? ঐ সূত্র ধরে বলতে পারি, 'আপনি শেখ হাসিনা, আপনাকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হবে না তো হরিদাস পাল মুনতাসীর মামুনকে নিয়ে হবে? চার্চিল এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, প্রশংসা না করুক, আলোচনা করুক, তা হলেও তো মনে হয় আমি আছি।

আমরা আপনার নীতির কর্মকাণ্ডের সমালোচনা, প্রশংসা, অপ্রশংসা করবই। কারণ, আপনি দলীয় নেতা, সরকার প্রধান, পাবলিক ফিগার আপনার নীতি সমসমষ্টির ওপর অভিঘাত হানে-ভাল বা খারাপ যাই হোক না কেন। আর তা ছাড়া আমরা জানি যত ক্ষুব্ধই হোন সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আপা চা খাব' বললে সে ক্ষোভ আর আপনার থাকবে না। এখানেই বেগম জিয়ার সঙ্গে আপনার তফাৎ। বেগম জিয়ার সামনে অতি স্বচ্ছন্দে তাঁর খয়ের খাঁরাও এ কথা বলতে পারবে না। আর তাছাড়া, আপনি আমাদের জেনারেশনের এমন একজন যাঁকে আমরা শত সমালোচনার পরও ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। এ ভালবাসা আপনার চারপাশে ঘিরে থাকা ক্ষমতাবানদের নেই। কারণ তারা কিছু পেয়ে ভালবাসে না পেলে কী বলে বা করে সেটি লিখলে তা মুখরোচক হতে পারে, কিন্তু আপনার ভাল লাগবে না। তাহলে নিজের আয়াকেও বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমাদের এ বিশ্বাস আছে যে, বর্তমান রাজনীবিবিদ যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে আপনিই একমাত্র গরিবদের বন্ধু, আর এ রাষ্ট্রটি এনেছিল গরিবরা এবং গরিবরা ভাল থাকলে রাষ্ট্রটিও ভাল থাকবে, আপনিও নির্বাচিত হবেন- এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। আমরা যারা লিখি এবং সরকার/ দল বা আপনার সমালোচনা করি তাঁরা আবার আপনাকেই ক্ষমতায় দেখতে চাই, বিএনপিকে নয়। আমরা আলোচনাটি করি এজন্য যে, টেবিলের একদিক থেকে দেখাটা এক রকম, অন্যদিক থেকে আরেক রকম। দু'টির সমন্বয়ই উত্তম।।

এ বিশ্বাস আছে দেখেই আমরা আলোচনা, সমালোচনা ও প্রশংসা করি এবং চাই আপনি বেঁচে থাকুন। জনাব এবিএম মূসা ৭ জুলাই প্রকাশিত এক লেখায় লিখেছেন, এখন সময়টা মনে হচ্ছে প্রায় ১৯৭৫ সালের মতো। আমাদেরও তাই মনে হয়। কেননা যেসব কর্মকাণ্ডে হাত দিয়েছেন সেগুলো শক্তিশালী স্বার্থকেন্দ্র। কোন আমলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে শীর্ষ সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে? কারও সাহস হয়নি এবং সমাজে এ ধারণা হয়ে গিয়েছিল একজন সেনা বা পুলিশ অফিসার রাষ্ট্রের যা খুশি করতে পারেন। যে বিচার হাতে নিয়েছেন তা করতে পারলে রাষ্ট্রে এ ধারণা ফিরে আসবে কেউ রাষ্ট্রীয় আইনের উর্ধ্বে

নয়। আমাদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে এই দায় বোধের খুব অভাব, যে কারণে র‍্যাব নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে। যুদ্ধাপরাধের বিচার এ দেশে হবে। তা কি কেউ এখনও ভেবেছিল? নিজামী বা মুজাহিদ বা সাকাচৌরের মতো অতি উদ্ধত লোকরা রাজনীতির মাঠ দাপিয়ে বেড়াবে, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারবে না, তারাও আজ কারাগারে-এটি কখনও সম্ভব হবে এ দেশে তা কেউ ভাবেনি। হয়েছে। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার আগে একদল সাংবাদিককে হৈহুল্লোড় করতে দেখেছি হঠাৎ করে। এখন আবার সে রকম দেখছি এবং তারা বলাবলি করছে আগামী জানুয়ারিতেই চলে যেতে হবে শেখ হাসিনাকে। সুতরাং আপনি যে বিপদে আছেন তা অনুমান করে নিতে পারি। বিএনপি-জামায়াত নেতারা যে পরিমাণ টাকা করেছে তার একটা বড় অংশ আপনাকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার জন্য ব্যয় করতে তারা কুণ্ঠিত হবে না বলে অনুমান করি। আপনার এমপি/মন্ত্রীরা/আমলারা এ নিয়ে কত চিন্তিত তা জানি না, তবে আমরা সাধারণরা চিন্তিত। কারণ বর্তমান রাজনীতিতে, আমাদের এজেন্ডা একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের জনতাসমৃদ্ধ, উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন আপনার দিয়েই পূরণ করা সম্ভব। আপনার দল বা নেতাদের চেয়েও আমরা আপনাকে বেশি আমাদের মঙ্গলাকাঙ্খী ভাবি। অনেকে যে আওয়ামী লীগ সমর্থন করে তা আপনার কারণে আপনি এক সময় থাকবেন না, কিন্তু কোন দল আপনি রেখে যাচ্ছেন সেটিও কিন্তু চিন্তার বিষয়। এ দলটি থাকুক এটিও আমাদের কামনা। ২০১০ সালে আপনি এক সাক্ষাতকারে যা বলেছিলেন তা আপনার মনে আছে কিনা জানি না, সেটি হচ্ছে আমি জনগনের জন্য কতটুকু করতে পারলাম। তাদের জন্য কতটুকু করেছি, তাদের কতটুকু দিতে পেরেছি, তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কী ব্যবস্থা করতে পেরেছি, সেটাই হচ্ছে আসল রাজনীতি। আসলে রাজনৈতিক বোধ একেকটা মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। তাদের মন-মানসিকতার ব্যাপার। আমার যেটা বক্তব্য তা হলো, রাজনীতি মানে মানুষের জন্য কিছু করা। [কালের কণ্ঠ, ২০.০৬.২০১০]

আমরা মনে করি, এটি কথার কথা নয়, আপনার বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসও করি বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে

পরিণত করার নেতৃত্ব আপনিই দিতে পারেন এবং দেবেন, রাষ্ট্র ধর্ম মেনে নিলেও। এবং সে কারণে আমি এবং আমার জেনারেশনের অনেকেই নির্দ্বিধায় সমর্থন করি। ব্যক্তিগত লাভ লোকসান মনে করি না। কেননা আমরা বৃহত্তর ঐক্য পুরণে বিশ্বাসী। আর সেজন্যই চাই, আপনি বেঁচে থাকুন এবং আরও ভাল করুন। সুতরাং আমরা যদি আরও ভাল চাই, তাতে দোষ কী?

মুহম্মদ শফিকুর রহমান
সৎ রাষ্ট্রনেতার প্রতীক

জাতির পিতার গর্বিত কন্যা; ধর্মাচারে উদার অসাম্প্রদায়িক; যাপিত জীবনে মা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এবং নারী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃত নওয়াব ফয়েজুন্নেসা ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন; চালচলনে শালীনতা আপাদমস্তক বাঙালি নারী; অর্থ সম্পদের প্রশ্নে নির্লোভ নিরহংকারী-এমনি গুণাবলীর অধিকারী সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য এক জরিপে বিশ্বের সততার মূর্তপ্রতীক পাঁচ শীর্ষ রাষ্ট্রনেতার তালিকায় আপনার নাম অন্তর্ভুক্তি আমাদের গর্বিত করেছে, সম্মানিত করেছে, বিশ্বপরিমণ্ডলে বাঙালি জাতিতে সম্মানিত করেছে। আপনি আজ মর্যাদা এবং সৎ নেতৃত্বের যে উদাহরণ সৃষ্টি করলেন তা আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সৎ মানুষ হবার, সৎ নাগরিক হবার, সৎ রাজনীতিক হবার পথ দেখালো। আমরা এবং আমাদের সন্তান আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, আপনাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাননীয় শেখ হাসিনা, আমাদের সন্তান তথা ভষ্যিত প্রজন্ম নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বলা হতো কিশোর তরুণ-তরুণীদের সামনে অনুসরণীয় অনুকরণীয় কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যে তাঁর বা তাঁদের দিকে তাকিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ জীবন সাজাবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা যে কোনোদিন পূরণ হবে-তা ছিল নেহায়েতই অলীক কল্পনা। শেখ হাসিনা, আপনি সব হারিয়েও ৬ বছর প্রবাসজীবন শেষে ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফিরে জাতির হার ধরলেন জীবন বাজি রেখে বাঙালির সুখ-দুঃখের সাথী হলেন। অসৎ দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের মাঝে সৎ রাজনীতির উদাহরণ সৃষ্টি করলেন। রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেও সকল প্রকার লোভের উর্ধ্বে ওঠে 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার ওপর নাই' নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করে চলেছেন। মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তা বিশ্বের বিস্ময়-রোল মডেল।

প্যারাডাইস পেপারস অব পানামায় ব্রিটেনের রানী কিংবা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনসহ অনেক রাষ্ট্রনেতার নাম ভিন দেশের ব্যাংকে টাকা রাখার তালিকায় যখন উঠে এলো এবং বিশ্বব্যাপী তোলপাড়ের সৃষ্টি হলো, ঠিক তারপরই 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স' নামের আন্তর্জাতিক সংস্থা তাবৎ রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক নেতার ওপর জরিপ চালাল এবং জরিপের ফলাফলে দেখতে পেল বিশ্বের পাঁচ শীর্ষ রাষ্ট্রনেতা যাপিত জীবনে রাষ্ট্র পরিচালনায় সততার আলোকিত উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছেন। এই ৫ রাষ্ট্রনেতার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্থান তৃতীয়। নাম্বারিংয়ের মাধ্যমে তাদের অবস্থানও সংস্থাটি নির্ধারণ করে দিয়েছে। পাঁচটি প্রশ্নে মোট ১০০ নম্বরের ওপর 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স গবেষণা সংস্থা' তাদের গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। ৫টি প্রশ্নর মধ্যে রয়েছে।

১.সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে তিনি কি তার রাষ্ট্রের বাইরে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করেছেন? ২.ক্ষমতায় আসীনহবার পর তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ কতটুকু বেড়েছে? ৩. কোনো গোপন সম্পদ গড়েছেন কিনা? ৪. সরকার/রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ আছে কিনা? এবং ৫. দেশের জনগণ তাঁর সম্পর্কে কি ভাবেন?

এই ৫টি প্রশ্নের উত্তর গবেষণায় 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স সংস্থা' ১৭৩টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কর্মকাণ্ড গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯০ পেয়ে প্রথম হয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কের। ৮৮ পেয়ে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং দ্বিতীয়। ৮৭ পেয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা তৃতীয়। ৮৫ পেয়ে নওরয়ের প্রধানমন্ত্রী ইরনা সোলবার্গ চতুর্থ এবং ৮১ পেয়ে পঞ্চম হয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি।

'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স'-এর গবেষণায় উঠে এসেছে শেখ হাসিনার বাংলাদেশের বাইরে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই । সংস্থাটি গবেষণায় দেখেছে বেতন ছাড়া শেখ হাসিনার সম্পদের স্থিতিতে কোনো সংযুক্তি নেই। কোনো গোপন সম্পদও নেই বলে তাদের গবেষণায় উঠে এসেছে। সর্বোপরি বাংলাদেশের ৭৮ ভাগ মানুষ মনে করে শেখ হাসিনা সৎ এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত লোভ লালসার উর্ধ্বে।

শেখ হাসিনা যে লোভ লালসার কত উর্ধ্বে তা যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন বা সরাসরি কথা বলেছেন কেবল তারাই ভালোভাবে জানেন। বস্তুত সৎ হওয়া বা ব্যক্তিগত লোভ লালসার উর্ধ্বে ওঠার জন্যে পারিবারিক ঐতিহ্য, পরিবেশ এবং শিক্ষা লাগে, যা শেখ হাসিনা পুরোপুরি পেয়েছেন। আঘাত পেয়ে পেয়ে নিজেকে পার্থিব চাওয়া- পাওয়ার উর্ধ্বে থাকতে সহায়তা করেছে। তিনি পিতাকে দেখেছেন জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টি জেলে কাটাতে। রাজপথ ছিল তাঁর বেশি আপন। মাকে দেখেছেন এক সুশীলা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বঙ্গনারী, যিনি সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। স্বামী-সন্তানদেরও একইভাবে চালিয়েছেন। গোটা পরিবারটিই যেমন ছিল সাদামাটা ধর্মপ্রাণ তেমনি অসাম্প্রদায়িক মানবিকবোধসম্পন্ন পরিপূর্ণ বাঙালি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন- "আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, আমি মানুষ।" এই শিক্ষা যিনি বা যারা পেয়েছেন তারা অবশ্যই ভাগ্যবান, গর্বিত পিতার গর্বিত সন্তান। বঙ্গবন্ধুর সন্তানরা সেভাবেই নিজেদের গড়ে তুলেছেন। শেখ হাসিনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে এবং গণঅভ্যুত্থানে ক্যাম্পাসে মিছিল করতে দেখেছি। আর দশজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা-কথাবার্তা, আচার-আচরণ, পোশাক- আশাকে যেমন শালীন তেমনি অভিজাত। সেই ছোটবেলায়ই তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। রাজনীতিতে এল বা বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে তাঁর সেই পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা তাঁকে বাঙালি জাতি ও সমাজের একজন অত্যন্ত বড় মাপের মানুষে পরিণত করে, যা আমাদের রাষ্ট্র ও জাতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার। পাঁচ সৎ রাষ্ট্রনেতার মধ্যে শেখ হাসিনার জীবন সম্পূর্ণরূপে অন্যরকম। শেখ হাসিনা যেভাবে বাবা-মা সব হারিয়ে প্রবাসে শরণার্থী জীবনে বাধ্য হন এবং এক পক্ষের হারাবার বেদনা বুকে নিয়ে রাজনীতিতে আসেন এবং তাঁকে হত্যার জন্য যেভাবে গ্রেনেড হামলা থেকে শুরু করে বারবার হামলা চালানো হয়, তেমনি আর কারো জীবনে ঘটেনি। এখানে শেখ হাসিনা সবার তুলনায় ব্যতিক্রম।

সৎ মানুষরা তার জনগোষ্ঠীকে সাহসের সাথে এগিয়ে নিতে পারে বলেই বাংলাদেশ আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

এই মুহূর্তে আমাদের জিডিপি ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ; খাদ্যে উদ্বৃত্ত, উৎপাদন ৪ কোটি টন; মাথাপিছু আয় ১৬১০ মার্কিন ডলার; গড় আয়ু ৭১ বছর, শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ, এভাবে উৎপাদন, নগরায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সক্ষমতা এখন ১৬২০০ মেগাওয়াট; তথ্য প্রযুক্তি তথা ডিজিটাইজেশন উন্নয়নের সাফল নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে।

বিশ্বব্যাংকের মিথ্যা অজুহাত এবং রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজস্ব অর্থে দেশের সর্ববৃহৎ প্রকল্প পদ্মা সেতু নির্মাণ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অদম্য শক্তিকে তুলে ধরেছে। আর তাঁর এই সাহসী দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কোচিত ব্যক্তিত্ব বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে কক্সবাজারে এসে বসবাসরত ৪ লাল রোহিঙ্গার ওপর গত ২৫ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত ৭ লাখ রোহিঙ্গার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ তাঁকে এতটুকু বিচলিত করেনি। বরং কেউ কেউ যখন বলছিলেন এভাবে ঢুকতে দেয়া কি ঠিক হচ্ছে। জবাবে তিনি বলেছেন "প্রয়োজনে খাবার ভাগ করে খাব।" মানবিকতার এই দৃষ্টান্ত কেবল বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতা শেখ হাসিনাই দেখালেন। তাই তো বিশ্ব তাঁকে আজ বা মানবতার জননী কিংবা বা প্রাচ্যের উজ্জ্বল তারকা অভিদায় অভিহিত করেছে এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে- সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমাদের সৎ, যোগ্য, সাহসী মেধাবী, দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতা আছেন, সর্বোপরি মানবিকতায় চ্যাম্পিয়ন শেখ হাসিনা আছেন। এরপরও যারা ভবিষ্যতে সম্ভাবনা দেখেন না সেই অভাগাদের সামনেও এবার এগোবার মহাসড়ক নির্মাণ করে দিলেন শেখ হাসিনা।

মুহম্মদ সবুর

খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের খোঁজে রবীন্দ্রনাথ থেকে শেখ হাসিনা

হাজার বছরের পথ পেরিয়ে আসা বাংলা ভাষা, মূলত বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক। রাজনৈতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যেও বাংলার মানুষ বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিজস্ব ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। এই ভাষার জন্য বুকের রক্ত ঢেলেছে রাজপথে। এই ভাষার পথ ধরেই ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করেছে। বিস্ময়কর যে, সেই বাংলা ভাষার নেই নিজস্ব কোনো ব্যাকরণ। গত দু'শ' বছরের বেশি সময় ধরে প্রচুর ব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু তার একটিও বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত নয়। সবই সংস্কৃতানুসারি।

বাংলা এখন রাষ্ট্রভাষা। বিশ্বের ত্রিশ কোটি মানুষের ভাষা। এই ভাষায় উন্নতমানের শিল্প-সাহিত্য রচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা পেয়েছে বাংলা একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যিনি নিজেও সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন এবং একজন সুলেখকও বটে। তিনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা শুধু নয়, বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে ঘোষণা ও গ্রহণের জন্য প্রস্তাবও রেখেছেন। বাংলা ভাষার প্রসার ও বিকাশ গঠনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে দুই বাংলার গবেষক ও ভাষাবিদদের সমন্বয়ে বাংলা একাডেমি গত ২০০৯ সালে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তৈরির কাজ শুরু করেছে। যার লক্ষ্যই হলো সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিল ঘেরাটোপ থেকে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণকে মুক্তিদান। অবশ্য জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম দফা প্রধানমন্ত্রী হবার পর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। দেশে ফিরে তিনি বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য বাংলা একাডেমিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ লালিত চলিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ নেবার কথা বলেছিলেন। দ্বিতীয় দফা ক্ষমতায় আসার পর তার এই উদ্যোগ কার্যকর হচ্ছে। এটা বাঙালি জাতির জন্য অবশ্যই গর্বের বিষয়। এতো প্রাচীন এবং নানারকম কলাবতী বিচিত্র সাজের মাতৃভাষার কোনরূপের ব্যাকরণ করা

প্রয়োজন– সে সিদ্ধান্তের ভার শেখ হাসিনা বিশেষজ্ঞদেরই নিতে বলেছিলেন। শেখ হাসিনা নিজেও লেখালেখি করেন সেই সত্তর দশক থেকে।

বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার প্রস্তাবের পাশাপাশি ভাষার উন্নয়ন যে জরুরি- এ চিন্তাও শেখ হাসিনার সমভাবে কাজ করেছে। তাই ভাষার ব্যাকরণ যে প্রয়োজন এবং গুরুত্ববহ সেই উপলব্ধিটাই সামনে এসেছে। আসাটাই স্বাভাবিক। কারণ বাংলা ভাষার জন্য জলুম, হুলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য তিনি আপ্রাণ ছিলেন সচেষ্ট। তাঁর উদ্যোগে স্বাধীনতার পর ঢাকায় আর্ন্তজাতিক সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ বাংলা একাডেমির একুশের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- "আমি ঘোষণা করছি আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পন্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তারপরে বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদরা যত খুশি গবেষণা করুন-আমরা ক্ষমতা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেবো, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।" স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য নানা উদ্যোগও নিয়েছিলেন, সে সবই ইতিহাসের অংশ।

একটি ভাষাকে চলমান রাখে সে ভাষার ব্যাকরণ। কথ্য ভাষাতেও ব্যাকরণের অনুশাসন আছে। আমি, আমরা, তিনি, তারা, করেছিলাম, করছি, করব প্রভৃতি শব্দ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যায় না। আর লেখনের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের অনুপস্থিতি অকল্পনীয়। ব্যাকরণ ভাষার মেরুদণ্ডকে সোজা রাখবে, তার সচল, সরল প্রবহমানতা ক্ষুন্ন করবে না। তাই ব্যাকরণ লেখকের কাছেও চর্চার বিষয়। অনুরূপভাবে অভিধান ভাষার ক্ষেত্রে পরিভাষা, বানান প্রভৃতির অভিভাবক স্বরূপ। কোনও একটি বিদেশি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ, অথবা বাংলায় কোনও শব্দের নানা অর্থ অভিধানের মাধ্যমে পাওয়া যায়। বাস্তবতা হচ্ছে, বিদ্যমান বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বাংলা মুখের ভাষা নিয়ে। বাংলা সাধু ভাষা সংস্কৃত ভাষারই আদর্শ ভিত্তিক।

আর সাধু ভাষারই বিবর্তিত রূপ বাংলা চলিত ভাষা। অথচ এই চলিত ভাষাপোযোগি ব্যাকরণ রচিত হয়নি। এটা আজকের বাস্তবতা যে, বাংলা ভাষায় কেবল মান-কথ্য বাংলার বা বাংলা চলিত রীতির একটি ব্যাকরণ রচনা করা প্রয়োজন। দেখা গেছে বিদেশিদের বাংলা শেখাবার জন্য ইংরেজি ভাষায় যে সব বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতে মান বাংলা কথ্যরীতি ভিত্তিক চলিত রীতিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, চলিত বাংলা- "চলতি বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা যায় না। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্য ব্যবহারে একজনের সংগে আর একজনের সকল বিষয়ে মিল এখনো পাকা হতে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে ক্ষতি হবার আশংকা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই।" ভাষা বিষয়ে খুবই সচেতন এবং স্পর্শকাতর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা আধুনিক ভাষার অনেকখানিই তিনি পরিমার্জনা করেছেন।

বাংলা ব্যাকরণ রচনা শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকেই। প্রথম পর্বের ব্যাকরণ রচয়িতা ছিলেন ইউরোপীয়রা। মিশনারী পাদ্রিরা এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তকরণ। ইউরোপীয় বণিকরাও বাণিজ্যের সুবিধার্থে স্থানীয় ভাষার ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ মিশনারীরা ধর্মপ্রচারে এদেশে আসেন। বাংলা মিশনের অধ্যক্ষ ফাদার মার্কস আন্তনিও সাঁতুচি এবং সহযোগীরা ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেন। আঠার শতকের গোড়ায় বাংলায় মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠারও আগে ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবনে রোমান হরফে ছাপা দুটি বাংলা বই প্রকাশিত হয়। মানোএল আস্‌সুঁসাঁও রচিত 'ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেঙ্গঁলা এ পর্তুগয়েজ'- অর্থাৎ বাংলা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ। অপরটি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। গবেষকদের ধারণা, ফাদার সাঁতুচি ও সতীর্থদের সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণ অবলম্বনে পাদ্রি মানোএল গ্রন্থ দুটি প্রণয়ন করেন। এরপর পরবর্তীতে হ্যালহেড ও উইলিয়াম কেরি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। তাদের আদর্শ ছিল লাতিন গ্রামার। ম্যানোএল তার ব্যাকরণে কথ্য বাংলার রূপকে ধরবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যদিও সেই সময়ে লেখা সাধুভাষাকে প্রাধান্য না দেওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। এমনকি তাদের পক্ষেও। বলা হয়, ধর্মপ্রচারের জন্য

আগত পাদ্রি ম্যানোএল জীবন্ত বাংলা ভাষার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন তার রচিত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ গ্রন্থে। অবশ্য বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩৯)। উইলিয়াম কেরি ১৮০১ সালে 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা অভিধানও রচনা করেন। বাংলা ব্যাকরণচর্চার ধারায় তাদের নাম অবশ্য স্মতর্ব্য।

পাদ্রি মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁ রচিত বাংলা ব্যাকরণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয় রঞ্জন সেনের সম্পাদনায় ও অনুবাদে ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা সংস্করণটি মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। মূল গ্রন্থে অভিধান অংশে প্রায় ৬,৫৫০টি বাংলা শব্দ ছিল। বাংলা সংস্করণে রয়েছে ২,৫০০টি বাংলা শব্দ। ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয় হর্ণসের 'এ কম্পারেটিভ গ্রামার অব দি গৌড়ীয়ান ল্যাঙ্গুয়েজস্'। জন বীমসের বাংলা ব্যাকরণের একটি সমৃদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লেখাটি তার শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে সংকলিত আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিশ শতকের গোড়ায় ব্যাকরণ সমিতি গঠন করেছিলো। উদ্যোক্তা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ এই সমিতির সদস্য ছিলেন। সমিতি বেশ কিছু সুপারিশ করেছিল। তবে সে নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থান তৈরি হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ভাষা আমরা ইচ্ছা করলে গড়তে ও ভাঙতে পারি, তা নয়। সংস্কৃতের সাথে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু কোথায় কোথায় কি রূপ পার্থক্য আছে, সে সব চিহ্নিত করা গেলে বাংলা ব্যাকরণ গঠন করা যায়। 'বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হইবে কেন?' প্রশ্ন রেখে রবীন্দ্রনাথ বিদগ্ধজনের কাছে জানতে চান, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বাংলায় বেশী বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে করতে হবে কেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করলেন যে, বাংলা ভাষার প্রকৃতি কাঠামো সংস্কৃত থেকে পুরোপুরি আলাদা। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করা প্রয়োজন। তা বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজনেই। সে সময়ই বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে দু'টি পক্ষ দাঁড়ায়, একপক্ষ সংস্কৃতানুসারি, অপরপক্ষ চলিত বাংলা ব্যাকরণের পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দেন যে, চলিত বাংলা ব্যাকরণ হবে প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণ।

পরবর্তীতে স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন দেখা দিলে বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সে সময় এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ব্যাকরণ ভাষা শিল্পের সহায়ক। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ভাষা কখনোই ব্যাকরণকে অনুসরণ করেনা; বরং ব্যাকরণই ভাষার নিত্যদিনের গতিকে লক্ষ্য করে নীতি নিয়ম খুঁজে নেয়। কিন্তু ব্যবহারিক প্রবহমান ভাষা বাংলার ব্যাকরণ গড়ে নেয়ার কাজটি ধারাবাহিক কর্মকান্ড হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হলেও সে কাজে নিষ্ঠাবান ব্যাকরণবিদ মেলেনি। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার রীতি; বানান সংস্কার, যুক্তাক্ষরের ব্যঞ্জনা, সবকিছুর যোগাযোগ ও বিশ্লেষণ নিয়ে বাংলা ব্যাকরণ গড়ে তোলার কথা ভাষাবিদরা সবসময় বলে এসেছেন। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সংস্কৃতের ছাঁচেই রয়ে গেছে বাংলা ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণের রূপরেখা ধরে ব্যাকরণবিদরা যে ব্যাকরণ রচনা করেছেন তাতে বাংলা ভাষা মুক্তি পায়নি। যদিও ব্যাকরণবিদরা আশা করেন যে, বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি এতো প্রবল, এতো প্রচুর যে সামান্য ঔদাসীন্যে তার অবনমন ঘটবে না। যারা শক্তিমান লেখক তারা স্বল্পশক্তি লেখকদের অনুপ্রাণিত করবেন। স্রোতের বেগে সমস্ত দূষণ অপহৃত হবে। কিন্তু কার্যত সে দূষণ আরো বাড়ছে নিয়ত। বাংলা ব্যাকরণে পাশ্চাত্য চিন্তার প্রসার ঘটানো গেলেও সে কাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করা হয়নি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। এরপরও অনেকে ব্যাকরণ রচনায় নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু সাধুরীতি বহাল থাকলেও এসব গ্রন্থে চলিত রীতি উপেক্ষিত হয়েছে। কথ্য বাংলা ব্যাকরণ রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন ঢাকার দোহারে জন্ম রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য পবিত্র সরকার। তবে তিনি কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেন নি। করেছেন 'পকেট বাংলা ব্যাকরণ'। কথ্য বাংলার ব্যাকরণ। অবশ্য বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখার একটি খসড়া প্রস্তাব তিনি রেখেছিলেন গত শতকের শেষ দশকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও এর কপি দিয়েছিলেন সাক্ষাৎকালে।

বাংলাভাষী মানুষ শতাব্দীকালেরও বেশি এক জটিল ব্যাকরণের আবর্তে আছে। খাঁটি বাংলার জন্য খাঁটি ব্যাকরণ রচনার কথা বহুবার শোনা গেছে, কার্যত কিছুই হয়নি। এই কাজে সংশ্লিষ্টরাও এগিয়ে আসেন নি। শুদ্ধরূপে

বাংলা পড়তে লিখতে ও বলতে পারবো- এমন ব্যাকরণের জন্য শতাব্দীকাল পাড়ি দিলেও সেই মহানায়কের সন্ধান মেলেনি, যিনি আমাদের বলবেন, এই হচ্ছে সেই ব্যাকরণ, যা বাংলার মানুষের কথা ও চলিত ভাষার রূপ ধারণ করেছে। বিশ শতকের গোড়ায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বাংলা ব্যাকরণকে সহজসাধ্য করে সংস্কৃত অনুশাসন মুক্ত করার জন্য। শুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ রচিত হোক- সচেষ্ট হয়েছিলেন সে নিয়ে। ১৮৮৫ সালেই তিনি লিখছিলেন 'প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই।... বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিৎ।'

শতবর্ষ পেরিয়ে শেখ হাসিনা ভাষাতত্ত্বানুরাগি হিসেবেই বাঙালি জাতির ভাষাকে আরেক কঠিন অর্গল থেকে মুক্তি দেবার পথ প্রশস্ত করেছেন। শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি রক্ত দিয়েছে। জেল, জুলুম, হুলিয়া মাথায় নিয়েছে। সেই ভাষাকে কঠিন অর্গল মুক্ত করাই হবে জাতি হিসেবে অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাঙালি জাতি ব্যবহারিক শুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ অচিরেই পাবে এমন প্রত্যাশা সকলের। আর এর মধ্যে রয়েছে শহীদদের রক্তদানের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন।

মোনায়েম সরকার

সুবর্ণ সত্তরে স্বাগত

মাত্র আটাশ বছর বয়সে পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃহীন হন শেখ হাসিনা। একজন সাধারণ গৃহবধূ আর মুজিব কন্যা ছাড়া তখন তার অন্য কোনো পরিচয় ছিল না। তার জীবন ছিল খুবই সাধারণ-এ কথা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের বিচারে যেমন সত্য সামাজিকতার বিচারেও তাই। আমি শেখ হাসিনার জীবনের অনেক করুণ মুহূর্তের সাক্ষী। সেই কথাগুলো এখন হয়তো গল্পের মতো শোনাবে-কিন্তু ১৯৭৫ সালের পরে যে বিপর্যস্ত দিকভ্রান্ত, ক্লান্ত, আশ্রয়হীন, অসহায়, শেখ হাসিনাকে আমি দেখেছি তার সাথে আজকের দিনের শেখ হাসিনার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একজন সাধারণ গৃহবধূ আজ অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক । দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভেঙে তিনি এগিয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছলতার দিকে। এই মুহূর্তে তিনি যা কিছু স্পর্শ করছেন-তা-ই তার হাতের ছোঁয়ায় সোনা হয়ে যাচ্ছে।

ত্যাগের, দয়ায়, ক্ষমায় ও সাহসের মহিমায় শেখ হাসিনা আজ বিশ্বের বিস্ময়। মাত্র ৩৬ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক জীবনের তিনি অনেক কিছু উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে। আজ আমি এই মাহেন্দ্রক্ষণে তার অর্জনের দুই-একটি বিষয় অবতারণা করতে চাই। শেখ হাসিনাকে আমি 'গুড সিস্টার বলে ডাকি। তিনি আজ সুবর্ণ সত্তরের পদার্পণ করেছেন-সত্তরে তাঁকে সানন্দে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যারা একটু সময় ব্যয় করেন তারা নিশ্চয়ই জানেন-শেখ হাসিনা নিজের ইচ্ছায় রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হননি, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পরে বাংলাদেশ চলে যায় পাকিস্তানি ধারায় ক্ষমতালোভী সামরিক চক্রের হাতে। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে আওয়ামী লীগের নেতাদের উপর নেমে আসে ভয়াবহ অত্যাচার ও নির্যাতন এ সময় চলতে থাকে হত্যাকাণ্ড, গুম ও অকারণ জেল-জুলুম। সামরিক চক্রের ইচ্ছায় হতে থাকে ক্যু। যেই বঙ্গবন্ধু বর্ণনাতীত লড়াই-সংগ্রাম করে বাঙালি জাতিকে এনে দেন বহু কাঙ্ক্ষিত

স্বাধীনতা-তার নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এমনই এক ভয়াল মুহূর্তে দল ও জাতির স্বার্থে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন শেখ হাসিনা। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে সে কথা দেশবাসী আজ সম্পূর্ণভাবে অবগত।

জাতীয় নেতা মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আমেনা বেগম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সময়েই আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে যায়। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সোহরাব হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে. এম. ওবায়দুর রহমান, কোরবান আলীসহ বহু নেতাকর্মী বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার পর দলত্যাগ করেছেন। কিন্তু শেখ হাসিনা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আওয়ামী লীগের হাল ধরার মুহূর্ত থেকে একাই দলকে টেনে নিয়ে গেছেন। শেখ হাসিনাও যে দলের ভাঙনের মুখে পড়েননি এ কথা বলা যাবে না। ড. কামাল হোসেন ও আবদুর রাজ্জাকের মতো নেতারাও তাকে কম আঘাত করেননি। কলঙ্কিত ওয়ান-ইলেভেনের পর সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও জেলে গেছেন, তিনি উপলব্ধি করেছেন সুবিধাবাদীদের বিষদাঁতের কামড়। তবু তিনি সবকিছু সামলে নিয়েছেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। এখনো তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

শেখ হাসিনার সবচেয়ে বড় গুণ তিনি প্রতিহিংসা পরায়ণ নন। যে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার তাকে নানাভাবে নির্যাতন করেছেন, হয়রানি করেছেন, আজ তাকেই তিনি দিয়েছেন উপদেষ্টার মর্যাদা। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে যেভাবে তাকে একের পর এক হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে-সেই বিএনপিকেও তিনি আক্রোশবশত আঘাত করেননি, বিশ্বের ইতিহাসে উদারতার এমন নজির খুব একটা আছে বলে মনে হয় না।

শেখ হাসিনা আজ শুধু আওয়ামী লীগেরই নেতা নন, তিনি আজ দল-মতের উর্ধ্বে উঠে স্টেটসম্যান বা রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছেন। ইতিহাস যদি বাংলাদেশের রাজনীতিকদের নাম বুকে ধারণ করতে চায়, তাহলে শেখ হাসিনার নামটি স্বর্ণাক্ষরেই লেখা হয়ে থাকবে। তার নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পন্ন হতে চলেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর

করার মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। আজ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কর্মযজ্ঞ বাঙালি জাতির ইতিহাসে গৌরবোজ্জল নতুন অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। অকুতোভয় সাহসী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়নের মডেল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার কারণেই বাংলাদেশ বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে।

জননেত্রী শেক হাসিনা আজ বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতীক। তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ যেভাবে বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল-তিনি দৃঢ় মনোবলে সে সব কিছু বাংলার মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনাও তিনি সামাল দিয়েছেন দক্ষ হাতে। দুর্নীতি দমনে তার অর্জন মোটেই খাটো করে দেখার মতে নয় অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রাদর্শ যেমন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল-শেখ হাসিনার স্বপ্নও তা-ই। সেই লক্ষ্যেই তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া বাংলার জনপদে আজ তিনি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আন্দোলনের স্লোগান তুলে দেশের চেহারা বদলে দিয়েছেন। দেশের মানুষ প্রথম দিকে ডিজিটাল বাংলাদেশের মমার্থ বুঝতে দেরি করলেও আজ সকলেই স্বীকার করছে বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির এক নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও ল্যাপটপ জরুরি কাজ সমাধা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুর্বলের উপর সবলের খবরদারি এক ঐতিহাসিক সত্য। এই কথা দুর্বল দেশের বেলায়ও সমানভাবে প্রযুক্ত। বাংলাদেশের উপর অনেকেই অযৌক্তিক অভিভাবকত্ব প্রদর্শন করেছে এবং এখনো করতে চাচ্ছে। এদেশের নির্বাচন হলে আমেরিকা পর্যবেক্ষণ করতে আসে, আসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। কিন্তু তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে আজ আমরা সকলেই জানি-আমেরিকাতেও নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তারাও খামখেয়ালের বশে এবং নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য দেশের উপর চাপিয়ে দেয় অন্যায় যুদ্ধ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গরিব দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন না-তারা ধনীদের

স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন এতটাই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে যে, আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের রক্তচক্ষুকেও আর ভয় পায় না। বিগত কয়েক বছরে শেখ হাসিনা এ কথার প্রমাণ বহুবার বাংলাদেশের মানুষের সামনে রেখেছেন।

কারও কাছে নতজানু হয়ে নয়, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই এখন দেশ শাসন করছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। যারা ভারতবিদ্বেষী আছে-তারা বহুবার বলার চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশ ভারতের হাতে চলে যাবে। তাদের এমন অর্বাচীন প্রলাপের মোক্ষম জবাব দিয়েছেন তিনি। শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে ২৫ বছর মেয়াদি ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি বাতিল করা। তার সময়েই বাস্তবায়িত হলো ৬৮ বছরের কষ্ট আর ৪১ বছরের প্রতীক্ষিত সীমান্ত চুক্তি। ভারতের মতো দেশের কাছ থেকে সীমান্ত চুক্তির বিল পাস করানো কতটা কূটনীতিক দূরদর্শিতার ফল-তা আজ আর কারও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। এমনকি মায়ানমার ও ভারতের কাছ থেকে সমুদ্রসীমা বিজয়ও বাংলাদেশের ভৌগোলিক ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

ছাত্র জীবনেও তিনি রাজনীতি করেছেন এবং ইডেন কলেজের ভিপি ছিলেন। ৩৬ বছরে তিনি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলাসহ ১৯ বার মৃত্যু ঝুঁকিতে পতিত হয়েছেন-এতবার মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা রাজনীতিক পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই আছে। এ বিষয়ে কেবল কিউবার বিপ্লবী রাজনীতিক ফিডেল ক্যাস্ত্রোর সঙ্গেই তার তুলনা চলে। রাজনীতিতে পা দিয়েই তিনি গৃহে অন্তরীণ, কারানির্যাতন ভোগ, মিথ্যা মামলায় হয়রানিসহ বিচিত্র জুলুমের মুখোমুখি হন। তবু তার অপ্রতিরোধ্য গতি কেউ থামাতে পারেনি। বরং যারা তার গতিরোধ করতে চেয়েছে তারাই নিক্ষেপিত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে তিনি সাধ্যের চেয়েও বেশি কিছু দিয়েছেন-সীমাহীন প্রতিকূলতার মুখে পদ্মাসেতু নির্মাণ কাজ শুরু যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি তারই সুযোগ্য নেতৃত্বের ফসল। উন্নয়নশীল বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালনার জন্য শেখ

হাসিনার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাদেশকে শেখ হাসিনা দিয়েছেন অনেক কিছুই-কিন্তু বাংলাদেশ তাকে রক্তাক্ত-ক্ষত বিক্ষত করা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। আজ বাংলাদেশের সামনে সময় এসেছে নির্ভীক এই দেশপ্রেমীকে যথার্থ মর্যাদার শুভেচ্ছা জানানো।

সম্প্রতি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উত্তাল জনস্রোত এসে আছড়ে পড়েছে বাংলাদেশে। লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয় রোহিঙ্গাদের মানবিক জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে দিতে নিরলসভাবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। রোহিঙ্গাদের পক্ষে বৈশ্বিক জনমত সৃষ্টির জন্য ছুটে যাচ্ছে একপ্রান্ত থেকে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে। আজ আমরা তাকে চিনতে পারছি 'মাদার অব হিউম্যানিটি' বলে। তার নাম নোবেল শান্তি কমিটির কাছে প্রস্তাব করেছেন বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞগণ। মাদার অব হিউম্যানিটি শেখ হাসিনা এবার শান্তিতে নোবেল পেয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করবেন-এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে-প্রাণে লালন করি।

মোহাম্মদ নাসিম
উন্নয়নের কারিগর

তিনি আমার নেত্রী। আমার বোন। প্রায় সমবয়সী আমরা। কৈশোর থেকেই আমি তাকে চিনি। বঙ্গবন্ধু এবং আমার বাবা এম মনসুর আলীসহ জাতীয় চার নেতার পরিবারের পারিবারিক বন্ধন ছিল অবিচ্ছেদ্য। বঙ্গবন্ধু যেমন আমাদের পরিবারের খোঁজখবর রাখতেন, তেমনি আমার বাবাও তার পরিবারের খোঁজখবর রাখতেন। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের যে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি,তা আজ অমলিন। সে কারণে একটি ব্যক্তিগত কষ্টকর অভিজ্ঞতা দিয়েই লেখাটি শুরু করতে চাই। পঁচাত্তরে শেখ হাসিনা তার পরিবারের একজন ছাড়া সবাইকে হারিয়েছেন। আর আমিও আমার পিতাকে হারিয়েছিলাম।

পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে সব হারিয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা যখন প্রবাসে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আশ্রয়ে দিল্লির একটি ছোট্ট বাড়িতে দুঃসহ জীবনযাপন করছিলেন, ওই সময় আমি ভারতে গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমাকে দেখে তিনি ও শেখ রেহানা অঝোরে কেঁদেছিলেন। দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতার মেয়ে হয়েও প্রবাসে কী দুঃসহ, কষ্টকর ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে তিনি জীবনযাপন করেছিলেন, তা সেদিন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি ভেঙে পড়েননি। ইস্পাতকঠিন মনোবল নিয়ে সেদিনও তিনি আমাকে সাহস জুগিয়েছিলেন, সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আমার পরিবারের খোঁজ নিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও দেশের মানুষের কথা জানতে চেয়েছিলেন।

শেখ হাসিনার মনোভাব দেখে অনুভূত হয়েছিল, তিনি দেশে ফিরে আসবেন, দল ও দেশের মানুষের নেতৃত্ব দেবেন এবং ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার করবেন। পরের ইতিহাস সবাই জানি। ১৯৮১ সালে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেদিন তাকে বরণ করার

জন্য জনস্রোত নেমেছিল। সেদিন তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ১৫ আগস্টের খুনিদের বিচার, দেশের ভাগ্যহত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন, গণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য যাত্রা শুরু করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তার যাত্রা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। দলের মধ্যে অনৈক্য ছিল। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সব সমস্যা মোকাবিলা করে তিনি দলকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। বারবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে তিনি দলে ইস্পাতকঠিন ঐক্যের বার্তাবরণ তৈরি করেছেন।

দীর্ঘ কয়েক যুগের কঠিন আন্দোলন-সংগ্রামের নেত্রী শেখ হাসিনা। তার নেতৃত্বেই জিয়াউর রহমান ও এরশাদের স্বৈরশাসনের পতন ঘটিয়ে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লাখ লাখ নেতা-কর্মীর ও কোটি কোটি জনগণের ভালোবাসা নিয়ে ১৯৯৬ সালে প্রথমবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পাঁচ বছর দেশ শাসন করে যে উন্নয়ন তিনি করেছিলেন, স্বাধীনতার পর থেকে তার আগে কেউ তা করতে পারেননি। দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করেছেন। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৫ আগস্ট হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছেন। আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার করছেন।

২০০১ থেকে ওয়ান-ইলেভেনের সময় পর্যন্ত বহু প্রতিকূল পরিস্থিতি শেখ হাসিনাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। ষড়যন্ত্র করে মাসের পর মাস তাকে জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। তার রাজনৈতিক জীবনকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। আমিও তখন বন্দি ছিলাম। আমার সঙ্গে আদালত চত্বরে মাঝে মাঝে তার দেখা হতো। সেই স্বল্প সময়ের দেখাতেও তিনি সাহস জোগাতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি অবশ্যই মুক্ত হবো এবং দেশের মানুষ ও গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দেব।

বঙ্গবন্ধু যেমন তাৎক্ষণিক সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল, শেখ হাসিনারও একই ক্ষমতা রয়েছে। যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ভেঙে না পড়ে ধৈর্যের সঙ্গে তা মোকাবেলার অসাধারণ ক্ষমতার জন্যই তিনি অনন্য ও সবার চেয়ে আলাদা। তাকে ১৯ বার হত্যাচেষ্টা করা হয়েছে। এখনও ঘাতকের বুলেট তাকে তাড়া করে বেড়ায়। দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা সব সময় অতন্দ্র প্রহরীর মতো শেখ হাসিনার পাশে রয়েছেন।

২০০৯ সালে আবারও সরকার গঠন করে তিনি ১৯৯৬ সালের মতো উন্নয়ন করে যাচ্ছে। মাত্র এক দশকে তার নেতৃত্বে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, জ্বালানি, বিদ্যুৎসহ আর্থ-সামাজিক সব খাতে দেশ এগিয়ে চলছে। গুলশান হলি আর্টিসানসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি হামলা তিনি যেভাবে প্রতিহত করেছেন, পৃথিবীর আর কোনো দেশই এত স্বল্প সময়ে তা করতে পারেনি। যে কোনো জাতীয় দুর্যোগ শেখ হাসিনা সরাসরি ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সম্প্রতি অকাল বন্যায় ভেসে যাওয়া হাওরাঞ্চল এবং পরে আবার বন্যাকবলিত উত্তরাঞ্চলের মানুষের কাছে ছুটে গেছেন। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। পরবর্তী ফসল না পাওয়া পর্যন্ত সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। লক্ষ্য করে দেখুন, মিয়ানমার সরকার তাদের দেশের নাগরিক রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করার পর শেখ হাসিনা মায়ের মমতা, বোনের ভালোবাসা-স্নেহ দিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করেছেন।

শেখ হাসিনা মানবতার নেত্রী। ছোট ছোট বিষয়ও তার দৃষ্টি বাইরে থাকে না স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে পারি, বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক ভাগ্যহত মানুষকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে তিনি অকাতরে সাহায্য করেন। জাতির পিতার মেয়ে হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য তিনি যেসব আইন করেছেন, তার সুফল মানুষ পাচ্ছে। শুধু জাতীয় নয়, স্থানীয় নির্বাচন ব্যবস্থাপনাকে তিনি এমন আইনের মধ্যে এনেছেন, যেখানে ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। নির্বাচন কমিশনই সবকিছু।

রাজনীতিতে তিনি কখনোই সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপস করেননি। মৌলবাদী গোষ্ঠী যখনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই তাদের কঠোর হস্তে দমন করেছেন। শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মদিনে লক্ষ কোটি আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীও ও সাধারণ মানুষের মতো আমারও প্রার্থনা, তিনি দীর্ঘজীবী হোন। তার হাত ধরেই বাংলাদেশকে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। সুখী, সমৃদ্ধশালী ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। আরও কয়েক টার্ম শেখ হাসিনার নেতৃত্ব

যদি আমরা পাই, তাহলে বাংলাদেশ সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হতে পারবে।

শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মদিনে বলতে চাই, সবকিছু হারিয়েও শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও শান্তিসহ সবকিছু দিয়েছেন। তাই বাংলাদেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করতে শেখ হাসিনাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যেতে হবে। তাঁর হাত আরও শক্তিশালী করতে হবে। কারণ তার হাতেই রয়েছে বাঙালি জাতির উন্নয়নের শিখরে পৌছার চাবিকাঠি। শুভ জন্মদিন, প্রিয় নেত্রী।

মোস্তাফা জব্বার

শেখ হাসিনা বাংলার স্বর্ণকন্যা

১৯৮৩ সালে আমি মাসিক নিপুণ পত্রিকা প্রকাশ করি। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ গড়ে ওঠে বেগম খালেদা জিয়াকে ঘিরে। নিহত জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নীকে নিয়ে তখনও কোনো পত্রিকায় কোনো ফিচার বা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়নি। নাসির আলী মামুন বেগম জিয়ার ছবি তোলেন এবং কবি অসীম সাহা তাঁকে কেন্দ্র করে প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি করেন। অসীম সাহা বেগম জিয়ার সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলেন। নিপুণের প্রথম সংখ্যাটি সুপার হিট হয়। হাজার হাজার কপি বিক্রি হবার প্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে এপ্রিল ৮৩ সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী করা হবে শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে। শেখ হাসিনার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হলো। জানা গেল যে, তিনি মহাখালীতে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করেন। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎকার ছাড়াতো প্রচ্ছদ কাহিনী হবে না। আমার ওপরই দায়িত্ব পড়ল সাক্ষাৎকার নেবার। আমি তাঁর মহাখালীর বাসায় গেলাম। তিনি খুব সহজেই চিনলেন। বসে আলাপ করা শুরু করতেই আমি আমার পত্রিকার একটি কপি দিলাম এবং সেটিকে নিয়মিত প্রকাশ করবো সেটি জানালাম। প্রসঙ্গত আমি তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের কথা জানালাম। তিনি নিপুণের নাম শুনেই রেগে গেলেন। 'আপনি খুনি জিয়াউর রহমানের মুর্খ বৌটাকে কভার ছবি করেছেন, আর সেই পত্রিকাকে আমি সাক্ষাৎকার দেব? আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করে জানাতে চাইলাম যে পত্রিকাটি রাজনৈতিক নয় এবং খালেদার সাক্ষাৎকারও রাজনেতিক নয়। বস্তুত এটিও বলতে চাইলাম যে আমি আপনার রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, আপনার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। তিনি বললেন, আমি এই পত্রিকার জন্য কথা বলতে পারিনা- আপনি উঠতে পারেন। বুঝতে পারলাম, তিনি ভীষণ রেগে গেছেন। আমি ওঠার ভঙ্গি করে বললাম, কথা না বলেন ভালো কথা, চা খাওয়াবেন না? তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, বসেন। আমি চা বানিয়ে আনি। আমিও বসে গেলাম। তিনি নিজের হাতে চা বানালেন এবং দুজনের হাতে কাপ নিয়ে আমরা ছোটখাটো কথা বলতে শুরু করলাম। অতীতের

স্মৃতি, বাংলা বিভাগের কথা ছাড়াও আমাদের সহপাঠিনী রোকেয়া, মমতাজ আপার কথা হলো। কথা হলো সহপাঠিনী রোকসানাকে নিয়ে। তিনি জানলেন ক্লাসের প্রথম হওয়া রোকসানা আর আমি সংসার পেতেছি। সন্তানদের নিয়ে কথা হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটু রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হলো। আমার আলাপের ধরন দেখেই তিনি বুঝলেন আমি সাক্ষাৎকারটা নেবই। অনেকক্ষণ আলাপ করে ছবি তুলে নিপুণের ৮৩ সালের এপ্রিল সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী করলাম। বাংলা বিভাগের পর শেখ হাসিনার সঙ্গে সেটাই প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ। তারপর মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হতো।

আমার জীবনটাও নানা খাতে প্রবাহিত হতে হতে '৮৭ সালে তথ্যপ্রযুক্তিতে এসে পৌঁছায়। সেই সময়েই শেখ হাসিনা একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি স্থির করেন যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে কম্পিউটারের যুগে প্রবেশ করাবেন। সেই মোতাবেক তিনি আমার প্রতিষ্ঠান থেকে একটি ম্যাকিন্টস কম্পিউটার ও একটি লেজার প্রিন্টার কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমার দায়িত্ব পড়ে শেখ হাসিনাকে বাংলা টাইপং শেখানোর। তিনি তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের কাছ থেকে কম্পিউটারের নানা বিষয় শিখতেন এবং আমি তাকে ইংরেজি কোন বোতামে কোন বাংলা অক্ষর বা কোন যুক্তাক্ষর কেমন করে বানাতে হবে সেটি শেখাতাম। তখন কোনো কোনো সময় তিনি নিজে টাইপ করে দলের প্রেস রিলিজ মিডিয়ায় পাঠাতেন। তখনতো দূরের কথা এরপরও বহু বছর বাংলাদেশের কোনো রাজনীতিবিদ এমন করে কম্পিউটার ব্যবহার করা শুরু করেননি বা কম্পিউটারের সঙ্গে মিতালীও করেননি। তার একটি বাড়তি সুবিধা ছিল যে তার ঘরেই তথ্য প্রযুক্তিবিদ আছে। তারা তাকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল রাজনীতিবিদ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করেন। আমি অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে এটি বলতে পারি যে তিনি একজন প্রযুক্তিমুখী মানুষ বলেই আজ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত গতিতে রূপান্তরের পথের দেশ বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

দিনে দিনে আমি নিজেও তথ্যপ্রযুক্তিতেই অনেক বেশি জড়িয়ে ফেলি। সেই যে ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগ করে মুক্তিযুদ্ধে গেলাম-তারপর সাংবাদিকতা, মুদ্রণ ব্যবসা, ট্রাভেল এজেন্সি এসব নিয়ে কাটিয়ে কম্পিউটারে বাংলা

প্রয়োগ করার ক্ষেত্রটাতেই আটকে গেলাম। বলা যেতে পারে যে, জীবনের পুরো ছকটাই পাল্টে গেল।

মুক্তিযুদ্ধের পর রাজনীতির চাইতে সাংবাদিকতা অনেক বেশি প্রিয় হবার পারও রাজনীতি আমার পিছু ছাড়েনি। পারিবারিকভাবেও আমি আমার রাজনৈতিক বৃত্তে আবদ্ধ থেকে যাই। ৭০ সালে বাবা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত হন। ৭২ সালে খালিয়াজুরী থানা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করা শুরু করেন। ৭৮ সালে বাবার মৃত্যুর পর সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার ও হাসান চৌধুরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ৯৮ সালে ছোট ভাই কিবরিরিয়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতির হয়। তার আগেই আব্দুল মমিন সাহেব আমাদের এলাকার সংসদ সদস্য পদে নির্বাচন করেন। ৯১ সালের নির্বাচনে তিনি হেরে যান। এরপরই কিবরিয়ার মাধ্যমে উনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হতে থাকে। এক সময়ে নেত্রকোণা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে তিনি আমাকে জেলা কমিটিতে যুক্ত করেন। আওয়ামীলীগের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত হওয়াটা তখনই প্রথম। তবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁটছড়াটা বাঁধে পেশার সূত্র ধরে। ৮৭ সালে কম্পিউটারে বাংলা প্রয়োগের পর আমি ৮৯ সালে আনন্দ পত্র বাংলা সংবাদ-আবাসনামে দেশের প্রথম ডিজিটাল সংবাদ সংস্থা গড়ে তুলি। প্রথমে ফ্যাক্সের মাধ্যমে তথ্য পাঠাতাম। পরে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকে যোগাযোগ করা হতো ইন্টরনেট ছাড়া। বাংলাদেশের ডিজিটাল এই সংবাদ মাধ্যমটি দিয়ে আমরা তখন দেশ-বিদেশে তথ্য প্রচার করি। একটি ম্যাকিন্টস কম্পিউটারের সঙ্গে একটি মডেম ও একটি টিএন্ডটি ফোন লাইন ব্যবহার করে আমরা তথ্য আদান প্রদান করতাম। সেই সময়েই জননেত্রী শেখ হাসিনা এক পরম দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৯৬ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে আমি যুক্ত হই আওয়ামী লীগের মিডিয়া টিমের সঙ্গে। সেই টিমেই আমি প্রস্তাব করি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণাকে ডিজিটাল করা যেতে পারে। আমার প্রস্তাব জননেত্রী শেখ হাসিনা সানন্দে গ্রহণ করেন। আমার প্রতিষ্ঠান আবাস-এর মাধ্যমে আমরা প্রথম নির্বাচনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করি। কাজটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। তখন আমাদের নির্বাচনী প্রচারণা যদি ঢাকার বাইরে কোথাও হতো হবে তার খবর পরের দিনের পত্রিকায় ছাপা হলেও ছবি ছাপা হতো আরও একদিন

পরে। তখন হয়তো সেই ছবির গুরুত্বও থাকতো না। মোনায়েম সরকার তখন নির্বাচনী প্রচারণার সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন। আমি তার সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা তখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সিদ্দিকুর রহমানকে একটি স্ক্যানার, একটি ম্যাকিন্টস ও একটি মডেম দিয়ে নেত্রীর নির্বাচনী প্রচারণা টিমের সঙ্গে যুক্ত করে দিই। তখনও আমাদের কোনো ল্যাপটপ ছিল না। ডেস্কটপ ব্যবহার করতে হতো। বিশাল আকারের মডেম বহন করতে হতো। শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা টিমের সঙ্গে আমাদের কম্পিউটার টিমটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমাদের টিম সেখানে শেখ হাসিনার জনসভার ছবি স্ক্যান করে মডেমের মাধ্যমে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতো। আমরা আবাসের মাধ্যমে ঢাকাও ঢাকার বাইরের সকল পত্রিকায় ডিজিটাল ও এনালগ পদ্ধতিতে ছবি পৌঁছে দিতাম।

আমাদের ডিজিটাল প্রচারণায় শেখ হাসিনা কেবল সন্তোষ প্রকাশ করেননি, ৯৭ সালে একদিন প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমাকে ধন্যবাদ নিয়ে জানতে চাইলেন দেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের জন্য তার সরকার কি পদক্ষেপ নিতে পারে। আমি তখন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি। ৯৬ সালে বিসিএস কম্পিউটার শোতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমান এসেছিলেন। আমরা তাঁর কাছে কম্পিউটারকে শুল্কমুক্ত করাসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অন্যান্য করণীয় নিয়ে দাবি পেশ করি। জিল্লুর রহমান সাহেব আমাদের সকল দাবি মেনে নেবার কথা বলেছিলেন। তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন শাহ এ এম এস কিবরিয়া। সেদিন শেখ হাসিনার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন কিবরিয়া সাহেবও ছিলেন। নেত্রী তাকে আগেই বসিয়ে রেখেছিলেন। আমি নেত্রীকে অনুরোধ করলাম কম্পিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট তুলে নেবার জন্য। তিনি আমার কথা শুনেই কিবরিয়া সাহেবের দিকে তাকালেন। কিবরিয়া সাহেব বললেন, আমাদের রাজস্ব আদায় অনেক কমে যাবে। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন অর্থমন্ত্রী তার দিকটাই দেখছেন। আমি নেত্রীকে বললাম, নেত্রী আপনি রাজস্ব দেখবেন না দেশের ভবিষ্যৎ দেখবেন? আজ যদি কম্পিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট তুলে নেন তবে দেশ সামনে যাবে-আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ভালো করব। তিনি কিবরিয়া সাহেবকে শুল্ক ও ভ্যাট তুলে নেয়ার নির্দেশনা দেন। শেখ হাসিনার পরিবার থেকে ইতিমধ্যেই কম্পিউটারের ওপর থেকে

শুল্ক ও ভ্যাট তোলার প্রস্তাব আসে। সেই থেকেই বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি প্রবেশ করে এক নতুন যুগে।

দ্রব্য রপ্তানির বাজার ও পরিমাণ বাড়ছে। বলতে দ্বিধা নেই, হাসিনা সরকারের অধ্যাবসায় সফল হয়েছে' পাটের জন্মসূত্র স্বত্ব পেয়েছি আমরা ভবিষ্যতে উন্নত বিশ্ব যতই পলিথিন পরিত্যাগ করবে, ততই পাটের আঁশ নির্মিত দ্রব্যের কদর বাড়বে। মোটরগাড়ির সিটকভার ও অন্যান্য উপকরণ এখন থেকে পাটের স্বাভাবিক আঁশ দিয়ে তৈরি করতে যে প্রবণতা শুরু হয়েছে, শ্রেষ্ঠ আঁশের অধিকারী বাংলাদেশ সেখানে বড়ভাবে লাভবান হতে পারবে।

ইদানিংকালের শ্রেষ্ঠ যে অর্জনে জনবন্ধু শেখ হাসিনা সন্তুষ্টি পেতে পারেন তা হচ্ছে, দেশি বিভীষণের কুমন্ত্রণা আর বিশ্বব্যাংকের বোকামীপ্রসূত বেয়াদবীকে পায়ে ঠেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী সিদ্ধান্তে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেখ হাসিনার ৭০ তম বর্ষপূর্তিতে দৃশ্যমান পদ্মা সেতুর দুটো অংশ। আরও উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৩৮০০ মেঘাওয়াট এখন তা ১৬০০০ মেগাওয়াট যে সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি নেয়া হয়েছে তাতে ২০১৮ সালের শেষশেষি বিদ্যুৎ হবে। ২০০০০ মেগাওয়াট ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে এল.এ.জি ও এ.পি.জি মিলিয়ে গ্যাসের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটানো হবে। শুরু হবে ১০টি বিশেষ ইকনোমিক জোন বস্ত্রসহ সকল প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপনা। আর উন্নয়নের মডেল পরিবর্তন করে শেখ হাসিনা সরকার সম্বতঃ শিল্পায়ন তথা দারিদ্র্যের বাকিটুকু নিরসন এবং বৈষম্য দূরীকরণে অগ্রণী হবেন। অগ্রাধিকার দেয়া হবে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকী ও মূল্যায়নে।

২৫ বছর পর অর্থাৎ ২০৪০ সালে পারটেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপির হিসাবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ৩৪তম থেকে উন্নতি হয়ে দাঁড়াবে ২৩তম। এ সময়ে আমরা অতিক্রম করে যাব মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপর, অস্ট্রেলিয়ার মতো সচ্ছল দেশকে। এসব সূচক ও তথ্য থেকে বলা যায়, যদি রাজনৈতিক অস্বস্তি না থাকত এবং যদি বিনিয়োগে ব্যক্তি খাতে কাঙ্ক্ষিত গতি লাভ করত তাহলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রূপান্ত র আরও চমৎকার হতো। আমাদের জনসংখ্যাগত বিন্যাস উৎসাহ ব্যঞ্জক।

১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীতে রয়েছে প্রায় ১০ কোটি নারী-পুরুষ। এ শক্তি থেকে কার্যকর সুফল পেতে হলে উচ্চশিক্ষায় যেমন প্রযুক্তির প্রয়োগ আরও বাড়াতে হবে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় আরও বেশি করে যুক্ত করতে হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা। আমাদের জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। উচ্চতর শিক্ষার তাগিদে গ্রাম থেকে শহরে বিপুল মানুষের স্থানান্তর ঘটছে। রাজধানীসহ বড় বড় শহরে এ কারণে অনেক বেশি তরুণের ভিড়। অনেক জেলা শহরেও এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কার্যকর সুশাসন থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা এটাও দেখছি, কোনো কোনো পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ মত পার্থক্য, যা কখনও কখনও সংঘাতে রূপ নেয়। এসব বিষয় দেশের নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট সব মহলের নিবিড় পর্যবেক্ষণে না থাকলে আকস্মিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া অসম্বব নয়। সরকারের দূরদর্শিতা ও আওয়ামী লীগ প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গত কারণেই প্রত্যাশা থাকবে শিক্ষাসহ অন্য পেশাজীবীদের অঙ্গনে যেন সৃজনশীল ও গঠনমূলক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। প্রধানমন্ত্রী এটা অবশ্যই পারবেন এবং এ বিশ্বাস কেবল আমার নয়, দেশ ও দশের কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক মনোভাবে আস্থাশীল প্রতিটি মানুষের।

রশীদ হায়দার

যেতে হবে বহুদূর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্মদিনে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। জননেত্রী শেখ হাসিনা, শুধু আজ নয়, সব সময় আপনার জন্য শুভ কামনা। যেহেতু সব জীবন্ত প্রাণীর মৃত্যু অনিবার্য, সে জন্য একদিন না একদিন, আপনি যখন এই ধরাধামে থাকবেন না তখন আমি জীবিত বা মৃত যে অবস্থায়ই থাকি, যেন দেখতে বা শুনতে পাই, বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতার কন্যাটি দেশের জন্য যা করে গেছেন তার জন্য তিনি এখনো অমর।

মৃত্যুর পরও কোনো কোনো মানুষ বেশি জীবিত থাকেন, যদি সে মানুষ দেশের মানুষ ও মানুষের কথা বলে যান, তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যান, তাদের দুঃখকষ্টে ব্যথা বোধ করেন, তাদের সামান্য আনেন্দেও আনন্দিত হন। মহৎ মানুষের এটাই বৈশিষ্ট্য।

শেখ হাসিনা, আপনার জন্মদিনে আমি আপনাকে 'মানুষের নেত্রী' হিসেবেই চিত্রিত করতে চাই। আরো চিত্রিত করতে চাই 'যেন পাশের বাড়ির মেয়ে' হিসেবে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে বাসরত এম নজরুল ইসলাম ২০১২ সালের ১৭ মে 'শেখ হাসিনা-উদার উভ্যুদয়ের নেত্রী' নামে যে অসাধারণ ও অজস্র তথ্যপূর্ণ সংকলনটি প্রকাশ করেছেন, সেখানে আমি' যেন পাশের বাড়ির মেয়ে' লেখাটিতে একজন বিতর্কিত বুদ্ধিজীবীর কথা ধার নিয়ে বলেছি, মেয়েটিকে ছোটবেলা থেকে দেখছি, জানছি, চিনছি একসাথে খেলা করছি, কারণে-অকারণে ঝগড়া করছি, আড়ি দিচ্ছি, ভাঙছি, আবার যে সেই আগের মতোই মিলেমিশে আপন হয়ে উঠেছি।

বিরুদ্ধ মতবাদী আমার কিছু বন্ধু ও পরিচিতজন আমার ওই লেখায় বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। আমি আমোদিত হয়েছি। জানিয়ে দিয়েছিলাম-সত্যসব সময়ই কঠিন, নির্মম সত্য আরো তিক্ত, মনে জ্বালা ধরায় আঘাতের পর আঘাত পেয়েই তো শেখ হাসিনা, আপনি বেঁচে আছেন সগৌরবে, মাথা উচু করে, দেশের সম্মানকে আরো উন্নত করে। বাইরের সম্মান নিজে থেকেই তো উড়ে আসে। দেশের সম্মান বিকিয়ে দিয়ে আপনি যে রাজনীতি করেন না সেটার প্রমাণ তো আপনি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের

সামনেই দিয়ে দিলেন। আপনি ক্লিনটন সাহেবকে 'গ্যাস দিলেন না। সে জন্য কী খেসারত যে দিতে হবে, সেটা বলে অনেকে আহা-উহু করে কাতর হলেন; কিন্তু এই শতাব্দীর গোড়ায় সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরে গেলে সব দোষ চাপানো হলো আপনার ওপর। যেন অত্মসম্মান, দেশবাসীর প্রয়োজন ও দেশের মান বিকিয়ে দিয়ে বিশ্বপ্রভুকে খুশি করলেই নির্বাচনের সুফলটা উড়ে এসে হাতে ধরা দিত।

পদ্মা সেতুর ঋণ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের ভাঁওতাবাজিতে যখন কিছু লোক চোখে-মুখে দুঃখু দুঃখু অথচ আড়ালে খুশিতে ডগমগ ভাব প্রকাশ করছে তখন আপনি যে সাফ জানিয়ে দিলেন-ঠিক আছে, দেশের টাকাতেই পদ্মা সেতু হবে। শুনেই আমাদের পাড়ার মুদি দোকানদারের কথা-এই না হলে শ্যাখের বেটি!

'শ্যাখের বেটি' বলেই বাংলাদেশ হেনরি কিসিঞ্জারের 'তলাবিহীন ঝুড়ি' মিথ্যা অপবাদ ব্যর্থ প্রমাণ করেছেন, আজ 'ঝুড়িপূর্ণ সম্পদশালী দেশ' হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি পাচ্ছে; বিশ্বের বড় বড় দেশ ও নেতারাও স্বীকার করছেন বাংলাদেশ এগিয়েছে, এগোচ্ছে; ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ,তত দিনে কে বেঁচে থাকবেন আর থাকবেন না সেটা বড় কথা নয়, দেশ যে বিশ্বে নামেই পরিচিত হবে, থাকবে, সেই সত্য অস্বীকার করবেন কে?

দুই.

জননেত্রী শেখ হাসিনা, আপনার জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাব, অভিনন্দন জ্ঞাপন করব, বিশেষ করে আপনার লেখালেখির কারণে, পড়াশোনা জন্য। আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যেও পড়াশোনা-লেখালেখির সময় কোথায় পান? বিভিন্ন সূত্রে, বিশেষ করে ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীরের 'শেখ হাসিনা : ব্যক্তি ও নেতা' শীর্ষক লেখা থেকে জেনেছি, শেখ হাসিনা অবিশ্বাস্যমাত্রায় পরিশ্রমী। সুবেহ সাদেকে উঠে ফজরের নামাজ আদায় ও কোরআন তিলাওয়াত করে তিনি দিনের কাজ শুরু করেন। শেষ করেন রাত ১২ টার পর।' শেখ হাসিনা, আপনি এত সামলান কী করে?

আমরা চাই, বহুবার আপনি মৃত্যুর দুয়ার থেকে, নবজন্ম লাভ করে ফিরে এসে আবার দেশের হাল ধরে আছেন, সেটা যেন ধরেই থাকেন।

এখানেও ওই একই কারণ আপনার জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে Miles to go, কথাটা যদিও আমেরিকান কবি Robert Frost-এর; কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে এর প্রতীকী এবং তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ: এই দুঃখিনী বাংলা মায়ের মুখে একটু হাসি ফোটানোর যে গুরুভার আপনি নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন, যার জন্য মাইলকে মাইল আপনাকে হাঁটতে হবে, আর তা যেন সফলভাবে সম্পাদিত হয় সে প্রার্থনা সব সময় ছিল, আছে ও থাকবে।

দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, আপনিই পারবেন হাঁটতে। কারণ মরহুম আইভি রহমানকে দেখতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের 'শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট' থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার পথ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় হেঁটে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে পৌঁছেও দেখতে পেলেন না, এই দুঃখ থেকে উৎসারিত ক্রোধ মানুষ একদিন না একদিন ঠিকই উপলব্ধি করবে। আপনার জন্মদিনে পুনরায় সার্বিক মঙ্গল কামনা।

বিদেশি বন্ধুদের মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা দিলেন; নতুন বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই দিলেন, জাতিসংঘে পিতার মতোই বাংলায় বক্তৃতা দিলেন, বয়স্ক ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদান করলেন, খেলায় প্রেরণা দিতে ক্রিকেট বা ফুটবল মাঠে গিয়ে উপস্থিত, মাঝে মাঝে নিজ হাতে রান্নাও করেন-কেন করেন? অকপটে বলি, আপনার ওই সব কাজ অনেকেই না পারে সমালোচনা করতে, না পারে প্রশস্তি গাইতে। জ্বালা ও কষ্ট তো ওখানেই।

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

জনগণের নেতা

বাংলাদেশ রাজনীতির ইতিহাসে আওয়ামী লীগের যে অর্জন তা বিশ্বের যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্যই শ্লাঘার বিষয়। সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী-শেখ মুজিবদের হাত ধরে এ দলের হাল এখন মুজিব-তনয়া শেখ হাসিনার হাতে। গণতন্ত্রের পাশাপাশি বাঙালির স্বার্থের পক্ষে আওয়ামী লীগ যে দুর্বার লড়াই গড়ে তুলেছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের পটভূমিতে সে লড়াই পরিণতি লাভ করে বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ ধরে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এরই পাশাপাশি বাঙালির ভাষা বাংলা লাভ করে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা, যা এখন বিশ্ব পরিসরেও একটি পরিশীলিত ভাষা রূপে বিবেচিত। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এবং ভাষা হিসেবে বাংলা আজ বিশ্ব পরিসরে উল্লেখযোগ্য অবস্থান নিয়ে বিরাজ করছে। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার এই অর্জনে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগের অবদান সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আওয়ামী লীগের এই বিশাল অর্জনগুলোর স্তরে স্তরে সংগ্রাম করে নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়ে উঠে এসেছেন প্রতিষ্ঠা লগ্নের তরুণ যুবনেতা শেখ মুজিব। মুজিব ভাই, শেখ সাহেব এবং একদিন বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছেন তিনি। তিনি আওয়ামী লীগকে লড়াইয়ের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন এবং আওয়ামী লীগ তাঁকে একক নেতার পদে তুলে এনেছে। ১৯৪৯ - ১৯৫২ - ১৯৫৪ - ১৯৫৫ - ১৯৫৮ - ১৯৬২ - ১৯৬৫ - ১৯৬৬ - ১৯৬৯ - ১৯৭০ আওয়ামী লীগের ইতিহাসে এক একটি মাইলফলক। অবশেষে ১৯৭১। আওয়ামী লীগ ও এর নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শ্রেষ্ঠ অর্জনের বছর। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। তারপর এক সময় ইতিহাসের দুঃস্বপ্ন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ এবং বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ইতিহাসের পাতা থেকে চির নির্বাসন দেওয়ার উপলক্ষ্যে চরমতম ষড়যন্ত্রের এক ঘৃণ্য ইতিহাস রচনা।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত নানা ষড়যন্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত আওয়ামী লীগ। এই সময়ে দলের কাণ্ডারি হয়ে এলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৮১

সালের ১৭ মে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। দীর্ঘ ছয় বছর প্রবাস জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেশের মাটিতে পা রাখেন রাষ্ট্রপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ তনয়া শেখ হাসিনা। লাখ লাখ মানুষ আবেগ আর ভালোবাসায় বরণ করেন নেত্রীকে। কিন্তু তখন পরিস্থিতি আজকের মতো ছিল না। নানা ষড়যন্ত্র আর ঘাত-প্রতিঘাতকে পেছনে ফেলে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পরিবেশে শোকবিহ্বলচিত্তে মাতৃভূমিতে তাঁর আগমন।

বঙ্গবন্ধু তনয়া থেকে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বগ্রহণ। সাদামাটা চোখে এমনটাই মনে হওয়ার কথা। কিন্তু সেদিন শুধু শেখ হাসিনার নতুন জন্ম হয়নি। পথ হারানো বাংলাদেশেরও নতুন জন্ম হয়। ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যাওয়া দুই বোনের অন্যতম শেখ হাসিনার নতুন কর্মযজ্ঞের সঙ্গে বাংলাদেশেরও নতুন একটি আরম্ভ ওই মুহূর্তেই। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস-সমস্ত বাঙালির ভালোবাসার ছায়ায় যে মুজিবর জাতির পিতা হয়ে ওঠা, সেই পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যার শুরু হলো একলা চলার পালা।

শেখ হাসিনা নির্বাসনে থাকলেও এক সময় ছাত্র রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। জাতির জনকের নেতৃত্বে বাঙালির আন্দোলন সংগ্রাম আর রাষ্ট্র পরিচালনা দেখেছেন তিনি কাছে থেকে। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ের নির্বাসিত জীবনও তাঁকে রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দেয়। অতএব, তিনি রাজনীতিতে একেবারেই নবাগতা ছিলেন না। তাই সভাপতি পদে বৃত হওয়ার পরপরই তিনি স্বদেশের প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের ১৭ মে এক বর্ষণমুখর দিনে তিনি স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন। যেন দেশমাতৃকা তাঁর প্রিয় সন্তানকে কোলে ফিরে পেয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে এবং একই সাথে প্রকৃতি যেন এই দুঃখিনী রাজকন্যার সমব্যথী হয়ে কান্নার জলে তাকে বরণ করে নিচ্ছে।

স্বদেশে ফিরে আসার পর শুরু হয় আওয়ামী লীগের এই নতুন নেতার সংগ্রামের নতুন বন্ধুর পথের অভিযাত্রা। একদিকে পিতার হন্তারক সামরিক স্বৈরতন্ত্রের দোসরদের পদচারণা; অন্যদিকে দলের অভ্যন্তরের উচ্চাভিলাষী নেতা ও গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত। স্বজনহারা শেখ হাসিনা পাড়ি দিচ্ছেন এক

অজানার উদ্দেশ্যে, যার সঙ্গী-সাথীদের অনেকেই বিশ্বস্ত নন। কঠিন কঠোর বন্ধুর এ পথযাত্রা। কিন্তু অবিচল দৃঢ় প্রত্যয়ী শেখ হাসিনা বিভ্রান্তির বেড়াজালে পা দেননি। দেশে ফিরেই নেত্রীকে এক অভিনব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলো।

৩০ মে ১৯৮১-তে স্বৈরশাসক জিয়া নিহত হলেন সেনাবিদ্রোহীদের হাতে। দেশের মাটিতে ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাওয়ার আগেই এই অভিনব ঘটনা, যা তাঁর নেতৃত্বকে শুরুতেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এ সময়টা আমি তাঁকে খুবই কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই। দৃঢ়চেতা, নির্ভীকচিত্ত পিতার মতোই সাহসী পায়ে দাঁড়াতে দেখতে পাই। পরিস্থিতি মোকাবিলা করলেন অবিচলিত থেকে। এ সময়টাই আমি তাঁর নেতৃত্বের সূচনাটা দেখলাম গভীর উৎকণ্ঠায়। সকল দুঃচিন্তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে তিনি উতরে গেলেন এই কঠিন পরিস্থিতি।

প্রথমে গণতান্ত্রিক শাসনের ছদ্মাবরণে বিচারপতি সাত্তারের নৈরাজ্যের শাসন এবং পরে ১৯৮২ এর মার্চে নেপথ্যের কুশীলব জেনারেল এরশাদের স্বমূর্তিতে আবির্ভাব। পরিপূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসন। পাশাপাশি দলের অভ্যন্তরে নানা মত ও পথের উপদলীয় কোন্দল। ক্ষত-বিক্ষত দল। ১৯৮৩-তে এসে শেখ হাসিনা দলের অভ্যন্তরের চক্রান্তে একটি বড় ধরনের সাংগঠনিক ধাক্কা খেলেন। আব্দুর রাজ্জাক ও মহিউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি বড় অংশ দল ছেড়ে চলে যান এবং বাকশাল নাম দিয়ে নতুন একটি দল গঠন করেন। তারও আগে এই উপদলের নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগকে দ্বিধাবিভক্ত করেন এবং জাতীয় ছাত্রলীগ নাম দিয়ে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলেন। বলতে দ্বিধা নেই যে, দলের ভাঙন রোধে শেখ হাসিনা সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। এর সাক্ষী ওবায়দুল কাদের আর আমি। কিন্তু দলের অভ্যন্ত রস্থ কট্টর ডানপন্থীদের কূটকৌশল এবং রাজ্জাকপন্থীদের অনমনীয় ও হঠকারী অবস্থান নেত্রীর সকল প্রকার প্রয়াসকে ভেঙে দেয়। দল ভেঙে যায়। তিনি এ সময়ে খুবই ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন । সারা দেশে হঠকারী বাকশালপন্থীরা তাঁকে আদর্শিক দিক থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করলেও তিনি ধৈর্যহারা হননি। সারা দেশের নেতা-কর্মীদের সাথে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দলকে আঘাতের ঘা থেকে সারিয়ে তুলতে বিরামহীন পরিশ্রম

করতে থাকেন। স্বজনদের ভালো-মন্দের খোঁজখবর বা নিজের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা না করে উদয়াস্ত পরিশ্রমের এক কঠিন সংগ্রামের পথ বেছে নেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বৈরতান্ত্রিক দুঃশাসন আর সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেও বিচলিত এবং বিভ্রান্ত করতে পারেনি। অবিচল ও অভ্রান্ত পথের দিশা ধরে তিনি পিতার আদর্শকে বুকে ধারণ করে এগুতে থাকেন দৃঢ় পদচারণায়।

একাত্তরে লাখো প্রাণের আত্মদান, লাখো নারীর সম্ভ্রমহানি আর বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার স্বাধীন দেশের গণমানুষের ভাগ্যপরিবর্তনের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করলেন শেখ হাসিনা। দলের ভেতরের উপদলকে সামলে তিনি গণমানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন কীভাবে করা যায় সেদিকে মনোনিবেশ করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের হৃদয়ভরা ভালোবাসা। পিতার মতোই সেই ভালোবাসাকে গ্রহণ করলেন। ব্যথিত হৃদয়ে, কিন্তু শক্ত মনোবলে সেদিন শেখ হাসিনা বলেছিলেন, "সব ভেদাভেদ ভুলে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। জয় আমাদের অনিবার্য। আমি নেতা নই, সাধারণ মেয়ে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার একজন কর্মী। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠাই আমার রাজনীতির মূল লক্ষ্য। বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য প্রয়োজন হলে এই সংগ্রামে পিতার মতো আমি ও জীবনদান করতে প্রস্তুত।"

আমরা যারা তরুণ-যুবা তারা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম নিঃশর্ত আনুগত্য ও সমর্থন নিয়ে। যদিও এ সময়টা আমি রাজনীতির বাইরে ছিলাম, তথাপি তাঁর পাশে থেকে তাঁকে সহায়তা করার দায়িত্বকে কর্তব্য জ্ঞান করেছি। ওবায়দুল কাদের, মমতাজ হোসেন, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসেন, আব্দুল মান্নান, জাহাঙ্গীর কবির নানক, শাহে আলম, অসীম কুমার উকিল, সুলতান মনসুর আহমেদ, আব্দুর রহমান প্রমুখ এ সময়টাতে ছায়ার মতো তাঁর সাথে থেকে সহায়তা করেছেন সাংগঠানিক কাজে। জ্যেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে আব্দুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, মহিউদ্দিন চৌধুরী, মোস্তফা মহসিন মন্টু, ড. কামাল হোসেন, আব্দুল জলিল, মোঃ নাসিম, আইভী রহমান, মতিয়া চৌধুরী প্রমুখ নেত্রীকে শক্তি-সাহস

যুগিয়েছেন নিরন্তর। অন্যদের মাঝে টাঙ্গাইলের মান্নান সাহেব, নেত্রকোনার মমিন সাহেবের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা সময় পর্যন্ত শ্রী ফণিভূষণ মজুমদারও তাঁকে সহায়তা করেছন। মিজান চৌধুরী, দেওয়ান ফরিদ গাজী মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু তখন অন্য সংগঠন ও দল করেন আওয়ামী লীগ নামে। সবকিছু মিলিয়ে শেখ হাসিনাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হচ্ছিল এ সময়টা।

১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত স্বৈরাচার-সামরিক সরকারবিরোধী এক দীর্ঘ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন শেখ হাসিনা। অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সমন্বয়হীনতা কাটিয়ে আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যায় তিনি। সংগঠিত করেন হতোদ্যম নেতাকর্মীদের। মৃত্যুকে ছায়ার মতো সঙ্গী করে রাষ্ট্রপিতা যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই বাংলাদেশের কুলাঙ্গারদের ষড়যন্ত্রের নিহত হন জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার সব রকমের চেষ্টাই তারা করেছে। যদিও পারেনি। এই না-পারা তাদের ব্যর্থতা নয়, এটাকে রূখে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা।

মানুষ যে শেষ কথা, পিতার মতো তিনিও এটা মানেন এবং মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তাই অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতার আদর্শ ছড়িয়ে দেন সবখানে। পিতার মতোই তাঁকেও যখন মৃত্যু ছায়ার মতো অনুসরণ করে তখনো মানুষের প্রতি অবিচল আস্তা রেখে লড়াই করে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত ঔদার্য, দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন একজন আদর্শবাদী নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা কখনো অন্যায়ের সাথে আপস করেননি। নেতৃত্বের এক অসম সাহসিকতা ও প্রজ্ঞায় তিনি আজ গণমানুষের নেতা। দেশের যে কোনো সংকটে তিনিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য নেতা।

১৯৯৬ সালে জনগণের সমর্থন নিয়ে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দক্ষতার সাথে দেশ পরিচালনা করে শেখ হাসিনা নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন। পার্বত্য শান্তি চুক্তি, গঙ্গার পানিচুক্তি, গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এই সময়েই শেখ হাসিনার নেওয়া বিশেষ পদক্ষেপ-আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে হতদরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য ও অর্থ বরাদ্দ এবং অন্যান্য

সহযোগিতা মানুষকে অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা করে। প্রথমবারের মতো দেশ খাদ্যে স্বয়সম্পূর্ণতা অর্জন করে। ২০০১ সালে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে। তারা ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করার জন্য এমনসব জঘন্য কাজ করে যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল এবং ঘৃণ্য। ২১ আগস্ট (২০০৪) গ্রেনেড হামলা কেবল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত। সবকিছুই সাহস ও দৈর্য্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেন শেখ হাসিনা। ১/১১-এর মতো কুটিল ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে জনগণের শাসন কায়েম করেন। তারপর জননেত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে যা ঘটছে তা বিস্ময়কর। ১৯৮১ সালের ১৭ মে বাংলাদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যে স্বপ্ন শেখ হাসিনা দেখেছিলেন তা দৃশ্যমান হতে থাকে এ সময় থেকে। শেখ হাসিনাও নিজেকে নিয়ে যান অন্য উচ্চতায়।

২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দ্বিতীয়বারের মতো গ্রহণের পর তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়ায় জাতির পিতা হত্যার বিচার কাজ সম্পন্ন করার আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা। এই দুটো দুরূহ কাজই তিনি নিষ্পন্ন করেন অবিচল দৃঢ়তায়। আদালতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধিতাকে সামাল দিয়ে তিনি এ কাজ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনায় বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়ে অনন্য ও ঈর্ষণীয় অবস্থান তৈরি করেছেন। বিচক্ষণতা ও নেতৃত্বের দৃঢ়তা দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে নতুন যুগে পা রেখেছে। তাঁর হাত ধরে সফলতা এসেছে কূটনীতি, অর্থনীতি ও সামজিক উন্নয়নের মতো সব ক্ষেত্রেই। বাংলাদেশের বন্ধন তৈরি করেছেন বিশ্বব্যাপী। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি পৌঁছে গেছে ৭ দশমিক ২৮ তে। বাস্তবায়ন হচ্ছে ১০০ ইকোনমিক জোন। অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নজরকাড়া সাফল্য হিসেবে দেখা দিচ্ছে পদ্মা সেতু। অথচ এই সেতু নিয়ে কত ধরণের খেলা হয়েছিল। নানা অভিযোগে অর্থায়ন বন্ধ মোড়লদের চোখ রাঙানি, সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সক্ষমতাকে প্রমাণ করেছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। চার লেন মহাসড়ক, উড়ালসড়ক এখন আর স্বপ্ন নয়, রীতিমতো বাস্তবতা। শেখ হাসিনার পরিকল্পনাতেই বাংলাদেশ এখন প্রায় সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল। পাওয়া যাচ্ছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ। তাঁর

প্রযুক্তিবান্ধব কৃষিনীতির কারণেই বাংলাদেশ ইতিমধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পর রপ্তানির সক্ষমতাও অর্জন করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, উন্নয়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন স্থিতিশীলতা। আর এখনকার মতো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বাংলাদেশে নিকট অতীতে দেখা যায়নি।

ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে জলসীমা চুক্তির বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে আন্তর্জাতিক আদালতে। তাছাড়া প্রতি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, কৃষকদের জন্য কৃষিকার্ড, ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা, ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশে হ্রাস, ২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক স্থলসীমা চুক্তির অনুমোদন, দুই দেশের মধ্যে ৬৮ বছরের সীমানা বিরোধের অবসান, মাথাপিছু আয় ১৬১০ ডলারে উন্নীতকরণ এবং ৩৫ বিলিয়ন ডলারের ওপর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তাঁর নেতৃত্বেই সম্ভ হয়েছে। লিঙ্গসমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানোর সূচকে শেখ হাসিনার সাফল্যে বিশ্ব রীতিমতো বিস্মিত। যার স্বীকৃতিস্বরূপ সাউথ সাউথ পুরস্কার পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পেয়েছেন ইউএনএমডিজি পুরস্কারও। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' ও পেয়েছেন তিনি। রোহিঙ্গা ইস্যুতে তাঁর মানবিক ভূমিকা সারা বিশ্বের কাছে সমাদৃত। 'মাদার অব হিউম্যানিটি' হিসেবে তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিতি পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফলতার কথা এখন বিশ্বনেতারা জানতে চান বিভিন্ন ফোরামে। বহুপাক্ষিক সম্মেলনগুলোয় শেখ হাসিনা উপস্থিত হলেই অন্যান্য রাষ্ট্রনায়ক ও সরকার প্রধানরা কাছে এসে অভিনন্দন জানান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রে এমন পরিচিতি বাংলাদেশের আর কোনো নেতা পাননি।

বাংলাদেশ তিনি এসেছিলেন অভিভাবক হীন একজন নিঃস্ব ব্যক্তি হিসেবে। আর তিনিই আজ লক্ষ কোটি নিঃস্ব মানুষের ভরসাস্থল এবং অসহায় মানুষের অভিভাবক। কর্মী থেকে রাষ্ট্রনায়কে উত্তরণের এই পথ পরিক্রমায় স্নেহময়ী এই জননীয় একজন দৃঢ়চেতা সাহসী সেনাপতি হিসেবে

নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশ এবং আওয়ামী লীগকে। পিতার যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর কন্যা এক অনন্য ব্যক্তি হিসেবে এবং আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে ইতিহাসের পাতার স্থান করে নিয়েছেন। তাই তিনি আজ জনগণের নেতা। তিনি শেখ হাসিনা। তাঁর জয় হোক।

শামসুজ্জামান খান

বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে শেখ হাসিনা

সম্প্রতি একজন মিশরীয় রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও গবেষক আরবি ভাষায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একখানি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই লেখকের নাম মোহসিন আল আরিশি। জীবনী গ্রন্থখানির আরবি ভাষায় যে নাম দিয়েছেন তার বাংলা করলে অর্থ দাঁড়ায়, শেখ হাসিনা : যে রূপকথা শুধু রূপকথা নয়। তিনি যা লিখেছেন তার মর্মার্থ হলো, কোনো সন্দেহ নেই যে ১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখে যে শিশুটির জন্ম হলো পরবর্তী ইতিহাসে সে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এবং বাঙালি জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে সে বিষয়টি। আসলে শেখ হাসিনার বেড়ে ওঠা যেন এক নতুন রূপকথা। তবে প্রচলিত রূপকথা আঙ্গিক ও মর্মে নয়, এ রূপকথায় পরতে পরতে থাকবে তাঁর পিতার সঙ্গে গভীরতার সখ্য এবং সেই সঙ্গে পিতার রাজনৈতিক জীবনের অঙ্গীকার পালনের ফলে স্বৈরশাসকের নিষ্ঠুরতায় দীর্ঘ কারাজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত কন্যা যেন পিতাকে জেল থেকে মুক্ত করে এনে তাঁর স্বপ্নসাধ পূরণে পেছনে দাঁড়াতে পারে। পিতার দীর্ঘ সংগ্রাম ও দৃঢ় অঙ্গীকার এবং দেশের নিপীড়িত-নির্যাতিত, অধিকারবঞ্চিত মানুষের ভালোবাসায় যখন তিনি বিজয়ী বীরের বেশে বাঙালির দু'হাজার বছরের স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ করে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করেছেন তখনই এলো দেশদ্রোহীদের এক ভয়ঙ্কর বিনাশী আঘাত। বিদেশে অবস্থানের কারণে বেঁচে যাওয়া শুধু দুটি বোন ছাড়া পরিবারের আর সবাই নির্মমভাবে নিহত হলেন। এই ভয়াবহ ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই শেখ হাসিনা যেন হয়ে উঠলেন একে অনন্য ব্যক্তিসত্তা। পিতার জীবনব্যাপী ত্যাগ, তিতিক্ষা ও লক্ষ্যভেদী সংগ্রামে সৃষ্টি বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশকে তাঁরই স্বপ্নের বাংলাদেশে পরিণত করার জীবনপণ সাধনা।

দুই

১৯৭৫ এর আগস্টে দেশি-বিদেশি চক্রান্তে সৃষ্ট মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক

বাংলাদেশকে পাল্টে দিয়ে জিয়াউর রহমানের পাকিস্তানি ধাঁচের স্বৈরসামরিক রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণের প্রয়াস চলে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি জানতেন দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মৃতিতে ধরে রেখেছে। এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটি যে ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মুখে পড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং পতিত হয়েছে দুঃশাসনের চক্রাবর্তে। সেই জায়গায় তাঁকেই রুখে দাঁড়াতে হবে এবং সেজন্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিলেন কিন্তু দেশের স্বৈরাচারী শাসকরা তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি নয়, নানা কুটচক্রান্তে তাঁর জীবননাশের উপক্রমও করা হলো। এ অবস্থায় তাঁর দেশে ফেরা নিয়ে ১৯৮১ সালে ৫ই মে বিখ্যাত নিউজ উইক সাময়িকী এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলেছিলেন, প্রবল স্বৈরাচারী শাসকদের বিরোধিতার মুখে আপনার দেশে ফেরা কি ঝুঁকিপূর্ণ হবে না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সাহসিকতা এবং ঝুঁকি এই দুই-ই জীবনের কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শর্ত। প্রকৃতপক্ষে, জীবন ঝুঁকি নিতে না পারলে এবং মৃত্যুকে ভয় করলে জীবন মহত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি জানতেন দেশে ফেরা দেশকে নতুন করে বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল জাতিরাষ্ট্র রূপ দেওয়া সহজ হবে না। তবুও তাঁকেই তো এ কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ, তিনি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির রক্তের উত্তরাধিকার বহন করছেন। তাঁকেই তো হতে হবে পিতার মতো সহসী, দৃঢ় অঙ্গীকারদীপ্ত এবং লক্ষ্যভেদী। তিনি এ-ও জানতেন দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর মতো তাঁকেও ভালোবাসে। তিনি শক্ত হতে নেতৃত্ব দিতে পারলে গোটা দেশবাসী তাঁর পেছনে কাতারবন্দি হবে। সত্যিই তাই হয়েছিল। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে যখন তিনি দেশে ফিরে এলেন সেদিন ছিল ঝড় এবং প্রবল বৃষ্টিপাত। তবুও গোটা ঢাকা শহর বৃষ্টির ঢলে নয়, মানুষের ঢলে ভেসে উঠেছিল। সেদিন তিনি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না করলে এতদিনে দেশ পুরোপুরি পাকিস্তানের মতো স্বৈরাচারী ও ধর্মপ্রবণ রাষ্ট্রে পরিণত হতো। শেখ হাসিনা সে অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছেন এবং বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় অভিষিক্ত করেছেন। এ তাঁর এক অনন্য গৌরবকথা।

শেখ হাসিনা সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তে দেশে ফেরার আগে তাঁর ভবিষ্যত কর্মপন্থা কী হবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক যে করেছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনিতেই রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি পুরোপুরি রাজনীতি এবং বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি তাঁর কলেজে নির্বাচিত সহ-সভাপতিও ছিলেন।

তিনি নিজেও সে কথাটি বলেছেন এভাবে 'রাজনীতি আমার রক্তে মেশানো... জন্মের পর থেকে আমি কর্মচঞ্চল রাজনীতি পরিবেশের মধ্যে ছিলাম... রাজনীতির জন্যই মা-বাবা, ভাই ও আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছি। অতএব, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রমিক উদ্যোগ যে গ্রহণ করবেন সেটাই ছিল স্বাভাবিক। প্রথম কর্তব্য হিসেবে তিনি আওয়ামী লীগকে নতুন পরিস্থিতিতে যুগপোযুগী করে গঠন করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং যথারীতি কাউন্সিলের মাধ্যমে পার্টির-সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আর এক সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধেও তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালে ২১ বছর পর তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল ভোটে সরকার গঠনের সুযোগ পায়। সেই থেকে তাঁর নেতৃত্বে যখনই বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনই বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সুশাসন এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করে যথপোযুক্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। এ বিষয়টি খুব সহজ ছিল না। শেখ হাসিনার দৃঢ়তা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাকারী শক্তির সহায়তায় তাঁর সরকারের পক্ষে এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়। যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যাকারীদের এ বিচারের মধ্যদিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ তার মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সত্তার সন্ধান খুজে পেয়েছে।

তিন

দেশে এখন যে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা সৃষ্টি হয়েছে তার কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কেই স্থিত হয়নি সাম্প্রতিক তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নের এক বিস্ময়কর নজিরও সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য বিশ্ববিখ্যাত

অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতি বিশ্লেষকরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সম্প্রতি আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে, শিশু মৃত্যুর হার সহনীয় মাত্রায় নেমে এসেছে, তেমনি মাথাপিছু বার্ষিক আয়ও ১৭৫২ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ফলে আমাদের দেশটি এতদিন নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে চিহ্নিত হলেও এখন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর উন্নয়নের ফলে শেখ হাসিনা আজ বিশ্বনন্দিত নেতৃত্বের আসনেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সেজন্যই বিশ্বে যে-কোন উচ্চ পর্যায়ে সম্মেলন বিশ্ব নেতাদের সমাবেশে তাঁর উপস্থিতিও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের জন্য এক অসামান্য অর্জন। তিনি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণের লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যে বিপুল বাজেট বরাদ্দ দিয়ে আসছেন তার ফলে নিচের দিক থেকেই এক সামগ্রিক সামাজিক অগ্রগতির সূচনা হয়েছে। দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহসী সিদ্ধান্ত এবং সুচিন্তিত কর্মপন্থা বাংলাদেশের অগ্রগতিকে এক ভিন্নতর উচ্চতায় স্থাপন করেছে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে অনেকেই সাহসী সিদ্ধান্তে বিশ্ব পরাশক্তি বা বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তির দম্ভকে উপেক্ষা করে থাকেন। শেখ হাসিনাও সেই রকম দার্ঢ্যেই পদ্মা সেতুর অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের টালবাহানা ও ছল ছুতোকে প্রত্যাখান করে নিজ শক্তিতেই পদ্মা সেতু নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। বিশ্বব্যাংকের সাহায্য ছাড়াই বাংলাদেশে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই সেতু নির্মিত হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আর এক ধাপ উল্লম্ফন ঘটবে।

বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রেও এক নব বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। ফলে মঙ্গা কবলিত রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলসহ গোটা দেশ এক কৃষি বিপ্লবের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং নানা রকম প্রণোদনার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে এই উজ্জ্বল সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে তথ্য-প্রযুক্তি, গণযোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্র ও উপক্ষেত্রেও অগ্রগতির নবধারা সূচিত হয়েছে। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়ে ২০০৮ সালে নির্বাচনে বিজয় লাভ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি শুধু হয়নি, এ ক্ষেত্রে এক নব ইতিহাস সৃষ্টি করে আমরা মহাকাশে

বঙ্গবন্ধু-১ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম হয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা এখন বিশ্বের ৫৭তম স্যাটেলাইট সংস্কৃতির অধিকারী হিসেবে নবকৌলিন্য লাভ করেছি। অন্যদিকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আমরা আমাদের সমুদ্রসীমার অধিকার আইনগতভাবেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এত অল্প সময়ের মাধ্যমে এত দিকে এত অর্জন বিশ্বের আর কোনো দেশই করতে সক্ষম হয়নি। শেখ হাসিনার অনন্য সাধারণ নেতৃত্ব এবং দূরদৃষ্টির জন্যই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়।

চার

সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা গণহত্যা, ধর্ষণ এবং জাতিগত বিলুপ্তির মুখে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। নথিপত্রে এদের সংখ্যা ১০ লক্ষ বলে বলা হলেও বাস্তবে এ সংখ্যা অনেক বেশি। এই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর এক বিরাট চাপের সৃষ্টি করেছে। সামাজিক নিরাপত্তাসহ নানা ধরনের জটিল সমস্যাও এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। পরিবেশেরও অবনতি ঘটছে। এই সবকিছু জেনেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু মানবিক কারণে এই বিপুল সংখ্যক অসহায় মানবগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়েছেন। এ তাঁর মহানুভবতা এবং অসহায় মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসারই নিদর্শন। কারণ তিনি জানেন মানুষ মানুষেরই জন্যে। গোটা ইউরোপের দেশে দেশে বহু দেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ কিন্তু শেখ হাসিনা উদার হৃদয় নিয়েই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অপমানিত মানুষকে মৃত্যু ও দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। এই মহানুভবতার জন্য বিশ্বে তিনি নন্দিত হয়েছেন এবং তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য আমরা মনে করি তাঁর এই অসাধারণ মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য এ বছরে তাঁকেই শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত। এ বছরে এক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই।

পাঁচ

দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনীতিতে শেখ হাসিনার তুলনীয় আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জনকারী আর কোনো নেতার সাক্ষাৎই আমরা পাইনি। ১৯৯৭ সাল থেকে শেখ হাসিনা তাঁর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এবং বহুমুখী অর্জনের জন্য এ পর্যন্ত ২৮টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও পদক অর্জন

করেছেন। এর মধ্যে আছে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়নস অব দি আর্থ পুরস্কার, সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ জাতিসংঘ পুরস্কার, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন ও তথ্য-প্রযুক্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার, মাদার অব হিউম্যানিটি পুরস্কার। এছাড়াও তিনি রাজনীতিতে নারী-পুরষের বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য উইমেন ইন পার্লামেন্ট গ্লোবাল এওয়ার্ড লাভ করেন। ২০১৪ সালে নারী ও শিশু শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কো শান্তি বৃক্ষ পদকে ভূষিত হন। ২০১৩ সালে খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুধা এবং দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদানের জন্য লাভ করেন। জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন এবং সর্বশেষ সম্প্রতি অর্জন করেছেন গ্লোবাল উইমেন'স লিডারশিপ এওয়ার্ড। তাঁরই এ ধরনের পুরস্কারপ্রাপ্তির সংখ্যাটি দীর্ঘ। তাই আমরা গোটা তালিকা উদ্ধৃত করছি না।

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উন্নয়নের দর্শন সম্পর্কে বলেছেন, রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে... রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিযোগিতা হবে অর্থনৈতিক দলগুলোর প্রতিযোগিতা হবে অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে। সামাজিক কর্মসূচির নিয়ে... কে কত ভালো কর্মসূচি দিতে পারে। কোন দলের কর্মসূচি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে বেশি ফলপ্রসূ জনগণ তা বিচার করার সুযোগ পাবে। আন্দোলন হবে সমাজ সংস্কারের জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। আর এ উন্নয়ন মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য নয়। উন্নয়ন হতে হবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য এবং রাজনীতি হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি।

শেখ হাসিনা

বিবিসিতে সাক্ষাৎকার

জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে কাজ করছি

বিবিসি : মানবাধিকারের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাবোধ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে মৌলিক সংহতি ও সততা এই দুই ক্ষেত্রে সরকারের একাগ্র অবস্থান প্রত্যাশা করে আপনার দেশের মানুষ। কিন্তু আমরা আপনার সরকারের মধ্যে এর প্রতিফলন দেখছি না।

প্রধানমন্ত্রী : দেখুন, আমাদের দেশ দীর্ঘকাল সামরিক শাসনাধীন ছিল। সামরিক বাহিনী সমর্থিত সরকার শাসন করেছে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার শাসন করেছে এবং তারা সবাই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আপনি কি রাতারাতি এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন? না, আপনি পারবেন না। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে আমার সরকার কোনো দুর্নীতিতে জড়িত থাকলে দেশের এত বড় অগ্রগতি কীভাবে সম্ভব হলো? বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও আমাদের জিডিপি ৬%-এর ওপরে। আমরা সাক্ষরতার হার বাড়িয়েছি, আমরা জ্বালানি উৎপাদন বাড়িয়েছি। আমরা দেশের উন্নয়ন করছি এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছি। কীভাবে আমরা এটা করলাম?

বিবিসি : আপনার অর্থনীতিতে উন্নতি ঘটছে... প্রবৃদ্ধির অঙ্ক সন্তোষজনক... কিন্তু প্রশ্ন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে যে টাকা আসছে তা আসলে কাকে লাভবান করছে...

প্রধানমন্ত্রী : না না... অবশ্যই নয়... আমরা আমি রাজনীতি করছি আমার মানুষের জন্য... আমার লাভের জন্য নয়...

বিবিসি : এটি যদি সত্য হয় প্রধানমন্ত্রী, তবে বিশ্বব্যাংক কেন পরিচ্ছন্ন গভর্ন্যান্স দিতে না পারার কারণে আপনার সরকারের ওপর আস্থা হারাল? আমাদের আলোচনার বিষয়টিকে আরও একটু স্পষ্ট করি। আপনার দেশের খুব গুরত্বপূর্ণ একটি অবকাঠামো নির্মাণে বিশ্বব্যাংক এক বিলিয়নের বেশি ডলার অর্থায়ন করতে চেয়েছি... বিগত বহু বছর ধরে যে কাজের প্রতীক্ষায় ছিল সেই পদ্মা সেতু প্রকল্পে। তারা অর্থায়নের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে

নিয়েছে। কারণ তারা চুক্তি নিয়ে দূর্নীতি বিষয়ে আপনার সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিল... তারা পদক্ষেপ দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু আপনারা যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেগুলোকে তারা সন্তোষজনক মনে করেনি...

প্রধানমন্ত্রী : তারা হঠাৎ করেই বিষয়টি উঠিয়েছিল। তখন আমি এবং আমার অর্থমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রমাণ দিতে বলি। কিন্তু দুর্নীতি হয়েছে এমন কোনো যথার্থ প্রমাণ দেখাতে পারেনি তারা। তারা পারেনি এবং মুল ব্যাপার হলো...

বিবিসি : দুঃখিত... পদ্মা সেতু প্রকল্পে চুক্তি করতে গিয়ে কোনো দূর্নীতি হয়েছে এটি কি আপনি অস্বীকার করতে চাচ্ছেন?

প্রধানমন্ত্রী : অবশ্যই, অবশ্যই শুনুন...

বিবিসি : সেক্ষেত্রে আমি বিভ্রান্ত, কেননা জড়িত বলে যে মন্ত্রীর কথা উঠেছে তিনি সম্প্রতি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেছেন, সেটা কেন? যদি খারাপ কোনো কাজ না-ই হবে তবে তিনি এটি কেনো করলেন?

প্রধানমন্ত্রী : অনেকেই তাকে অভিযুক্ত করা শুরু করেছিলেন বলে তিনি পদত্যাগ করেছেন। তিনি সাহসী কাজ করেছেন। এই দূর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকলে তিনি হয়তো পদত্যাগ করতেন না।

বিবিসি : প্রশ্ন হলো, এই বিশেষ প্রকল্পে, সরলভাবে...

প্রধানমন্ত্রী : না না, এই প্রমাণ করতে দিন...

বিবিসি : বিশ্বব্যাংক বিষয়টি জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিল তাতে দূর্নীতি বিষয়ে অন্তত ৪টি দফাওয়ারি বিবরণ ছিল। আসলে তারা কী বলতে চেয়েছিল তা বাংলাদেশের মানুষকে জানানোর জন্য এখন আপনারা সে চিঠিটি প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু আপনি বারবার সেটি করতে অস্বীকার করছেন, কেন আপনারা চিঠিটি প্রকাশ করছেন না?

প্রধানমন্ত্রী : আপনি সেটি করতে পারেন না, কেননা নিষেধাজ্ঞা আছে।

বিবিসি : না। বিশ্বব্যাংক এটা করতে পারলে খুশি।

প্রধানমন্ত্রী : না, এটা ঠিক নয়। তারা এটা করতে পারে না।

বিবিসি : অবশ্যই তারা পারে, তারা বলেছে...

প্রধানমন্ত্রী : তাহলে তাদের প্রকাশ করতে বলুন।

বিবিসি : কিন্তু তারা বলেছে, তারা প্রকাশ করতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী : কেন? কেন পারে না?

বিবিসি : কারণ এভাবেই বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক কাজ করে। আপনাদের অধিকার আছে, তাদের নেই।

প্রধানমন্ত্রী : শুনুন, আপনি যে কারও দিকে আঙুল তুলতে পারেন, বিরোধীরা এটি করতে পারে। এটা বিরোধীদের কাজ। আমার পয়েন্ট হলো, আমাদের দূর্নীতি দমন কমিশন ইতিমধ্যেই এটি নিয়ে তদন্ত করছে। তারা বিশ্বব্যাংককে সব কাগজপত্র পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, যদি তাদের হাতে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ থাকে তবে তারা তাদের কাছে থাকা কাগজপত্র পাঠাতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে কেন? তারা এগুলো দিচ্ছে না, আমি ব্যক্তিগতভাবে এগুলো চাই। প্রথমে তারা দুটি চিঠি আমাকে পাঠিয়েছে, সেগুলো আমার সরকার বা মন্ত্রীদের বিষয়ে চিঠি ছিল না। আমি দেখেছি সেগুলো ছিল আগের সরকার সম্পর্কিত। তাহলে আপনি আমাকে প্রমাণ দেন। তারা দু'বার এটি করেছে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি। তাই কোনো অকাট্য প্রমাণ ছাড়া অযথা আপনি কাউকে অভিযুক্ত করতে পারেন না এটি গুরুত্বপূর্ণ।

বিবিসি : প্রধানমন্ত্রী, আমি এভাবে বলি এটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য যাদের অনেকেই নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত, তাদের জন্য হয়তো অনেক লজ্জার কারণ হয়েছে। কেননা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক খুব খারাপভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এটাও হয়তো বাংলাদেশের মানুষের লজ্জার কারণ হয়েছে যে, আপনার দেশের সবচেয়ে সম্মানিত বিজনেস লিডার নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আপনার সম্পর্কও খুব খারাপভাবে উপস্থাপিত হয়। আপনি কেন তাকে গরিবের রক্তচোষা বলেন?

প্রধানমন্ত্রী : আপনি বাংলাদেশে যান, নিজের চোখে দেখুন, দেখতে পাবেন। কিন্তু কীভাবে তিনি বলেন এটা আমি বলেছি? আমি কি তার নাম বলেছি। আমি বলিনি। আমি কেন একজনের কথা বলেছি। আমি বলিনি। আমি কেউ একজনের কথা বলেছি। কিন্তু এটা কেন আপনার মনে এলো...

বিবিসি : দুঃখিত। তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাক। মুহাম্মদ ইউনূসকে যে আপনি গরিবের রক্তচোষা বলেছেন, সেটি কি আপনি অস্বীকার করতে চাইছেন?

প্রধানমন্ত্রী : না, আমি কিছুই অস্বীকার করতে চাচ্ছি না। আমি প্রশ্নটা তুলতে চাচ্ছি, কেন আপনার মাথায় এলো যে এটি তিনি? কেন?

বিবিসি : আমি বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম পড়েছি। তাতে মনে হয়েছে সেখানে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেছে আপনি তাকেই সরাসরি নির্দেশ করেছেন 'গরিবের রক্তচোষা কথাটির মাধ্যমে। আপনি যদি কথাটি প্রত্যাহার করতে চান বা আমাকে বলেন আপনি এ কথার মধ্যদিয়ে তাকে বোঝাননি, তবে সেটি ভালো।

প্রধানমন্ত্রী : শুনুন, শুনুন আমি একটা কথা বলি। গরিব মানুষের কাছ থেকে ৪০%, ৩০% বা ৪৫% সুদ নেওয়া কি ন্যায্য? না, নয়। কীভাবে এই গরিব মানুষরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে? আপনি যদি টাকা দিয়ে ৩৫ থেকে ৪৫% সুদ নেন তবে সেটি লজ্জার।

বিবিসি : তাহলে গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস যে মডেলটি তৈরি করেছেন, দরিদ্র লোকদের দারিদ্র্যমুখ করার উপায় হিসেবে যেটি বিশ্বজুড়ে প্রশং সিত হয়েছে-আপনি বলছেন সেটিকে আপনি গ্রহণ করছেন না, আপনি সেটি চান না?

প্রধানমন্ত্রী : আমি চাই, এর ফলে কত লোক দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে তা জানার জন্য একটি তদন্ত হোক। যদি একটি গ্রাম ধরা হয় তবে সেখানে কত মানুষ দারিদ্রমুক্ত হয়েছে? দারিদ্র্য দূর করেছে আমার সরকার। তিনি বছরের মধ্যে আমরা ১০% দারিদ্র্য দূর করেছি। ফলে এটি আমাদের সরকারের সাফল্য এবং এই গ্রামীণব্যাংক একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান... এটা সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিবিসি : এটা কি সত্য নয় যে, ২০০৭ সালে একটি রাজনৈতিক দল করার উদ্যোগ নেওয়ার পর আপনি মুহাম্মদ ইউনূসকে গ্রামীণ ব্যাংকে তার ভূমিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং এ কারণেই আপনি তার বিরুদ্ধে গিয়েছেন ?

প্রধানমন্ত্রী : শুনুন আমি তখন অন্তরীণ ছিলাম। তিনি যখন রাজনৈতিক দল করার উদ্যোগ নেন তখন আমি জেলে। তিনি এত বড় ব্যক্তি, কিন্তু কেন তিনি ব্যর্থ হলেন? তার সব সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি কেন নিজের দল গড়তে পারলেন না? আপনি কি এ কথা এখনও ভেবেছেন? আমি আপনাকে বলছি আমি তাকে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে বের করিনি, তিনি নিজেই এটি

করেছেন। গ্রামীণ ব্যাংক আইন অনুসারে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত থাকতে পারেন। তার বয়স কত? তিনি ৭১ বছর বয়স্ক।

বিবিসি : তিনি একজন বিখাত বাংলাদেশী...

প্রধানমন্ত্রী : তার বয়স তাকে অনুমোদন দেয় না। তিনি আদালতে গিয়েছিলেন। তিনি সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। তিনি এই বিষয়টি নিয়ে মামলা করেছিলেন কিন্তু হেরে গেছেন।

বিবিসি : আপনি যখন খালেদা জিয়াকে নিয়ে কথা বলেন, একটা বিদ্বেষও বিভেদের সুর প্রকাশিত হয়... সেটি বলে দেয় বাংলাদেশী সমাজকে একত্রীভূত করার উদ্যোগে আপনি সফল হননি।

প্রধানমন্ত্রী : আমার দেশ একতাবদ্ধ । আপনি যদি নির্বাচনের ফল দেখেন, তবে এ কথা বিশ্বাস করবেন।

বিবিসি : গত ১২ মাসে আপনি দেখেছেন আপনার দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে, বিরোধী দল হাজার হাজার মানুষকে রাস্তায় নামিয়েছে, আপনি দেখেছেন বিরোধীরা বলছে, তারা হয়তো আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে না। কারণ, আপনি সংবিধানে যে পরিবর্তনগুলো ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, এটি তাদের কথা...

প্রধানমন্ত্রী : অবশ্যই নয়, আমরা সংবিধান সংশোধন করেছি জনগগের গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখার স্বার্থে, জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য, যাতে আগামীতে অসাংবিধানিক ও স্বৈরাচারী সরকার আসতে না পারে। তারা অবৈধভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারবে না, এটাই আমার সংবিধানে নিশ্চিত করতে চেয়েছি। এভাবেই আমরা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করেছি।

বিবিসি : শেষ করার আগে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে আপনার একটি দীর্ঘমেয়াদি বাধা আছে। দলের রাজনীতি থেকে অনেক দূরের একটি মৌলিক সমস্যা আপনাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। সেটি জলবায়ু পরিবর্তন। এখন আপনার দেশে বিশেষজ্ঞরা আছেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের মতে, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা

বৃদ্ধির ফলে ৩০% বাংলাদেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই অনিবার্য বিপর্যয় বোধে আপনার কৌশলগত পরিকল্পনা কী?

প্রধানমন্ত্রী : ইতিমধ্যেই আমরা মোকাবেলার কৌশল গ্রহণ করেছি। আমরা বিদেশি সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছি না। আমাদের নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে আমরা মোকাবেলার মনোভাব নিয়ে কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে আর আমাদের অঙ্গীকার রয়েছে। আমরা খুব অল্প পরিমাণ ফান্ড পাচ্ছি, বিশ্ব থেকে আমাদের আরও সাহায্য দরকার। যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী তাদের আরও সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসা দরকার। কেননা, আমরা ভুক্তভোগী, আমাদের জনগণ সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী। তাদের এগিয়ে আসা উচিত, ফান্ড দেওয়া উচিত যাতে আমরা আমাদের জনগণকে সহায়তা দিতে পারি। আপনি দেখতে পারেন আমরা কী করেছি এবং সেটি আমাদের মানুষকে রক্ষা করতে শুরু করেছে। দেশকে রক্ষার জন্য আমরা সবুজ বেষ্টনী তৈরি করতে শুরু করেছি, আমরা নদী খনন করতে শুরু করেছি, সাইক্লোন শেল্টার বানাতে শুরু করেছি, বন্যা আশ্রয়ণ কেন্দ্র তৈরি করতে শুরু করেছি। দক্ষিণাঞ্চলে ইতিমধ্যে অনেক কাজ শুরু হয়েছে।

বিবিসি : আরেক প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী। আপনি পরিবর্তন আনতে পারবেন এই আশাবাদ সহকারে নির্বাচনে সুদৃঢ় জয় পাওয়ার পর আপনি ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। আপনি কি মনে করেন পরিবর্তন হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী : ইতিমধ্যেই আমরা কাজের পরিকল্পনা নিয়েছি। কিছু পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি, কিছু স্বল্পমেয়াদী- আমাদের রূপকল্প আছে, রূপকল্প ২০১১। ইতিমধ্যে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, গতিশীল উন্নয়নের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং ২০২১ সাল নাগাদ আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। আমি মনে করি, আমি পরিবর্তন আনতে পারব, কারণ আমার রাজনীতি জনগণের জন্য। আমি শুধু আমাদের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনার জন্য রাজনীতি করি না, আমি চাই জনগণের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত হোক, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হোক এবং এটি করতে আমি কাজ করে চলেছি। আমি বিশ্বাস করি, শুধু আমিই সেটি করতে পারব।

বিবিসি : আপনি যেভাবে বললেন, 'শুধু আমিই সেটি করতে পারব' এ থেকে আমার মনে আরেকটি প্রশ্ন এলো। বাংলাদেশে আপনার ও খালেদা জিয়ার মধ্যে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব চলছে। ফলে বাংলাদেশে সবচেয়ে ভালো হলো ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনা করা। নতুনদের জন্য মঞ্চ ছেড়ে দিন।

প্রধানমন্ত্রী : যদি জনগণ চায়।

বিবিসি : আপনি আবার দেশ পরিচালনা করতে চান?

প্রধানমন্ত্রী : অবশ্যই, আমি করব। যদি আমার জনগণ আমাকে অনুমোদন দেয়। আমি আমার জনগণের জন্য রাজনীতি করি, আমার দলের জন্য রাজনীতি করি। আমি আমাকে বোঝাচ্ছি না, আমার দলকে বোঝাচ্ছি।

শেখ রেহানা

আমার হাসু আপা

শেখ হাসিনা আমাদের পরিবারের বড় মেয়ে। আমরা তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সে বড়। আমাদের সকলের প্রিয় হাসু আপা। আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। তার কোলে চড়েই আমি বড় হয়েছি।

আমাদের পারিবারিক বন্ধনটি আনন্দময় ছিল। বিশেষ করে আমার মায়ের শাসন, আদর-যত্ন ও ভালোবাসার কোনো তুলনা খুঁজে পাই না। আব্বা রাজনীতি এবং সভা ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অধিকাংশ সময় তাঁকে রাজবন্দি হিসেবে দেখেছি। কারাগারে যখন তাকে সাক্ষাতের দিন দেখতে যেতাম, তার আদর-স্নেহে আমাদের জড়িয়ে রাখতেন। যখন খুব ছোট্ট ছিলাম, আমাকে কোলে বসিয়ে রাখতেন। যখন স্কুলে পড়ি তাকে দেখতে গিয়ে অনেক খবর জানতাম। কত কথা বলতাম। মাথায় হাত বুলিয়ে কত কথা বলতেন, সেদিন চিঠি লিখে পাঠাতাম। আব্বার অনুপস্থিতিতে মা ও হাসু আপা আমাদের কাছে এক বিরাট বটবৃক্ষের মতো ছিলেন। আমাদের চাওয়া-পাওয়া তারাই মেটাতেন। শিশুকাল থেকেই মা আমাদের গল্প শুনাতেন জীবনে ভালো হয়ে চলার জন্য অনেক কথা শেখাতেন। তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। হাসু আপা তাঁর কাছ থেকে এ শিক্ষাটা মনে হয় উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন।

আমাদের বাড়িতে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। হাসু আপা ছায়ানটে বেহালা বাজানো শিখতেন, কামাল ভাই সেতার শিখতেন, জামাল ভাই গিটার শিখতেন এবং আমি শিখতাম গান ও নাচ। বাড়িতে আমরা খেলাধুলা করতাম। আমাদের মধ্যে সাইকেল চালানো প্রতিযোগিতা হতো আমরা সবাই বাড়ির বাইরে গিয়ে সাইকেল চালাতাম। কিন্তু হাসু আপাকে বাড়ির ছাদে সাইকেল চালাতে হতো। আব্বা ও মা বাইরে গেলে হাসু আপা আমাদের গার্জিয়ান হতো। আমরা সব লক্ষ্মী হয়ে ঘরে বসে লুডু, দাবা, ক্যারাম খেলতাম তাঁর নিয়মনীতি মেনে চলতে হতো। অনেক সময় তাঁর

শাসনও খুব কঠিন হতো। ঈদের সময় মা ও হাসু আপা আমাদের ঘরে জামা-কাপড় সেলাই করতেন। অনেক আত্মীয়-স্বজনের কাপড়ও সেলাই করা হতো। আমি মাঝে মাঝে হাসু আপার কাছে ফ্রকের নতুন ডিজাইনের আবদার করতাম। তার বিনিময়ে তাকে চা এবং কপি তৈরি করে খাওয়াতাম। যতক্ষণ না সেলাই শেষ হয় আমাকে এই খেদমত করতে হতো সেলাইও শেষ আমার চা তৈরির কাজও শেষ।

আমাদের বাসায় আত্মীয়-স্বজন, দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও মানুষের ভিড় লেগেই থাকত। আবার যখন দুঃসময় এসে দাঁড়াত, দেখতাম শূন্যতায় খা খা করছ। আব্বা যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি ছিলেন এবং তাঁর খবরই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমার মা ও হাসু আপা আমাদের আগলে রাখতেন। ১৯১৭ সালের ২৫ মার্চ রাতে আব্বা আমাকে হাসু আপার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। পরে মগবাজারের এক আত্মীয় বাড়িতে আমার মায়ের সঙ্গে থাকি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও আব্বার জন্য দুশ্চিন্তায় আমাদের দিন কেটেছে। সেখান থেকে আমাদের গ্রেফতার করে ধানমণ্ডি ১৮ নম্বর রোডে এক বাসায় বন্দি রাখা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা খুব খারাপ ব্যবহার করত। আমাদের খাওয়ারও খুব কষ্ট হতো। হাসু আপার ছেলে জয়ের জন্ম হলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। মাকে একবারও যেতে দেওয়া হয়নি। মা খুব কাঁদত ঘরে বসে। অফিসাররা বলত-'আপনিকি ডাক্তার, আপনি গিয়ে কী করবেন? মা উত্তর দিলেন "আমি মা।' কামাল ভাই, জামাল ভাই মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছেন। আমি ও রাসেল ছিলাম মায়ের কাছে । হাসু আপা যেদিন ছোট্ট জয়কে নিয়ে ঘরে ফেরে সেদিন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। জয়কে কোলে নিয়ে মায়ের সেই হাসি- খুশির আনন্দঘন মুহূর্তটি আজও আমার মনে পড়ে।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে কামাল ও জামাল ভাইয়ের বিয়ের সময় আমরা খুব আনন্দ করেছিলাম। আমি তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আগস্টের প্রথম দিকে হাসু আপা ও জয় ও পুতুলকে নিয়ে দুলাভাইয়ের সঙ্গে জার্মানি যাচ্ছিল। আব্বা ও মা আমাকেও তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। আমার একটুও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। হাসু আপা দুই বাচ্চা নিয়ে কষ্ট করবে বলে মা আমাকে যেতে বললেন। যাবার সময় মা খুব

কাঁদছিলেন। রাসেল আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখলো বিমানে না ওঠা পর্যন্ত। সবাই এসেছিল সেদিন। আব্বা ও মাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে আমারও মন খারাপ ছিল। যাহোক, জার্মানি গিয়ে আমরা থাকলাম। আশে-পাশের দেশের শহরেও বেড়ালাম। ১৩ আগস্ট মা ও আব্বার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো আমার। দেশে ফেরার জন্য আমি কান্নাকাটি করলাম। আব্বা বললেন-'আমি বলে দিচ্ছি তুমি যেন তাড়াতাড়ি চলে আসো।'

১৫ আগস্টের শোকাবহ ঘটনার কথা যখন শুনি, আমরা একেবারে বাকহীন হয়ে পড়ি। এমন নিষ্ঠুরতা ঘটালো কী করে? আব্বা না হয় রাজনীতি করতেন, আড়ালে তার শত্রু থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। সেই আড়ালে শত্রু মরণ আঘাত হানতে পারে, হেনেছে। কিন্তু আমার মা, ছোট্ট রাসেল, ভাই ও ভাবীরা তো রাজনীতি করত না। হাসু আপাকে জড়িয়ে ধরে আমরা দুবোন শুধু কাঁদতাম। দুজন দুজনকে সান্তনা দিতাম। দুজনে দুজনের চোখের পানি মুছিয়ে দিতাম। হাসু আপাকে এক মুহূর্ত না দেখলে আমার মন ছটফট করত। হাসু আপা আমার চোখে পানি মুছিয়ে দিয়ে জোর করে খাওয়াত। কতদিন যে এভাবে কেটেছে ভাবতেই পারি না। মা-বাবা, ভাইদের হারিয়ে আমরা যেন হয়ে উঠি পরস্পরের অভিভাবক ও মানসিক প্রশান্তি খোঁজার একান্ত আশ্রয়। লেখাপড়া বন্ধ, এক অসহায় এতিম অবস্থায় দিন কাটে আমার। হাসু আপা না থাকলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকাই খুব কষ্ট হতো। হাসু আপাই আমাকে আব্বা-মা'র মতো স্নেহ-ভালোবাসা আর মমত্ব দিয়ে এখনও জড়িয়ে রেখেছেন।

ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, হাসু আপা আমাদের কাছে একটা আদর্শ। আমাদের পারিবারিক একাত্মতা ছিল অত্যন্ত গভীর অনুভূতিসম্পন্ন।

মা ও হাসু আপা আমাদের বাড়ির শ্রেষ্ট আকর্ষণ ছিলেন। আব্বার রাজনীতি, ধ্যান-ধারণার ও আদর্শের প্রতি তাদের অগাধ আস্তাও বিশ্বাস ছিল। হাসু আপা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ত, ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল।

১৫ আগস্টের পর অনেক সময় লেগেছে তাঁর শক্ত হতে। আমি ১৯৭৬ সালে লন্ডন চলে যাই। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে আমার বিয়ের

সময় হাসু আপা একটি টিকিটের জন্য যেতে পারে নাই। এটা আমার জীবনের বড় একটা দুঃখ। মনে সান্ত্বনা নিলাম যে হাসু আপার বিয়ের সময় তো আব্বা ছিলেন না। আমার মা'র বড় শখ ছিল আমার বিয়ে খুব ধুমধামে দেবেন। দুর্ভাগ্য তারা কেউ তো থাকতে পারলেন না। আমার তিন সন্তানের জন্মের সময় হাসু আপা আমার কাছে থেকে মায়ের অভাব পূরণ করে দেয়।

১৯৯১ সালে আমার স্বামী যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে ভর্তি হন, তখন হাসু আপা দলের কাজ ফেলে আমার কাছে ছুটে যায়। সেবা-যত্ন করে তাকে বাঁচিয়ে তোলে আমার ও বাচ্চাদের পাশে থেকে সাহস জুগিয়ে মায়ের ভূমিকা পালন করে।

১৯৮০ সালে হাসু আপা একবার লন্ডন আসে। পঁচাত্তরের হত্যার বিচারের দাবি তোলে ও সভায় বক্তৃতা দেয়। ১৯৮১ সালে দিল্লিতে যখন হাসু আপার রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত হয়, তখন আপাকে আমি সাহস যোগাই এবং জয় ও পুতুলের দায়িত্ব নিয়ে বলি-, 'তুমি দেশের মানুষের স্বার্থে রাজনীতি করো, আমি এদের দেখবো।' জয় ও পুতুলকে আমি সব সময় আমার তিন সন্তান ববি, টিউলিপ ও রূপন্তির সঙ্গে আমার পাঁচ বাচ্চা হিসেবে বিবেচনা করে আসছি। হাসু আপা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হয়ে দেশে ফিরে আসে এবং প্রচণ্ড একটা জেদ নিয়ে রাজনীতি শুরু করে। তারপর তো অনেক সংগ্রাম-আন্দোলন, দু'বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় প্রায় এক বছর কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। কখনও স্বস্তি ও শান্তিতে থাকতে পারেনি। কারাগারে নেওয়ার পর নানাজনে নানা কথা বলত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর ওপর ভরসা ছিল এবং দেশের মানুষের ওপর আস্তা ছিল যে আমরা স্বজ্ঞানে কোনো অন্যায় করিনি। ন্যায় বিচার পাব। হাসু আপা মাথা উঁচু করে সসম্মানে মুক্তি পাবে- এই কথা বলে সবাইকে সান্ত্বনা দিতাম।

পঁচাত্তরের ঘাতকের দৃষ্টি থেকে মুক্তি পাইনি। তার জন্য আশঙ্কা থাকে, দুশ্চিন্তা থাকে। কিন্তু তার সাহস ও কল্যাণকামী কাজের জন্য আমরা সবসময় সহযোগিতা করে থাকি। তার চেয়ে বয়সে আমি অনেক ছোট হলেও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেই। হাসু আপা প্রধানমন্ত্রী হয়েছে শুধু আমাদের পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য। স্বপ্নটি হলো বাংলার মানুষ উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। বিশ্বের বাঙালি বীরের জাতি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার আসন পাবে। আমাদের সকলের বিশ্বাস এ স্বপ্ন একদিন নিশ্চয়ই সফল হবে। আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি, হাসু আপার ওপর যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে তা যেন সে জীবন দিয়ে হলেও বাস্তবায়ন করে যেতে পারে। দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করার চেয়ে বড় কিছু প্রত্যাশা আমাদের মনে নেই।

সরদার সিরাজুল ইসলাম
কাণ্ডারি যখন শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা । এই নামের আগে-পরে কোনো বিশ্লেষণ যোগ করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যার। কঠিন এক সংগ্রামের পথ বেয়ে স্বীয় প্রতিভায় বিকশিত শেখ হাসিনা এখন এই ভূখণ্ডের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে বিরাজ করছেন- এ কথা স্বীকার করতে অনেকেরই অনীহা। কিন্তু একটাই বাস্তবতা, এটা বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও ছিল।

আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচনের পর দীর্ঘ ৭ বছর পর নির্বাসন কাটিয়ে ১৭ মে ১৯৮১ শেখ হাসিনা ঢাকায় ফেরেন। সেদিন ঢাকায় লাখো লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তা দেখে বিশ্লেষকদের ধারণা ছিল জিয়ার বিরুদ্ধে বড় ধরণের আন্দোলন হবে। জিয়া খালি মাঠে গোল দিয়েছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে আন্দোলনের কোনো সুযোগ না দিয়েই নিজ সৈনিকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হলেন ৩০ মে ১৯৮১ এবং জেনারেল এরশাদ ও মিডিয়ার কল্যাণে শহীদের অমরত্ব ভোগ করছেন।

জিয়ার পর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করলেন শেখ হাসিনা। প্রাণ দিল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী। ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি বেলা দুটায় চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার সামনে পুলিশ শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে তিনি কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু শাহাদাত বরণ করেন আওয়ামী লীগের অন্তত ৩৫ জন নেতাকর্মী। উল্লেখ্য, সেদিন সকালের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে পৌঁছতে প্রায় ৬ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। আর আপোসহীন খেতাব পান বিএনপি নেত্রী (ম্যাডাম খালেদাকে রাজপথে রাখার কৌশলটি ছিল এরশাদের)। ১৯৮৬ এরশাদের সামরিক আইনে নির্বাচনে জাতীয় পার্টি-বিএনপি আওয়ামী লীগ ঠেকানোর কৌশল গ্রহণ করে এবং মিডিয়া ক্যু দিয়ে ১০০ আসনে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে দেয়। বিএনপি নির্বাচন করলে আওয়ামী লীগ ২০০ আসন পেত। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় বিএনপি আওয়ামী লীগ একটি সমঝোতায় এসেছিল যে স্বৈরাচার দোসর মন্ত্রী-সচিব কাউকে দলে নেয়া হবে না। এটা আওয়ামী লীগ কঠোরভাবে মেনেছিল কিন্তু একানব্বই-এ সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিএনপি এরশাদের উত্তরাধিকার হলো। এটিও ছিল জাতীয় পার্টি-বিএনপি-জামায়াতের অঘোষিত জোট আওয়ামী লীগ

ঠেকাতে। একানব্বইয়ের নির্বাচনের পরে দলত্যাগ করলেন ড. কামাল হোসেনের মতো বঙ্গবন্ধুর অতি প্রিয়জন। এর কারণ কখনও অনুসন্ধান করা হয়নি। অথচ শেখ হাসিনা কিন্তু তাঁকে অভিভাবক মেনেই রাজনীতিতে এসেছেন। এই লেখকের কাছে একান্তে শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে, তিনি প্রথম ১৯৮১ সাল থেকে ড. কামাল হোসেন নির্ভর হন । ১৯৮৬ সালেও তিনি নির্বাচনের বিপক্ষে ছিলেন। ড. কামালের পরামর্শে যোগ দেন। তবে ড. কামাল হোসেন যেহেতু আইন ব্যবসায়ে বেশি মনোযোগী ছিলেন। সেহেতু দলের প্রয়োজনে তাঁকে পাওয়া যায়নি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর ড. কামাল হোসেন দল ত্যাগ করেন।

ড.কামাল হোসেন বিহীন আওয়ামী লীগ ১৯৯১-৯৬ এর ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৬৬ সালের নির্বাচনের মধ্যে শামস কিবরিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। শেখ হাসিনার শাসন আমলে (১৯৯৬-২০০১) যে সব বিষয় অবশ্য প্রশংসার দাবি রাখে তা হচ্ছে-পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে যে পার্বত্য অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলে ছিল সে অঞ্চলে প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশ করা। এটি বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। এরপর ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদী পানিচুক্তি। বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে জাতিসংঘ স্বীকৃতিলাভ। এ সুবিধায় যে কোনো দেশে বাংলায় উপস্থাপিত যে কোনো চিঠিপত্র আমলযোগ্য। দেশে খাদ্য উৎপাদন ছিল রেকর্ড পরিমাণ । ৫ বছরে দ্রব্যমূল্য ছিল স্বাভাবিক। প্রবৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ। আইনশৃঙ্খলা সহনীয়, এখনকার চাইতে অনেক অনেক বেশি ভালো। উন্নয়নমূলক কাজও হয়েছে প্রচুর। সরকারের ছিল গতিশীলতা।

শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে রাজনীতিতে স্বচ্ছতার নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন কিন্তু এজন্য তাঁকে মোটা দাগে মূল্য দিতে হয়েছে। ৫ বছর তিনি ভালো কাজ করেছেন সে সুবাদে পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারবেন। এই আত্মবিশ্বাসের বিপরীতে তার বিরুদ্ধে যে সাহাবুদ্দীন লতিফুর সাঈদ গংয়ের ব্যবহার করে মূল শত্রুরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তা ছিল শেখ হাসিনার কল্পনার বাইরে। সমাজের এসব শীর্ষস্থানীয় লোকের চরিত্র যদি এই হয় তবে মানুষ আস্তা রাখবে কোথায়? ২০০১- এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপর্যয় কি তাদের ৫ বছর শাসনামলের কর্মফল না গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল সে নিয়ে নির্মোহ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তবে এটা ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। যার প্রমাণ

নির্বাচন-পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের ওপর হত্যা-নির্যাতন যা একাত্তরকে হার মানিয়েছে। এতেই আওয়ামী লীগের নির্মূল অভিযান থেমে যায়নি। খুলনার মঞ্জুরুল ইমাম, টঙ্গীর আহসান উল্লাহ মাস্টার শামস কিবরিয়াকে হত্যার পরেও এর মূল টার্গেট শেখ হাসিনাকে হত্যা। ২১ আগস্ট ২০০৪ গ্রেনেড দিয়ে হত্যায় সফল না হলে আইভি রহমানের মতো প্রবীণ ও সুদক্ষ নেতাসহ কমপক্ষে ২৪ জনকে হত্যা এবং শতাধিক প্রবীণ-নবীন নেতাকর্মী মারাত্মকভাবে গ্রেনেডবিদ্ধ হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, একুশের গ্রেনেড হত্যার অভিযুক্তদের এখন বিচার হচ্ছে। যার শীর্ষ আসামী তারেক জিয়া, বিএনপি জামায়াত নেতা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, জামায়াতের মুজাহিদী, এনএসআই পুলিশ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বেশকিছু বিএনপি নেতা।

আওয়ামী লীগের বয়স ৬৩ বছর (২০১২ সাল) রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ মাত্র ১২ বছর। বাকি সময় রাজপথে। বাঙালির ঠিকানা, ভাত-কাপড়, এবং উন্নত জীবন সন্ধানে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামে ২৬ বছর যার মাত্র সাড়ে ৩ বছর রাষ্ট্রক্ষমতা। বঙ্গবন্ধুর সময়কালে তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বস্ত জনগোষ্ঠী এবং সহকর্মী। মানুষের মধ্যে সহনশীলতা ছিল এখনকার চাইতে অনেক বেশি। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব এমনই ছিল যে দলমত নির্বিশেষে সবাই তাঁকে সম্মান করত।

শেখ হাসিনার সময়কাল ৩১ বছর। রাষ্ট্রক্ষমতা ৮ বছর আর রাজপথে ২৩ বছর। শেখ হাসিনা পেয়েছে বঙ্গবন্ধু খুনী-উত্তর বাংলাদেশ। একটি প্রভাবশালী বৈরী গোষ্ঠী, একাত্তর ও পঁচাত্তরের ঘাতক সমন্বয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে বহুবার (যা এখনো অব্যাহত) তবে অন্তত দুবার সরকারি মদদে ১৯৮৮, ২০০৪ এবং ১০ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে কথিত সেনা বিদ্রোহের মানে-এটি সেনাবাহিনী দমন করেছে। দলে প্রভাবশালী অনেকেই ছেড়ে গেছেন। কেউবা ফিরেছেন, কিন্তু সংগ্রামের ধারা ব্যাহত হয়নি তবে শেখ হাসিনাকে সফলতা বা ব্যর্থতার দায় বহন করতে হচ্ছে জনকের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে। সে দায়িত্ব তিনি পালনে সচেষ্ট, গভীর আগ্রহে এবং নিষ্ঠায়। দেশবাসী মনে করে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে জাতি বিজয়ী হয়। আর পরাজিত হলে জাতি পরাজিত হয়। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিতে প্রাধান্য ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর।

যারা ভেবেছিল ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ শেষ। কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্ম জনগণের অভিপ্রায়ে জনগণের জন্য, জনগণ থেকে দেশ ও

জাতিকে কিছু দেয়ার জন্য এবং যা কিছু অর্জন ও প্রাপ্তি তার সব কৃতিত্ব আওয়ামী লীগের, ধ্বংস করা যায় না । বঙ্গবন্ধু হত্যার সুদীর্ঘ ২১ বছর পরে তাঁর দল রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাওয়া এবং ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃস্থাপন আসলেই ইতিহাস নজিরবিহীন বিস্ময়কর এবং প্রশংসনীয় ঘটনা যার কৃতিত্ব আওয়ামী লীগের ২০০৯ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছেন শেখ হাসিনা।

যে যাই বলুন না কেন শেখ হাসিনা যে সঠিক পথে আছে তার প্রমাণ,৭৫-এ জনককে হত্যা আর এখনও বন্দুক শেখ হাসিনার দিকে। বাঙালির ঠিকানা আওয়ামী লীগ এবং তার নেত্রী শেখ হাসিনা, এখনও তারুণ্যের প্রতীক হাতে মঙ্গল ও প্রগতির আলোকবর্তিকা। তিনি ভুলে যাননি জীবন কাঁপানো জয় বাংলা আর দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অঙ্গীকার জন্মদিনে শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য কামনা।

সুভাষ সিংহ রায়

শেখ হাসিনা : চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ ও শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

মানুষ শুধু একটি দেশেরই নাগরিক নয়, ছোট্ট একটি ভূখণ্ড সম্বন্ধে সজাগ ও যত্নশীল হলেই চলবে না। তাকে ভাবতে হবে সমগ্র পৃথিবীর কথা। মানব জাতির একটি মাত্রই দেশ। সেটির নাম পৃথিবী। এই সত্যটি শেখ হাসিনার মতো করে আর কোনো সরকারপ্রধান বোঝেন নি। তাই তিনি অনন্য। মূলত রাজনীতির মানুষ। যে কারণে দেশের মানুষের আজকের সময়ের কথা যেমন ভাবছেন; আগামী প্রজন্মের কথাও তিনি ভাবেন । তিনি মনে করেন এই দেশ শুধু আজকের সময়ের জন্য নয়; অনাগত দিনের মানুষের জন্যও এই দেশ। শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা। বাংলাদেশের বিদগ্ধজনরা যারা তার রাজনীতির সাথে যুক্ত না তারাও ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনাকে পছন্দ করেন। ২০১৫ সালের ৬৯তম জন্মদিনের প্রাক্কালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' অর্জন করেন। এবং যথারীতি তিনি তা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে উৎসর্গ করেন। এটি বাংলাদেশের জন্য কম অর্জন নয়। শেখ হাসিনার সততা ও দেশপ্রেমের জন্য নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হাফিংটন পোস্টের ব্লগে শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'জনগণকে রক্ষায় কারও দিকে তাকিয়ে নেই বাংলাদেশ।' একমাত্র এবং একমাত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। ২০০৯ জেনেভা সম্মেলনে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সারাবিশ্বের পরিবেশ আন্দোলনের নেতা। সত্যি সত্যি আজ শেখ হাসিনা চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ। আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানের জন্ম হওয়ার বহু বছর পূর্বে সাধক পরুষরা অভিজ্ঞ পরিবেশবিজ্ঞানীর মতোই সাবধান বাণী উচ্চারণ করতেন। উন্নত বিশ্ব যখন ভোগবাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে গিয়ে সারা পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট করেছে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনুন্নত বিশ্ব। শেখ হাসিনা খুব ভালো করেই জানেন, প্রকৃতির একটি নিজস্ব

স্বভাবধর্ম আছে, একটি নিজস্ব নিয়ম আছে। এই নিয়মকে অবিরত লঙ্ঘন করতে থাকলে, প্রকৃতির নিয়ম সীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে, তাকে ক্রমাগত উপেক্ষা করতে থাকলে পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্বংসের পথও প্রশস্ত হয়ে ওঠে। এইটেই তো আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানের মূল কথা।

দুই

আমরা জানি, ২০১৫ সালেই ইউনেস্কোর মহাসচিব ইরিনা বোকাভো শেখ হাসিনার হাতে 'পিস ট্রি' পদক তুলে দিয়েছেন। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার বক্তব্যেও সারার্থ। 'এই সাহসী নারী আলোকবর্তিকা হিসেবে সারা পৃথিবীতে পথ দেখাচ্ছেন।' শেখ হাসিনা স্পষ্টত বিশ্বাস করেন, পরিবেশ বিপর্যয় ঘটলে কৃষির ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেবে। এইখানে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন–

"তার পর এল কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জনশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে আহায্যে আয়োজন ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে, এইজন্য তাতে স্বার্থপরতাকে শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত করে রেখেছে। সেই সঙ্গে জাগল ধর্মনীতি। কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়। কেননা, বহু লোক একত্র হলে যা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের পরে । জীবিকা যত সহজ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ হয় প্রীতিমূলক ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। বস্তুত মানবসভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা।"

[দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হলকর্ষণ', ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ]

শেখ হাসিনা এখন শুধু একটি নামই নয়, একটি প্রতিষ্ঠান। Work is Worship, যার জীবনের মূলমন্ত্র কর্ম-জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গঠিত এক অসাধারণ জীবন তার। শেখ হাসিনা বাঙালি জাতির Ralling Point, Cementing Bond। সুখে থাকবার, স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার আকর্ষণ

মানুষের জন্য খুবই স্বাভাবিক। সাধারণের জন্য এটাই কাঙ্ক্ষিত জীবনযাপন। ত্যাগের কথা শাস্ত্রে আছে, মনীষীদের জীবন গ্রন্থে আছে, চলমান জীবনাচরণে থাকাটা অস্বাভাবিক। শেখ হাসিনার চরম শত্রুও বলবেন, শেখ হাসিনা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। মাত্র কয়েকদিন আগে বিখ্যাত পত্রিকা 'গার্ডিয়ান'-এর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আই ডু পলিটিক্স ফর দ্য পিপল' (আমি জনগণের জন্য রাজনীতি করি)। সারা পৃথিবীর পরিবেশ কর্মীদের কাছে একজন আলোকবর্তিকা। জানি না, কোন এক অজানা কারণে অনেক কিছুর সাথে মিলে যায়। কোনো এক জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'সত্তা আমার, জানি না সে কোথা থেকে/হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে। একজন বিশিষ্টজন একবার শেখ হাসিনার জন্মদিনের লেখায় বলেছিলেন, শেখ হাসিনা বোধহয় খুব ভালো করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সিপাই' এবং 'খোয়াবনামা' উপন্যাস পড়েছেন, খুব ভালো করে শওকত ওসমানের 'বনী আদম' ও 'জননী' উপন্যাস পড়েছেন এবং পড়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক গল্প। পড়তে পড়তে ভেবেছেন মানুষ, গ্রাম-বাংলার হতদরিদ্র মানুষ কীভাবে ভাতের জন্য লড়াই করে, সুযোগ পেলেই ভাতের লড়াইকে ভোটের লড়াইয়ের দিকে নিয়ে আসে। তারা লড়াকু মানুষ, অজেয় মানুষ, অমর মানুষ, এই মানুষজনের কাছে শেখ হাসিনার দায়ভাগ আছে। এই দায়ভাগই শেখ হাসিনার রাজনীতি কিংবা তার নিয়তি। পরিবেশ বিপর্যস্ত হলে এই লড়াকু মানুষরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা তার পিতৃপুরুষের জন্মস্থান কেনিয়া সফরে গিয়ে বলেছেন, 'কেনিয়া যেন বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে এই দুই দেশকে অনুসরণ করে।' এটা যে কত বড় একটা স্বীকৃতি, ভাবা যায় না। এটাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বের অসাধারণত্ব। তার সাফল্যের পিছনে রয়েছে তার মহান পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবনের অমলিন শিক্ষা, দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর অনুরাগ, সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, প্রবল ইচ্ছেশক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অসাধারণ আত্মবিশ্বাস। আজ পরিবেশ সচেতন মানুষের মনে লেগেছে সবুজের মায়া, মানুষ আজ বুঝতে পারছে বনসৃজনের আবশ্যিক প্রয়োজন। পরিবেশ আন্দোলন বিশ্বব্যাপী দানা বেঁধে না উঠলে বাস্তববাদী বুদ্ধিজীবীরা

যারা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে শুধু রোমান্টিক মানসিকতাই খুঁজে পান, হয়তো বলতেন ওসব ভাববিলাসী রোমান্টিক কবির পদ্যময় উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু আজ কবির বনসৃজনের বাণী, অরণ্যের প্রাণে সাড়া জাগানো অস্তিত্বের কথা সাড়া জাগিয়েছে শুধু পরিবেশবিজ্ঞানী সংরক্ষণবাদীদের অন্তরেই নয়, সাধারণ বিশ্ববাসীর মনেও। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বাসস্থানের চতুর্দিকে আগমন-নির্গমনের পথে, পথের পাশে জনসাধারণ চাইছেন সবুজের মায়ায় আবদ্ধ হতে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি... ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।' শেখ হাসিনারও বিশ্বাস দেশকে ভালোবাসবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্তব্য দেশকে জানা। শেখ হাসিনা বাংলার মানুষকে ভালোবাসেন পিতা শেখ মুজিবের মতো করে। শেখ হাসিনা এখন বিশ্ব নেতৃত্বের সম্মান পেয়েছেন। তিনি বিশ্ব জলবায়ু নিয়ে সাহসী ও সময় উপযোগী বক্তব্য রাখছেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বিশেষ জাতিসংঘ পুরস্কার পাওয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। শিশুমৃত্যু হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশকে এই পুরস্কার দিয়েছে জাতিসংঘ। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই এই পুরস্কার অর্জন করেছে। সারা দুনিয়ার গণমাধ্যম আজ শেখ হাসিনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তিন

মানুষ আপন সভ্যতাকে যখন অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে তখন জয়ের স্পর্ধায় বস্তুর লোভে তুলতে থাকে যে সীমার নিয়মের দ্বারা তার অভ্যুত্থান পরিমিত। সেই সীমায় সৌন্দর্য, সেই সীমার কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় ঔদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনোই ক্ষমা করে না। প্রায় সকল সভ্যতায় অবশেষে এসে পড়ে এই ঔদ্ধত্য এবং নিয়ে আসে বিনাশ। প্রকৃতির নিয়ম সীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করে কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালিতে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এ কথাগুলো বলতেন তখন অনেকেই এগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেনি। এমনকি যেসব দেশ পরিবেশ নিয়ে এখন কাজ করছে; সেসব দেশও তখন ভাবেনি। ২০১০ সালের জেনেভা সম্মেলনে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার করণীয় নিয়ে বিস্তারিত অভিমত দিয়েছিলেন। এখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাই অনুসরণ করছেন। শেখ হাসিনা স্পষ্ট করে জানেন, মানুষ শুধু একটি দেশেরই নাগরিক নয়, ছোট্ট একটি ভূখণ্ড সম্বন্ধে সজাগ ও যত্নশীল হলেই চলবে না। তাকে ভাবতে হবে সমগ্র পৃথিবীর কথা। মানব জাতির একটি মাত্রই দেশ। সেটির নাম পৃথিবী।

চার

বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৭টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও পদক অর্জন করেছেন। যার সর্বশেষটি হলো– জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ'। এই পুরস্কার লাভের একদিন পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘ 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' লাভ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। নোবেল পুরস্কার যে ৬টি বিষয়ে দেওয়া হয়, সেখানে পরিবেশ নেই। তবে জাতিসংঘের পরিবেশ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' আখ্যা পেয়ে থাকে পরিবেশের নোবেল হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বছর পরিবেশ বিষয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ সেই পুরস্কার পেয়েছেন। এর আগে এ বছর শেখ হাসিনা রাজনীতিতে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের জন্য ডবিস্নউআইপি (ওম্যান ইন পার্লামেন্ট) গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ২৫ মার্চ ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে নারী ও শিশু শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য

ইউনেস্কো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তিবৃক্ষ পদক' পুরস্কারে ভূষিত করে। খাদ্য উৎপাদন ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান করে।

২০১৩ সালে খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন, 'একটি বাড়ি ও একটি খামার প্রকল্প' ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তি মেলায় সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক 'মান্থন অ্যাওয়ার্ড' এবং জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) দারিদ্র্যতা, অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় 'ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড' পদকে ভূষিত করে।

এর আগে ২০১২ সালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য আইএনইএসসিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কালচারাল ডাইভারসিটি পদকে ভূষিত করে। ২০১১ সালের ২৬ জানুয়ারি ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সের স্পিকার জন ব্রেক্রো এমপি প্রধানমন্ত্রীকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দূরদর্শী নেতৃত্ব, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা, আঞ্চলিক শান্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে অনবদ্য অবদানের জন্য গ্লোবাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন।

এ ছাড়াও একই বছর 'সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড,' স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) 'সাউথ-সাউথ নিউজ' এবং জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড-২০১১' : ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট হেলথ এই পুরস্কারে ভূষিত করে।

শিশুমৃত্যু হ্রাস সংক্রান্ত এমডিপি-৪ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। একই বছরের ২৩ নভেম্বর আন্তর্জাতিক উন্নয়নে

অসামান্য অবদানের জন্য এসটি পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করে। ১২ জানুয়ারি বিশ্বখ্যাত 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক-২০০৯'-এ ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রী। ২০০৫ সালের জুন মাসে গণতন্ত্র, সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া।

২০০০ সালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকন ওমেনস কলেজ 'পার্ল এস বাক পদক' প্রদান করে। একই বছর ৪ ফেব্রুয়ারি ব্র্যাসেলসের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর অনারিয়াস কসা এবং ৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটের 'ইউনিভার্সিটি অব বার্ডিগ্রেপোর্ট' বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নে অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে 'ডক্টরস অব হিউম্যান লেটার্স' প্রদান করে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১৯৯৯ সালের ২০ অক্টোবর 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্বীকৃতিস্বরূপ এফএও কর্তৃক 'সেরেস পদক' লাভ করেন তিনি।

১৯৯৮ সালে নরওয়ের রাজধানী অসলোয় মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এম কে গান্ধী' পুরস্কারে ভূষিত করে। একই বছরের এপ্রিলে নিখিল ভারত শান্তি পরিষদ শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য তাকে 'মাদার তেরেসা পদক' এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখার জন্য ইউনেস্কো শেখ হাসিনাকে 'ফেলিক্স হুফে বইনি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। একই বছর ২৮ জানুয়ারি শান্তি নিকেতনের বিশ্বভারতী এক আড়ম্বরপূর্ণ বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৯৭ সালে লায়ন্স ক্লাবসমূহের আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক 'রাষ্ট্রপ্রধান পদক' প্রদান এবং রোটারী ইন্টারন্যাশনালের রোটারী ফাউন্ডেশন শেখ হাসিনাকে 'পল হ্যারিস ফেলো' নির্বাচন এবং ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের সম্মাননা মেডেল প্রদান করে। এ ছাড়াও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শান্তি,

গণতন্ত্র ও উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনে অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ হাসিনাকে 'নেতাজী মেমোরিয়াল পদক ১৯৯৭' প্রদান করে।

২৫ অক্টোবর গ্রেট ব্রিটেনের ডান্ডি এবার্তে বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 'ডক্টর অব লিবারেল আর্টস' ডিগ্রি, ১৫ জুলাই জাপানের বিখ্যাত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি এবং ৬ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ ' উপাধি প্রদান করে।

দেশের বিশিষ্টজনরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও পদক লাভকে জাতির জন্য গর্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শেখ হাসিনার জীবন কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। এখন এটা শুধু একটি নামই নয়, এটা একটি প্রতিষ্ঠান। work is worship,যার জীবনের মূলমন্ত্র কর্ম-জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গঠিত এক অসাধারণ জীবন তার । শেখ হাসিনা বাঙালি জাতির Ralling Point, Cementing Bond। জননেত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের একটি রূপক। একজন বিশিষ্টজন একবার শেখ হাসিনাকে এক লেখায় বলেছিলেন, শেখ হাসিনা বোধহয় খুব ভালো করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সিপাই'এবং 'খোয়াবনামা' উপন্যাস পড়েছেন, খুব ভালো করে শওকত ওসমানের 'বনী আদম' ও 'জননী' উপন্যাস পড়েছেন এবং পড়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক গল্প। পড়তে পড়তে ভেবেছেন মানুষ, গ্রাম-বাংলার হতদরিদ্র মানুষ কীভাবে ভাতের জন্য লড়াই করে, সুযোগ পেলেই ভাতের লড়াইকে ভোটের লড়াইয়ের দিকে নিয়ে আসে। তারা লড়াকু মানুষ, অজেয় মানুষ, অমর মানুষ, এই মানুষজনের কাছে শেখ হাসিনার দায়ভাগ আছে। এই দায়ভাগই শেখ হাসিনার রাজনীতি কিংবা তার নিয়তি।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে সেদিন জনসমুদ্রে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'সবকিছু হারিয়ে আমি আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি।

বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তি-সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য আমি এসেছি। আমি আওয়ামী লীগের নেত্রী হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে মেয়ে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের সাথে থাকতে চাই।'

এর মাত্র পাঁচ দিন আগে ১১ মে তারিখে বিশ্বখ্যাত 'নিউজউইক'পত্রিকা বক্স আইটেম হিসেবে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। শেখ হাসিনা যখন দেশে ফেরেন তখন সময়টা খুব খারাপ ছিল। বলতে গেলে যে কোনো সময় একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, খুনিরা যেন সব জায়গায় ওত পেতে আছে।

শেখ হাসিনা স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'তিনি নিহত হওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত নন; এমনকি যে সরকারের মোকাবিলা করবেন তার শক্তিকে তিনি বাধা বলে গণ্য করবেন না। জীবনে ঝুঁকি নিতেই হয়। মৃত্যুকে ভয় করলে জীবন মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হয়।' আজকের শেখ হাসিনার নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় এই বাণীর পরিস্ফুটন দেখতে পাওয়া যায়। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি/বাজাও আপন সুর/তোমার মাঝে আমার প্রকাশ/তাই এত সুমধুর।'

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯৮১ সালের ১৮ মে দৈনিক ইত্তেফাকে লেখা হয়েছে, "দীর্ঘ ছ'বছর বিদেশে অবস্থানের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সতেরোই মে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন। লাখো জনতা অকৃপণ প্রাণঢালা অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে বরণ করে নেন তাদের নেত্রীকে। মধ্যাহ্ন থেকে লক্ষাধিক মানুষ কুর্মিটোলা বিমানবন্দর এলাকায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন কখন শেখ হাসিনাকে বহনকারী বিমানটি অবতরণ করবে। বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে বিমানবন্দরে কোনো নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ..."

ওই সময়কার সরকারি দৈনিক 'দৈনিক বাংলা' ১৮ মে (১৯৮১) শেখ হাসিনার বিমানবন্দর সম্বর্ধনা সংবাদে উল্লেখ করেছিল, "ওইদিন কালবৈশাখী ঝড়ো হাওয়ার বেগ ছিল ৬৫ মাইল। এবং এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে লাখো লাখো মানুষ শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য রাস্তায় ছিল।"

বিশেষত, বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ কিসের সঙ্গে সম্পর্ক, কিসের অগ্রগতি বা পশ্চাদগতি তা একমাত্র শেখ হাসিনাই বুঝেছেন। তার পারদর্শিতায় দেশের সাধারণ মানুষের অগ্রগতি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের ভালোবাসাও পেয়েছেন; কিন্তু সমাজের বিজ্ঞজনরা সব সময় স্বীকৃতি দেননি। গণতন্ত্রের জন্য প্রতিমুহূর্তে ঝুঁকির মধ্যে থাকা শেখ হাসিনার কদর অনেক খ্যাতিমানদের কাছে নেই। এখানেই একটি কৌতূহলোদ্দীপক দ্বান্দ্বিকতা দৃশ্যমান হয়। উদারনৈতিকতার যে ধারা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সূচনা করতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার মূল্যায়ন আমরা ক'জন করেছি।

আজ দেশে-বিদেশে রাজনীতি-সংশ্লিষ্টরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার প্রাধান্যের কথা বলেন ও লেখেন। তিনি সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু, সব রাজনৈতিক আন্দোলন, তৎপরতা, প্রশংসা-নিন্দার লক্ষ্য

এবং উপলক্ষ। বাংলাদেশে একটা প্রচলিত মতবাদ, বাংলাদেশের মতো দেশে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় না থাকলে জনগণের জন্য করণীয় খুব একটা থাকে না। অথচ ক্ষমতা কিংবা ক্ষমতার বাইরে যেখানেই থাকুন না কেন, সব সময়ই তিনি জনগণের কথা বলেছেন।

১৯৮১ সালের ১৮ মে দৈনিক সংবাদ-এর শিরোনাম সংবাদে উল্লেখ করা হয়, "...রাজধানী ঢাকা গতকাল (১ মে) মিছিলের শহরে পরিণত হয়েছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিছিল। শুধু মিছিল আর মিছিল। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিও মিছিলের গতিরোধ করতে পারেনি। স্লোগানেও ভাটা পড়েনি। লাখো কণ্ঠের স্লোগান নগরীকে প্রকম্পিত করেছে। গতকালের ঢাকা ন'বছর আগের কথাই বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি যেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে এসেছিলেন, সেদিন স্বজন হারানোর ব্যথা ভুলে গিয়েও লাখ লাখ জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিল নেতাকে এক নজর দেখার জন্য। গতকালও হয়েছে তাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য ঢাকায় মানুষের ঢল নেমেছিল। কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শেরেবাংলানগর পরিণত হয়েছিল জনসমুদ্রে। ফার্মগেট থেকে কুর্মিটোলা বিমানবন্দর পর্যন্ত ট্রাফিক বন্ধ ছিল প্রায় ছ'ঘন্টা।"

আজ দেশে-বিদেশে রাজনীতি-সংশ্লিষ্টরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার প্রাধান্যের কথা বলেন ও লেখেন। তিনি সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু, সব রাজনৈতিক আন্দোলন, তৎপরতা, প্রশংসা-নিন্দার লক্ষ্য এবং উপলক্ষ। এটাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাম দেওয়া যেতে পারে– 'শেখ হাসিনা ফ্যাক্টর'। শেখ হাসিনা দেশে না এলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ব্রাকেটবন্দি হয়ে পড়ত। কোনো স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন হতো না, সংসদীয় রাজনীতির কথা কেউ হয়তো বলত না। শেখ হাসিনা এ দেশের প্রগতিশীল রাজনীতির Cementing Bond-এর মতো কাজ করেছেন। যে কারণে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্য লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল, তেমনি ১৯৮১ সালের ১ মে শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানুষ সারাদিনই রাস্তায় ছিল।

২০ মে ১৯৮১ সালে গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনার গণসম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সম্বর্ধনা সভায় শেখ হাসিনা বলেছিলেন,"...আমি সামান্য মেয়ে। সক্রিয় রাজনীতির দূরে থেকে আমি ঘর-সংসার করছিলাম। আপনাদের ডাকে সবকিছু ছেড়ে এসেছি। বাংলার দুঃখী মানুষের সেবায় আমি আমার এ জীবন দান করতে চাই।..."

ঈদগাঁ ময়দানের সেই গণসম্বর্ধনা সভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, "...গত ছয় বছরে দেশের মানুষের কোনো রকম উন্নতি তো আমি দেখিনি। মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হয়েছে। কৃষক-শ্রমিক তার ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মূল্য পাচ্ছে না। তিনি উত্তাল জনসমুদ্রের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, তবে কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মণি ও চার নেতাকে হত্যা করা হলো।..." শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসেছিলেন বলে শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকরা সাহসের একটা ঠিকানা পেয়েছিলেন। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তকে বঙ্গবন্ধুর খুনি চক্র তথা তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাঙালি সংস্কৃতির সব কিছুর ওপর একটা অলিখিত নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, হুসেন শাহীর সময়ে বাংলার রাজনৈতিক তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ওই সময়টাতে প্রেমভক্তির ধর্মকে ভাবোম্মদনার মধ্য দিয়েই সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার হুসেন শাহীর দরবারে পারসিক ও আরবিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল প্রবল। সামগ্রিকভাবে ওই সময়টাতে মানুষের অনুভূতির সঙ্গে শিল্পানুভূতির এক যুগল বন্ধন ছিল। হুসেন শাহীর মতো বঙ্গবন্ধুর সময়ে বাংলাদেশে এক লোকায়ত সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে খুনিরা বাংলাদেশকে বিজাতীয় সংস্কৃতির চারণ ভূমিতে পরিণত করেছিল। যে কারণে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এলে সংস্কৃতি-কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর মানুষের ওপর ঋণের বোঝা বাড়ানো হয়েছে। ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরিব আরও গরিব হয়েছে। শেখ হাসিনা দেশে আসার পর থেকে ক্ষমতায় থাকুন আর না-ই থাকুন, সব সময় চেষ্টা করেছেন কীভাবে মানুষের কষ্ট লাঘব করা যায়। দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার ঋণের বোঝা কমানো যায়।

ছোট একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ১৯৯৭ সালে মাইক্রোক্রেডিট সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অংশগ্রহণ করেন, সেই সময় তিনি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় হোয়াইট হাউসের ওই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশ ওই সময় পর্যন্ত যে ঋণ নিয়েছিল তা যেন মওকুফ করে দেন। সেই সময় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন মোট ঋণের একাংশ মওকুফ করে দেন। সেই মওকুফ করা অর্থ বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণসহ বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর পর এক কল্পনাবিলাসী বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ২১ বছর পর শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্ব নিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছেন। যদি ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হতো, তাহলে আরও অনেক আগেই আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারতাম। ক্ষুধা থেকে মুক্তি ও দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচিয়ে বাংলাদেশ অনেক আগেই বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হতো। বাংলাদেশে একটা প্রচলিত মতবাদ, বাংলাদেশের মতো দেশে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় না থাকলে জনগণের জন্য করণীয় খুব একটা থাকে না। অথচ ক্ষমতা কিংবা ক্ষমতার বাইরে যেখানেই থাকুন না কেন সব সময় তিনি জনগণের কথা বলেছেন।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু হত্যার কেউ প্রতিবাদ করেনি। ছয় বছর পর শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এলে জনগণ তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে প্রমাণ করেছিল, বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছিল। এদিক দিয়েও ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসা অনেক গুরুত্ব বহন করে। শুধু ঢাকা কিংবা গোপালগঞ্জে নয়, শেখ হাসিনা ওই সময়টাতে যে জেলায় গিয়েছেন সেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাকে এক নজর দেখার জন্য দিনের অর্ধেক সময় দাঁড়িয়ে থেকেছে। ২৯ সে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকাতে এভাবে লেখা হয়, "...আজ (২৮ মে) সকাল পৌনে দশটায় ট্রেনযোগে আওয়ামী লীগ নেত্রী সিলেট এসে পৌঁছান। অগণিত মানুষ রেল স্টেশনে আওয়ামী লীগ নেত্রীকে সম্বর্ধনা জানায়। রেল স্টেশন থেকে লাখো জনতার একটি মিছিল আওয়ামী

লীগ নেত্রীকে নিয়ে শহরে মিছিল বের করে। এ সময় রাস্তায় দু'ধারে নারী-পুরুষ-শিশুসহ হাজার হাজার লোক শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। গতকাল থেকেই বাস-ট্রাকযোগে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনস্রোত শহরে আগমন করে। ..." মূলত, এভাবেই জনতার আবেগ, ভালোবাসার, স্বপ্নের দ্যোতনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা দেশে ফিরে এসেছিলেন।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসেছিলেন বলে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশের আপামর মানুষ তাদের প্রতিরোধ প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পেরেছিল। তিনি দেশে এসেছিলেন বলেই একটি গণতান্ত্রিক সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।

ছ'বছর পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

কলকাতা থেকে পিটিআই কর্তৃক পরিবেশিত এক সংবাদে বলা হয়, শেখ হাসিনা গতকাল (রবিবার, ১৭ মে) ভারতের অশ্রু-সজল চোখে বিদায় জানান। কলকাতা বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমার ছ-বছরের প্রবাসকালে আমার প্রতি যে মমতা ও ভালোবাসা জানান হয়েছে, তার জন্য আমি ভারতের জনগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।'

শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকার বিভিন্ন আওয়ামী লীগ সমর্থক পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। 'সাপ্তাহিক রাজনীতি' নামক পত্রিকায় 'স্বাগতম শেখ হাসিনা' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'শেখ হাসিনা দেশের বুকে ফিরে আসছেন নির্যাতিত- শোষিত মানুষের মুক্তির মন্ত্র নিয়ে, স্বৈরাচার উৎখাত ও বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত বিপ্লব সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের আহ্বান নিয়ে।'

আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভানেত্রীকে ঐতিহাসিন অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, তাকে কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং শেরেবাংলা নগরে গণসম্বর্ধনা দানের জন্য আয়োজিত সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে দেশের সকল এলাকা থেকে অগণিত লোক ঢাকা এসে পৌঁছেছে। 'বঙ্গবন্ধুর বংশের প্রদীপ, ঐতিহ্যের ধারক ও স্মৃতির প্রতীক' শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য কিশোর, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে

অগণিত মানুষ বাস, ট্রাক, লঞ্চ, স্টিমার ও ট্রেনযোগে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে ঢাকা এসে সমবেত হচ্ছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন জেলা থেকে মিছিলের পর মিছিলের স্রোত এসে আছড়ে পড়ছে রাজধানী ঢাকা উপকূলে। উঠছে গগনবিদারী স্লোগান 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'বঙ্গবন্ধুর রক্ত বৃথা যেতে দেব না', 'আদর্শের মৃত্যু নেই, হত্যাকারীর রেহাই নেই।

শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফিরে আসার সংবাদ পরদিন (১৮ মে ১৯৮১) ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করা হয়। 'দৈনিক সংবাদ '-এ প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, 'লাখো জনতা অকৃপণ প্রাণঢালা অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে বরণ করে নেয় তাদের নেত্রীকে।'

শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকা যে-অনন্য রূপ ধারণ করে সে-সম্পর্কে এক রিপোর্টে বলা হয়—

রাজধানী ঢাকা গতকাল (১৭ মে) মিছিলের শহরে পরিণত হয়েছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিছিল। শুধু মিছিল আর মিছিল। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিও মিছিলের গতিরোধ করতে পারে নি। স্লোগানেও ভাটা পড়ে নি। লাখো কণ্ঠের স্লোগান নগরীকে প্রকম্পিত করেছে। গতকালের ঢাকা ন'বছর আগের কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি যে-দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশে এসেছিলেন, সে-দিন স্বজন হারাবার ব্যথা ভুলে গিয়েও লাখ লাখ জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিল নেতাকে এক নজর দেখার জন্য। গতকালও হয়েছে তাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য ঢাকায় মানুষের ঢল নেমেছিল। কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শেরেবাংলার পরিণত হয়েছিল জনসমুদ্রে। ফার্মগেট থেকে কুর্মিটোলা বিমানবন্দর পর্যন্ত ট্রাফিক বন্ধ ছিল প্রায় ছ'ঘন্টা।

আর একটি রিপোর্টে বলা হয়—

কখন শেখ হাসিনাকে বহনকারী ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমান অবতরণ করবে সেদিকে নজর রেখে লক্ষাধিক মানুষ মধ্যাহ্ন থেকে কুর্মিটোলা বিমানবন্দর এলাকায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বিকেল সাড়ে ৩টা থেকেই বিমানবন্দরে কোনো নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। হাজার হাজার মানুষ ভিআইপি লাউঞ্জের গেটে নিয়োজিত পুলিশের

বেষ্টনী ভেদ করে প্রথমে দেয়ালের উপর ওঠে। একই সময়ে বিমানবন্দর ভবনের দোতলায় কন্ট্রোল টাওয়ারের যেখানে স্থান করা সম্ভব সেখানেই জনতা উঠে যায়। উদ্দেশ্য শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখা। পুলিশ বারবার চেষ্টা করেও তাদের সরাতে পারে নি। বিমান অবতরণের সময় যতই এগিয়ে আসছিল, বাইরে অপেক্ষমাণ জনতার স্রোত ততই উদ্বেল হয়ে উঠছিল।

বিমানবন্দরের বাইরে অসংখ্য মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অগণিত ট্রাকে-বাসে লাখো জনতা শহর থেকে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত বিমানবন্দরের ভিতরে ও বাইরে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তারা জনতাকে অতি অল্প সময়ের জন্য বিমানবন্দরের কাছাকাছি আসার থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। বিকেল ৩টার সময় জনতা বিমানবন্দরের সামনের পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে ৩টা ২০ মিনিটে তারা দেয়াল টপকে ভিআইপি লাউঞ্জের সামনে বিমানবন্দরের ভিতর ঢুকে পড়ে। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা শত চেষ্টা করেও তাদের সরাতে পারেন নি। বিকেল সাড়ে ৩টার সময় বাংলাদেশ বিমানের একটি বোয়িং আকাশে দেখা যায়। এই সময় হঠাৎ করে হাজার হাজার মানুষ বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে একেবারে বিমানবন্দরের রানওয়ে পর্যন্ত চলে যায়। আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আহমদ ও মোহাম্মদ হানিফ জিপে করে মাইক দিয়ে তাদের রানওয়ে ও টারম্যাক থেকে সরে যাওয়ার জন্য অসংখ্যবার অনুরোধ করার পর জনতা রানওয়ে থেকে সরে যায়। কিন্তু বিকেল সাড়ে ৪টায় সত্যি সত্যিই যখন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ৭৩ বোয়িংটি আকাশে দেখা গেল, তখন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ আর অনুরোধ-আবেদন অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরের ভিতরে ঢুকে যায়। অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই বিমানটি ল্যান্ড করে। টারম্যাকে পৌছে ইঞ্জিন বন্ধ করার সাথে সাথে অগণিত মানুষ তিন দিক থেকে ছুটে গিয়ে বিমানটিকে ঘিরে ধরে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সমসাময়িক ইতিহাসে নজিরবিহীন। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মচারী ও পুলিশের নীরবে এ দৃশ্য অবলোকন করা ছাড়া করার কিছুই ছিল না। জনতা একেবারে বিমানের কাছে চলে যায়। বিমানের চারদিক ঘিরে এত লোক ছিল যে শেখ হাসিনাকে বয়ে আনার জন্য যে ট্রাকটি নেওয়া হয়েছিল তা বিমানের কাছাকাছি নেওয়াই

অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বহু চেষ্টার পর জনতার স্রোতকে কিছুটা সরিয়ে ট্রাকটি বিমানের ককপিটের দরজার একেবারে সামনে নেওয়া হয়। দরজা খোলার সাথে সাথে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক মালা হাতে ট্রাক থেকে লাফিয়ে বিমানের ভিতরে গিয়ে দলীয় সভানেত্রীকে মাল্যভূষিত করেন। এই সময় শেখ হাসিনা ভিতর থেকে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। এরপর ট্রাক থেকে বিমানের দরজার সাথে একটি ছোট কাঠের সিঁড়ি লাগান হয়। অস্বাভাবিক ভিড়ের জন্য বিমানের সিঁড়ি পর্যন্ত লাগানো সম্ভব হয় নি। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বিমানের ভেতর থেকে দলীয় প্রেসিডিয়ামের সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ ও পরে কোরবান আলী ট্রাকে নেমে আসেন। প্রেসিডিয়ামের এ দুজন সদস্য নয়াদিল্লি থেকে দলীয় সভানেত্রীর সাথে ছিলেন। ৪টা ৩২ মিনিটে শেখ হাসিনা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বিমান থেকে ট্রাকে নেমে আসেন। এ সময় লাখো জনতার কণ্ঠে ছিল গগণবিদারী স্লোগান– 'শেখ হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব, 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,' 'শেখ হাসিনা, স্বাগত শুভেচ্ছা'। অনেকের চোখেই ছিল অশ্রুধারা। বিমান থেকে নামার আগে রাজ্জাক যখন হাসিনার গলায় মালা দেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। কলকাতা বিমানবন্দরে এবং ঢাকা আসার পথে ৫-৬ বার হাসিনা অঝোরে কেঁদেছেন।

বিমান থেকে ভিআইপি লাউঞ্জ পর্যন্ত হাসিনাকে নিয়ে আসতে ট্রাকটির ১৫ মিনিট সময় লাগে। সামনে-পিছনে বিপুল জনতা। তার পরনে ছিল সাদা রঙের ওপর কালো প্রিন্টের মোটা শাড়ি। মাথায় ঘোমটা-ঢাকা হাসিনা হাত নেড়ে দু-পাশের জনতাকে অভিনন্দন জানান। বিমান থেকে নামার সময় থেকেই তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। ট্রাকে তার ডান দিকে ছিলেন ফুফাত ভাই শেখ সেলিম এবং বাম দিকে আইভি রহমান ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

বিকেল ৪টার দিকেই আকাশে কালো মেঘ ছিল। পৌনে ৫টায় শেখ হাসিনাকে নিয়ে মিছিল শুরু হওয়ার পরপরই চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি শুরু হয়। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরে একটানা রাত ৮টা পর্যন্ত। একদিকে প্রবল বর্ষণ, সেই সাথে তীব্র ঝড়। প্রকৃতির ভায়াল রুদ্রমূর্তি। এরই মাঝে ট্রাকে ও রাস্তার দু-পাশের জনতার কণ্ঠে গগনবিদারী স্লোগানে, 'মাগো তোমার কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব। বর্ষণসিক্ত হাসিনা ঝড়ের মাঝেও দাঁড়িয়ে

জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে নেড়ে যাচ্ছিলেন বনানী হয়ে শেরেবাংলানগর। বনানীতে শেখ হাসিনা মায়ের ও নিহত পরিজনের কবর জিয়ারত করেন। কবরস্থানে তিনি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন: 'মা, আমাকে কেন রাখিয়া গেলে?'

কুর্মিটোলা থেকে শেরেবাংলানগর পর্যন্ত ৮ মাইল রাস্তা সময় লাগার কথা বেশি হলে ৩০ মিনিট। প্রায় তিন ঘন্টায় শেখ হাসিনা শেরেবাংলানগরে পৌঁছালেন। ঝড়-বৃষ্টিতে নগরজীবন তখন প্রায় বিপন্ন, রাস্তাঘাটে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে গেছে। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শেরেবাংলানগরে অপেক্ষায় থাকেন লাখ কয়েক লোক। হাসিনাকে তারা দেখবেনই। সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় তিনি গণসম্বর্ধনা সভার মঞ্চে এলেন।

মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে আয়োজিত গণসম্বর্ধনায় ভাষণদান-কালে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমি জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাই। আমার আর কিছু পাবার নেই। সব হারিয়ে আমি এসেছি আপনাদের পাশে থেকে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য।

তিনি বলেন, আমি বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ পরবর্তীকালের বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। বিচার চাই বাংলার জনগণের কাছে, আপনাদের কাছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বিচার করবে না। ওদের কাছে বিচার চাইব না। আপনার আমার সাথে ওয়াদা করুন, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্ত বায়ন করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু যে 'সিস্টেম' (পদ্ধতি) চালু করতে চেয়েছিলেন, তা যদি বাস্তবায়িত হতো তাহলে বাংলার মানুষের দুঃখ আর থাকত না। সত্যিকার অর্থেই বাংলা সোনার বাংলায় পরিণত হতো।

শেরেবাংলানগরে অনুষ্ঠিত লাখো জনতার গণসম্বর্ধনাটি ছিল আনন্দঘন ও হৃদয়বিদারক। দলীয় নেত্রীর আগমণে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ছিল আনন্দ, উল্লাস আর উচ্ছ্বাস। অন্যদিকে আপনজনহারা নেত্রীর দুঃখ আর বেদনার কথা আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বক্তৃতাদানকালে শেখ হাসিনা বারকয়েক কান্নায় ভেঙে পড়েন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, আজকের জনসভায় লাখো চেনা মুখ আমি দেখছি। শুধু নেই আমার প্রিয় পিতা বঙ্গবন্ধু, মা আর ভাইয়েরা এবং আরও অনেক প্রিয়জন। ভাই রাসেল আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, আপা বলে ডাকবে না। সব হারিয়ে আজ আপনারই আমার আপনজন।

তিনি বলেন, বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য আমি এসেছি। আমি আওয়ামী লীগের নেত্রী হওয়ার জন্য আসি নি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই। আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, ক্ষমতাসীনরা বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার-পরিজনদের হত্যা করে বলেছিল, জিনিসপত্রের দাম কমানো ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আজকে দেশের অবস্থা কী? নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য আকাশচুম্বী। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা পাওনা পাচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। দিনে-দুপুরে রাস্তায় মানুষ খুন করা হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম দরিদ্র দেশে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ খেতে পায় না, আর এক শ্রেণির লোক প্রচুর সম্পদের মালিক হচ্ছে।

তিনি বলেন, ক্ষমতার গদি পাকাপোক্ত করার জন্য ওরা আগামী দিনে বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করবে। আবার বাংলার মানুষ শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি। বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছিলেন। আজ যদি বাংলার মানুষের মুক্তি না আসে তবে আমার কাছে মৃত্যুই শ্রেয়। আমি আপনাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করে মরতে চাই।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙালি জাতি রক্ত দিয়েছে। কিন্তু আজ স্বাধীনতা-বিরোধীদের হাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। ওদের রুখে দাঁড়াতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রাম করি।

সেলিনা হোসেন

দূর থেকে দেখা

ভিয়েনা থেকে নজরুল ইসলাম প্রায়ই ফোন করে বলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে একটি বই করছি। আপনি তাঁকে নিয়ে একটি লেখা পাঠাবেন আপা। বইয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। অনেকের লেখা পেয়েছি। তাড়াতাড়ি লেখাটি পাঠাবেন কিন্তু।

বললাম, তাঁকে নিয়ে লেখা আমার জন্য খুব কঠিন নজরুল। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কোনো সূত্র নেই। একজন মানুষকে নিয়ে লেখার জন্য যে যোগাযোগের দরকার হয়, সে যোগাযোগও আমার নেই। তাঁকে নিয়ে আমি কেমন করে লিখব? নজরুল হা-হা করে হেসে বলে, লেখাটি আপনার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আপনি কত মানুষকে নিয়েই তো লিখেছেন, সবাইকে কি আপনি কাছ থেকে দেখেছেন?

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁকে কি আপনি চোখে দেখেছেন?

আমি চুপ করে থাকি। ও তো ঠিকই যুক্তি দিয়েছে। নজরুল জোর দিয়ে আবার বলে, আপনি অবশ্যই লিখবেন। আমি অপেক্ষা করব।

দিন গড়ায়। আমি কী লিখবো ভেবে পাই না। নজরুল দূর ভিয়েনা থেকে অনবরত ফোন করে। বেচারার কত টাকা খরচ হয় ভেবে আমি লজ্জিত হই। পরে একদিন ভাবি, দূর থেকে দেখা একজন মানুষের সঙ্গে আমার তো নানা ধরণের সম্পর্কের সূত্র আছে, তা আমি ভেবি দেখি না কেন? একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সম্পর্ক তো নানাভাবে গ্রন্থিত হয়। তাঁকে আমি তেমনভাবেই আবিষ্কার করতে চাই। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে বিশাল দরজা খুলে যায়। সেই দরজা পথে ঢোকে রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি, গণমানুষ, পরিবেশ, দারিদ্র্য, কূটনীতি, রাজনীতি, নির্বাচন ইত্যাদি হাজার রকমের বিষয়। আমি পেছন ফিরে তাকালে তাঁকে একরকম দেখতে পাই, সামনের দিকে তাকালে অন্যরকম। দেখা আমার ফুরোয় না। নেতৃত্বের ভালোমন্দের বোধে যেমন দেখি, রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের ভালোমন্দ বোধ যেমন দেখি, তেমনি ব্যক্তি হিসেবে মানবিক বোধের জায়গা থেকেও দেখি। দেখার অফুরন্ত বিষয় বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমি দূরের

মানুষকে কাছে পাওয়ার প্রেরণা পাই। বুঝতে পারি সম্পর্কের জটিলতা তৈরি হওয়া একরৈখিক নয়, এর সঙ্গে নানা কার্যকারণ থাকে যা বিশ্লেষিত হতে হয়। বিশ্লেষণ সম্পর্ক সহজ করে।

তিনি পরিবার হারানোর সময় দেশে ছিলেন না। বিপুল বেদনার দহনে ক্লিষ্ট, বিধ্বস্ত একজন মানুষে পরিণত হয়ে যখন দেশে আসেন তারপর তাঁকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব নিতে হয়। সেদিন দেশ ছিল স্বৈরশাসনের মোড়কের কবলে সামরিক শাসন সমর্থিত অবমাননাকর পরিস্থিতি মুখোমুখি ভাবছিলাম, তাঁর হাতে রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ কতটা সংগঠিত হতে পারবে? এই ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র তৈরি হয়। বুঝে যাই তাঁর নেতৃত্বের সঙ্গে আমার জীবনযাপনের অদৃশ্য সূত্র স্থাপিত হয়েছে। শুধু আমি নই, দেশের অসংখ্য মানুষের বিশেষ করে তারা, যারা নুন ভাতের জীবনযাপনের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। যাদের সম্মানের কোনো জায়গা নেই। সম্মান দেওয়ার কোনো নেতা নেই এবং অন্ধ-বধির হয়ে এপাশ থেকে ওপাশে শুয়ে দিন কাটানো যাদের নিয়তি। আমি তাঁর দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তাঁর উজ্জ্বল চেহারায় আশাবাদী ভবিষ্যৎ খুজি এবং তাঁর অমলিন হাসির ছটায় শরতের শিউরি ফুল ফুটতে দেখি। তারপর নিজেকে আশ্বস্ত করি এই বলে যে, হ্যাঁ রাজনৈতিক দলটি দাঁড়াবে। যে দলটি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তাকে তো দাঁড়াতেই হবে। নইলে ঘুরেফিরে সামরিক শাসনের ডাণ্ডাবেড়ির নিচে ক্ষুণ্ন হবে মানবের মর্যাদার অধিকার। শেষ পর্যন্ত আমাদের তেমন পরিস্থিতির নিচে পড়তে হয়নি। দেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলটি শক্তি অর্জন করেছে। তিনি একটি যোগ্য নেতৃত্বের কর্ণধার হয়েছেন। কোনো মানুষই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, সমালোচনা অতিক্রম করাই নেতৃত্বের ধর্ম। তিনি তা মেনেই নিজেকে স্থির রাখেন এবং সমস্যাকে মূল্যায়ন করেন। সমাধান খোঁজেন। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন সাধনার রশিতে গিট্টু দেওয়া । আমরা এমনটিই চাই।

মাসটি ছিল ভাষার মাস। একুশে ফেব্রুয়ারির অমর দিনে ফুল দেওয়া হয়েছে শহীদ মিনারে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 'ঘোষণা দিয়েছে। তখন তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এগিয়ে যে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' করার প্রক্রিয়াটিকে তিনি সহজ করে দিয়েছিলেন, তা ছিল নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ ঘটনা।

বাংলাদেশের অমর একুশে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি জায়গা করে নেয়। আর বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে আমার ক্ষুদ্র আকার আকাশসমান উঁচু হয়ে যায়। আমি তখন বুঝতে পারি তাঁর সঙ্গে আমার অস্তিত্বের একটি সূত্র স্থাপিত হয়েছে। আমি আত্মার বন্ধন অনুভব করি। অন্যদিকে পৃথিবীর হাজারো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা রক্ষার অঙ্গীকারটি বাংলাদেশের মাথায় মুকুটের মতো জ্বলজ্বল করে। বিভিন্ন ভাষার মানুষ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকায় বাংলাদেশের দিকে, যে দেশটিতে সবুজলাল পতাকা পতপত ওড়ে। পতাকা ওড়ে তিনি যে দেশে যান সে দেশেই। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যেখানে যান সেখানে দেখতে পান মানুষের কৃতজ্ঞতার হাসি। মাতৃভাষা ছাড়া কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে? যে সরকার মানুষের এই মর্যাদাবোধকে এড়িয়ে যায়, সে সরকার মৌলিক সত্যটিকে অনুধাবন করে না। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা তাঁকে তেমনভাবে দেখিনি। তিনি মাতৃভাষার মর্যাদাকে শুধু সরকারের দায়িত্ব পালন হিসেবে দেখেননি, দেখেন হৃদয় থেকে। অস্তি ত্বের শেকড় থেকে। নিজের সুগভীর সাংস্কৃতিক বোধ থেকে। ফেব্রুয়ারি ভাষার মাসেই ২০০৯-এ ঘটল একটি নৃশংস জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। সেটি ছিল বিডিআর মিউটিনি। তার এক মাস আগে তিনি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। একটি অনির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কেবল নির্ধারিত কার্যক্রম গুছিয়ে নিচ্ছেন, তখনই ঘটল ঘটনাটি। উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিল পাটাতন উল্টে ফেলে স্বার্থ-হাসিল। কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতার সামনে সেটি ঘটতে পারেনি। তিনি তাঁর দক্ষতায় সামলে নিয়েছেন ষড়যন্ত্রের কূটকৌশল।

ঘটনার পর টেলিভিশনে তাঁর মৃদু-কড়া ভাষণটি শুনে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি তাঁর ভাষণে পরিস্থিতি বোধে নিজের অবস্থানকে পরিস্কার করেছিলেন। সেদিনও আমি সম্পর্কের সূত্র স্থাপিত হতে দেখেছিলাম। নিজের ভেতর ফিরে এসেছিল স্বস্তি। হৃদয় নিয়ে বুঝেছিলাম দেশ একটি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল। রক্ষা পেলাম আমরাও। আমরা যারা দেশ, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ভালোবাসি। যারা দেশটাকে। নিয়ে যেতে চাই বিশ্বের বড় পরিমণ্ডলে। যেখানে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবে না, বাংলাদেশ কোথায়? এশিয়ায় না আফ্রিকায়? তোমরা ভাত খাও, না ভুট্টা খাও? তোমাদের দেশটা কি ভারত মহাসাগরের পাশে। নাকি হিমালয়ের পাশে? তিনি আছেন বলেই আমি নিজের অস্তিত্বের সঙ্কট অনুভব করি না।

শেকড়হীন, উদ্বাস্তু মানুষ হওয়া যে কি যন্ত্রণার, একজন লেখক ছাড়া কে আর এমন গভীর করে বুঝবেন? আর আমি জানি তিনি লেখকদের ভালোবাসেন। তাঁদের বিদেশে তাঁর সফরসঙ্গী করেন এবং ইফতারের নিমন্ত্রণে নিজের টেবিলে বসার আমন্ত্রণ জানান। তাঁর এই সৌজন্য আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা শুধু প্রীতির বন্ধন অনুভব করি না, সরকারি পর্যায়ে নিজেদের একটি অবস্থান নির্ণীত হতে দেখি।

তিনি নিজে ধর্মের অনুশাসন মানেন, ধর্মীয় বিধান পালন করেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ চান, যেখানে অসাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধনে জীবনের সেতু গড়বে মানুষ। আমরা দেখব মানবভূমির এক আকাশচুম্বী স্বপ্নবিলাস। আমি বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশ তাঁর স্বপ্ন। জঙ্গিবাদ-মৌলবাদের প্রবল উত্থানে কুঁকড়ে কালো পিচ হয়ে যাবে না বাংলাদেশের সোনালি হৃদয়। তিনি যতদিন সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন ততদিন এই উত্থানকে রোধ করবেন। আমরা চিৎকার করে বলব, তিনি পেরেছেন। তিনি শতায়ু হোন।

তাঁর দুটি গুণকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই। একটি তাঁর সাহস, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকবেলা করার দৃঢ় মনোবল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃঢ়তা। অন্যটি গণমানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা। গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে টের পেয়েছি হতদরিদ্র মানুষেরা তাঁকে ভালোবাসে-তাঁর কাছেই তাদের প্রত্যাশা। মনে করে, তাদের যা কিছু যাওয়ার জায়গা তা এক জায়গাতেই। তিনিই বোঝেন জনগণের সুখ-দুঃখ, বোঝেন তাদের নাড়ির টান। এখানে আমিও তাঁকে আপন করে পাই, যখন একজন। নিরন্ন মানুষের চিন্তাকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উড়ে যেতে দেখি সরষের হলুদ ফুলের ওপর দিয়ে; যে দীর্ঘশ্বাস শুষে খেয়ে মধু বানায় মৌমাছি। হায় মধু! নেতৃত্বের জায়গাটিই তো এমন। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে খুঁজে ফেরে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

যে দৃষ্টিতে জ্বলে ওঠে পলিমাটি, শস্যক্ষেত, মানুষের সাদা দৃষ্টি, বঙ্গোপসাগর, বুজে যাওয়া নদী, জেগে ওঠা চর, উজার হওয়া বন, সুন্দরবনের পোকামাকড়, সীমান্তরেখা, রোহিঙ্গা শরণার্থী, পাহাড়ি জনপদ-জুম চাষ-আদিবাসী মানুষ, তাদের জায়গাজমিন, টঙঘর, কাপ্তাই লেক, মুক্তিযোদ্ধাদের বঞ্চনার জীবন- জীবন, জীবন। জীবনই তো গড়ে দেশ-দেশই তো চালায় সেসব মানুষ যাদের দেখার চোখ আছে, শোনার কান

আছে, বোঝার হৃদয় আছে, নেতৃত্বের যোগ্যতা আছে- আমি তাঁকে এভাবেই দেখি। এভাবেই দূর থেকে দেখা হয় আমার।

প্রিয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রিয় শেখ হাসিনা, আপনি বেশ দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আছেন, কখনো বিরোধী দলের নেতা হয়েছিলেন। সময়ের ওঠানামার ব্যপ্তি আপনার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সঞ্চিত আছে। আমার বিশ্বাস, আপনার সামনের পথটি নিজেকে বুঝে ওঠার জন্য এখন সহজ হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আপনার যেন ভুল পদক্ষেপ না হয়।

আমি আর আমার স্বামী আনোয়ার হোসেন খান আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ ১৯৯৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আমার মেয়ে পাইলট ফারিয়া লারার মৃত্যুর পর আপনি একটি শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেনঃ

প্রিয়
বেগম সেলিনা হোসেন
জনাব আনোয়ার হোসেন
২০ আশ্বিন ১৪০৫,৫ অক্টোবর ১৯৯৮

বিমান দুর্ঘটনায় আপনার কন্যা ফারিয়া লারার মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। দেশের একজন সম্ভাবনাময় মহিলা বৈমানিক ফারিয়া লারা মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে আকাশ জয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দুঃসাহসী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। এক কালের মেধাবী ছাত্রী এবং সাংবাদিক লারার মৃত্যুতে এক অমিত সম্ভাবনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। যে দুর্ঘটনা লারার মতো সম্ভাবনাময় প্রাণকে ছিনিয়ে নিল, আমি তার সুষ্ঠু তদন্ত এবং এ ধরনের দুর্ঘটনা যাতে কমিয়ে আনা যায় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। মৃত্যু মানুষের জীবনে অমোঘ। তবুও সন্তান হারানোর বেদনা কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথার মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতায় আমি তা উপলব্ধি করি।

প্রার্থনা করি পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আপনাদের লারার বিয়োগ ব্যথা কাটিয়ে ওঠার তৌফিক দান করুন। আমি মরহুম ফারিয়া লারার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দু'চোখের জলে ভিজে যখন আপনার শোকবার্তাটি পড়ি তখন অনুভব করি আপনি দূরের নন। আপনি আমার কাছের মানুষ , খুব কাছের। যে কাছে থাকার পরিমাণ শুধু রক্তের সম্পর্কে হয় না। সম্পর্ক তৈরি হয় চিৎকার করে কান্নার সময় কিংবা গভীর রাতে বেদনাবোধের প্রবল যন্ত্রণায় প্রিয়জন হারানোর কষ্টে। না, আপনার সঙ্গে আমার কোনো কষ্টের তুলনা নয়, শুধু আপন হওয়া কষ্টের মাখামাখিতে। দূর থেকে দেখার অনুভব মুছে দেওয়ার অনুপ্রেরণায়।

আপনার সমুদ্রের তটরেখার পরিমাপ হয় না। কারণ আপনি দেশ ও জাতির নেতৃত্বের দায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার সাফল্য আমাকে আনন্দিত করে। আর নিজের ক্ষুদ্রতার দিকে তাকিয়ে ভাবি, বড় মানুষ হওয়ার সাধনা করতে হয় আপনি সফল হবেন- এই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকব। না পারার দায়ভারের ব্যর্থ মানুষ যেন আপনাকে হতে না হয়।

সহায়ক গ্রন্থ ও অন্যান্য সূত্র :

শেখ হাসিনা - বিপন্ন গণতন্ত্র, লাঞ্ছিত মানবতা
- মুজিব আমার পিতা
- ওরা টোকাই কেন
- সহেনা মানবতার অবমাননা
- সাদা কালো
- দারিদ্র্যে দুরীকরণ : কিছু চিন্তাভাবনা
- নির্বাচিত প্রবন্ধ
- স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার

মযহারুল ইসলাম - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
- বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য

সালাউদ্দিন আহমেদ - বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

কবীর চৌধুরী - বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ
- অসমাপ্ত মুক্তিসংগ্রাম
- স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়

আনিসুজ্জামান - মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর
- মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য

এম. এ ওয়াজেদ মিয়া - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর - আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ
- রাষ্ট্র বনাম দক্ষতা
- ধর্ম রাষ্ট্র রাজনীতি

হুমায়ন আজাদ - বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র
- ভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি

শাহরিয়ার কবির - বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদ
- বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

রফিকুল ইসলাম - বীরের এ রক্তস্রোত মাতার ও অশ্রুধারা
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ - মহানায়ক মুজিবুর

ফারুক চৌধুরী - দেশ দেশান্তর

নিমাই সাধন বসু - দেশ নায়ক সুভাষচন্দ্র

অজয় রায় - বাংলা ও বাঙালি

আবদুল মতিন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের পর

খন্দকার মো. ইলিয়াস - বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন

অন্নদাশঙ্কর রায় - সংহতির সংকট

পান্নালাল দাশগুপ্ত - গান্ধী গবেষণা

নীলিমা ইব্রাহিম - বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য
- অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভস্মাচ্ছাদিত কন্যা আমি
বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব

মুনতাসীর মামুন - ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান

মুহম্মদ এনামুল হক - মুসলিম বাংলা সাহিত্য

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী - বাঙালীর অসমাপ্ত যুদ্ধ
- বাংলাদেশ : বামপন্থী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা
- আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি

নীরদচন্দ্র চৌধুরী - আত্মঘাতী বাঙালি

গোপাল হালদার - বাঙালি সংস্কৃতির রূপ

রশীদ আল ফারুকী - বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

সুকুমার সেন - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

শামসুজ্জামান খান - বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ এবং প্রাসঙ্গিক কথকতা

হারুণ অর রশিদ - বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু

নূহ-উল-আলম লেনিন - শান্তির পথযাত্রী

মোহাম্মদ শাহাজাহান - ক্রান্তিকালের সফল কাণ্ডারি

বাদল চৌধুরী - স্বাপ্নিক অভিযাত্রী বঙ্গজননী শেখ ফজিলাতুন নেছা
শেখ হাসিনা বাংলার প্রিয়মুখ

এম নজরুল ইসলাম - জেলখানায় শেখ হাসিনা সংবাদ অ্যালবাম

শওকত মোমেন শাহজাহান - যুগে যুগে জন্ম নেব তোমার জন্মদিনে মহাত্মা
শেখ হাসিনা অঞ্জলি লহ মোর

সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ - জননেত্রী শেখ হাসিনা

আসলাম সানী - বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা

রবীন্দ্র গোপ - লোককবিতায় বঙ্গবন্ধু প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব, মুজিব আমার
অন্তরে বাহিরে, জয় বাংলা, তুমিইতো বাংলাদেশ